শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেব।

প্রথম বর্ষ | ফাল্গুন, ১৩৩৮ | একাদশ সংখ্যা

যুগাবতার

স্বর্গীয় পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়

রামপ্রসাদের গানে আছে, "ডাকার মতন ডাক দেখি ভাই, কেমন মা তোর রইতে পারে?" ডাকার মতন ডাকিলে সময় হইলে মা তো দেখা দেনই, আবার কখন কখন প্রিয় সন্তানকে পাঠাইয়া নিজের কাজ করেন। ভগবান রামকৃষ্ণ মায়ের ছেলে, মায়ের কথায় মাতৃভূমি বঙ্গদেশে আসিয়া মায়ের কাজ করিয়া গিয়াছেন। তিনি যখন ছিলেন, তখন তাঁহাকে অনেকে চেনে নাই, তাঁহার চরণ-ছায়ায় অনেকে আশ্রয় গ্রহণ করে নাই, কিন্তু যত দিন যাইতেছে, ততই সকলে বুঝিতে পারিতেছেন যে, মায়ের ছেলে মায়ের কাজ করিতে সত্যই আসিয়াছিলেন, মায়ের কাজ করিয়া গিয়াছেন। আমাদের যদি মায়ের ছেলে হইবার যোগ্যতা অর্জ্জন করিতে হয়, তবে ইঁহারই চরণধূলির উপর গড়াগড়ি দিতে হইবে।

তোমরা বিশ্বাস কর, আর নাই কর, আমরা

বিশ্বাস করি, যে আমাদের এই ভারতভূমি, আমাদের এই জন্মভূমি—বঙ্গভূমি ভগবানের স্নেহ-দৃষ্টির অধীনে চিরকালই রহিয়াছে। তিনি যুগে যুগে নানারূপে এই দেশে অবতীর্ণ হইয়া এই দেশের সমাজকে সংযত রাখিয়া থাকেন; যাহাতে আমাদের ধর্ম্মের এবং বিশিষ্টতার ধারা ছিন্ন না হয়, যাহাতে আমরা নির্ব্বংশ না হই, আমাদের একেবারে মূলোচ্ছেদ না হয়, সে ব্যবস্থা করিবার জন্য ভগবান এদেশে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। তাই তাঁহার অসংখ্য অবতার, অসংখ্য রূপ এবং অসংখ্য কার্য্য-প্রণালী। মোগল পাঠানের শাসনের শেষ সময় বাঙ্গালার হিন্দুসমাজ স্থবির, নিশ্চেষ্ট এবং কর্ম্ম-কাণ্ডের পদ্ধতির দ্বারা যেন নাগপাশে সংবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল। ইংরেজী শিক্ষার সংঘাতে, কর্ম্মপ্রাণ পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে সে জড়তা দূর হইয়াছিল বটে, সে নাগপাশ ছিন্ন হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে নাস্তিকতা ও বিলাসের হেমবন্ধন সমাজকে অন্যভাবে স্থবির করিতে উদ্যত হইয়াছিল। বিভ্রান্ত হিন্দুসমাজ ধর্ম্মের পিপাসায় আর্ত্ত হইয়া, কখন বা খৃষ্টান সাজিতে উদ্যত হইয়াছিল, কখন বা ব্রাহ্ম সাজিতেছিল, কখন বা কোমতের পজিটিভিজম্ লইয়া আশ্বস্ত হইবার চেষ্টা করিতেছিল। রাজা রামমোহন রায় হইতে স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী পর্য্যন্ত সকলেই এই বিভ্রান্ত সমাজের উপর লাক্ষণিক চিকিৎসা চালাইতেছিলেন। সমাজ-শরীরের সর্ব্বাংশে বিস্ফোটকশ্রেণী দেখিয়া তাঁহারা প্রত্যেকেই এক একটা ফোড়ার চিকিৎসা করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। কেহ নিরাকারবাদ চালাইয়া, কেহ জাতিভেদ উঠাইবার চেষ্টা করিয়া, কেহ বা শুষ্ক শিক্ষার বিস্তৃতি ঘটাইয়া, আবার অনেকে মন্বাদি ধর্ম্মশাস্ত্র-কথিত আর্য্য হিন্দুধর্ম্ম চালাইবার চেষ্টা করিয়া সমাজকে উন্নত, পবিত্র ও নীরোগ করিতে প্রয়াস পাইতেছিলেন। তাঁহারা ভাবেন নাই, বুঝেন নাই যে, বিরাট সমাজ-শরীরে রক্তদুষ্টি হওয়াতেই সে সমাজ এতটা বিগড়াইয়াছে এবং নানা বিস্ফোটকের আকার হইয়াছে। এই রক্তদুষ্টি দূর করিতে না পারিলে যে সমাজ নীরোগ হইবে না, তখন তাঁহারা সে কথা বুঝেন নাই।

আর একটা কথা, ভারতবর্ষে তথা বঙ্গদেশে সমাজসংস্কার ও ধর্ম্মপ্রচার হয় স্বাধীন রাজাতে করিয়াছে, নহে তো সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীতে সে কাজ করিয়াছে। গৌতম বুদ্ধের সময় হইতে ভগবান সন্ন্যাসীর রূপেই বারে বারে যুগে যুগে এ দেশে দেখা দিয়াছেন। সন্ন্যাসীর বেশেই সমাজ-শরীরের চিকিৎসা করিয়াছেন। খাঁটী এদেশের কথায়, এদেশের ভাষায়, এদেশের গাছ-গাছড়ার ঔষধ সংগ্রহ করিয়া তাঁহারা এই দেশের চিকিৎসা করিয়া গিয়াছেন, আর তাঁহাদের চিকিৎসায় এ দেশের সমাজ-শরীর পবিত্র হইয়াছে। দৃষ্টান্ত দেখাইয়া, উদাহরণ দিয়া, এ কথাটা বুঝাইবার প্রয়োজন নাই, যাঁহারা গত ৫০০ বৎসরের বাঙ্গালা দেশের ইতিহাস জানেন, তাঁহারাই আমাদের এ কথার যথার্থতা স্বীকার করিবেন।

ভগবান রামকৃষ্ণ ইংরেজী যুগের সন্ধিক্ষণে এ দেশে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ঠিক যে সময় আসিলে বাঙ্গালায় বাঙ্গালীত্ব রক্ষা করা যাইবে, ঠিক যে সময় আসিয়া ইঙ্গিত করিলে, বাঙ্গালী নিজ নিকেতনের দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার চেষ্টা করিবে, ঠিক যে সময় বাঙ্গালার বাঙ্গালীত্বের মুকুর বাঙ্গালীকে দেখাইলে সে নিজকে আবার চিনিবার চেষ্টা করিবে, ঠিক সেই সময় বিরাট্পুরুষের ন্যায় ভগবান রামকৃষ্ণ বঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হইয়া আমা-দিগকে সৎপথ দেখাইয়া দিয়াছেন। তিনি একেবারে খাঁটি সোণা, তাঁহাতে এতটুকু খাদ নাই—ভেল

নাই—নিরাবিল ও পবিত্র। বাঙ্গালীত্বের সোণার তাল যেন তিনি। সোণাই বা বলি কেন, তিনি বাঙ্গালার গঙ্গামৃত্তিকা—স্নিগ্ধ, শ্যামল, সুন্দর, শীতল, পেলব, মধুর, গঙ্গার মাটী। যে মাটীতে বাঙ্গালার দেবদেবীর সৃষ্টি হইয়া থাকে, যে মাটীতে বাঙ্গালী নিত্য শিব গড়িয়া পূজা করিয়া থাকেন, যে মাটী দেহে মাখিলে দেহ পবিত্র হয়, হৃদয়ে ধরিলে অনন্ত স্নিগ্ধতার ও শীতলতার ভাব হৃদয়ে উথলিয়া উঠে, তিনি সেই মাটী—বাঙ্গালীর সহায়, ঘর-সংসারের অবলম্বন। জন্মজরার সহায়, রোগ-শোকের ঔষধ—সেই গঙ্গামৃত্তিকা। এই শ্যাম শ্যামার দেশে, এই মাধুর্য্য এবং প্রেমের রাজ্যে গঙ্গামাটীর তৈয়ারি শিব, সুন্দর, সত্য ও মনোহর ভগবান রামকৃষ্ণ। তাঁহাতে এতটুক্ বিদেশী ভাব ছিল না, বাঙ্গালীয়ানা ছাড়া তাঁহাতে এক বিন্দু বিদেশের ভাব—বিদেশের কথা স্থান পায় নাই। তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহাই চাঁচা ছোলা সরল উদার বাঙ্গালা ভাষায় বলিয়াছেন। সে কথার অলঙ্কার সবই বাঙ্গালার,—দৃষ্টান্ত, উদাহরণ সবই বাঙ্গালার। যে কথা শুনিলে বাঙ্গালীর প্রাণ জুড়ায়, যে সকল কথা মাতৃস্তন্যের সহিত বাঙ্গালী-দেহের স্তরে স্তরে গাঁথা আছে, ঠাকুর সেই সব কথা কহিয়া বাঙ্গালীকে জাগাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। সেই সব কথা কহিয়া বাঙ্গালীর লুপ্তস্মৃতির উদ্বোধন করিয়াছিলেন। তিনি কে ও তিনি কেমন, তাহা এখনও বিচার করিবার সময় হয় নাই। আমরা বলি, তিনি স্বয়ং ভগবান, ব্রাহ্মণরূপে বাঙ্গালায় আসিয়া, পুরোহিতের রূপে বাঙ্গালীসমাজে দেখা দিয়া, বাঙ্গালীকে নূতন যজ্ঞে দীক্ষিত করিয়া গিয়াছেন। তিনি যুগাবতার, ভাবাবতার এবং রসাবতার।

তাঁহাকে চিনিতে পারিবে না বটে, সে সৌভাগ্য এখনও বাঙ্গালী সমাজে ঘটে নাই বটে, কিন্তু তাঁহার একটা কার্য্য যে ভাবে যতটুকু ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহার দিকে একবার তাকাও দেখি—দেখার মতন দেখিতে যদি জান, তাহা হইলে দেখিতে পারিলেই বিস্ময়ে অবাক্ হইবে। বুঝিবে—তাঁহার একটা ক্ষুদ্র বিভূতি, একটা সামান্য ঐশ্বর্য্য ইংরাজীশিক্ষিত বাঙ্গালীর বিলাসিতার গোবর গাদায় কেমন শতদল পদ্মের মত ফুটিয়া উঠিয়াছে। যে বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য শত বৎসর পূর্ব্বে অস্পৃশ্য জাতিকে স্পর্শ করিলে সাতবার গঙ্গাস্নান করিয়া পবিত্র হইত, জাতিভেদের কঠোর নিগড়ে আবদ্ধ হইয়া দয়া-মায়াকে জলাঞ্জলি দিয়াছিল, যে বাঙ্গালী ইংরেজীশিক্ষিত বাবু—পথের কাঙ্গাল-ফকিরকে স্পর্শ করিলে, পাছে ধোপদস্ত ইস্ত্রি করা পোষাক নষ্ট হয়, এই শঙ্কায় অতি সঙ্কোচে পথ চলিত, মহাভয়ে ভীত হইয়া রোগ এবং রুগ্নকে দূরে পরিহার করিত, সেই বাঙ্গালার বাঙ্গালী-বাবু ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্য ঠাকুরের ইঙ্গিতে আজ জাতিবর্ণধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সংক্রামক রোগে সঙ্কুচিত না হইয়া, প্লেগ কলেরা বসন্তরোগে ভীত না হইয়া, বিষ্ঠা-চন্দনে সমজ্ঞানী হইয়া আর্ত্তের সেবা করিতেছে, পীড়িতের শুশ্রূষা করিতেছে। যেখানে রোগ, যেখানে শোক, যেখানে ব্যথা, যেখানে ক্লেদ, সেইখানেই ছুটিয়া যাইতেছে। ইহা কি বিস্ময়কর পরিবর্ত্তন নহে? ইহা দেখিয়া বলিব না কি যে, শুষ্ক তরু মুঞ্জরিত হইয়াছে, মরুক্ষেত্রে নন্দনের শোভা ফুটিয়াছে? আর বাঙ্গালার সেবাপরায়ণ সন্ন্যাসীদিগকে চেনে না, জানে না কে? কন্যা কুমারিকা হইতে হিমালয়ের উত্তুঙ্গ শৃঙ্গ পর্য্যন্ত যেখানে রোগ, যেখানে ভয়, সেইখানেই বাঙ্গালী সেবক। যাঁহার মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া বাঙ্গালী এমন অঘটন ঘটাইতে পারে, বাঙ্গালীর প্রকৃতির এতটা পরিবর্ত্তন হইতে পারে, তিনিই তো ঐশ্বর্য্যশালী ভগবান্। তিনিই তো

যুগাবতার, ভাবাবতার। সেবা-ধর্ম্ম নকল-নবীশের ধর্ম্ম নহে, দেখাদেখি ও কাজ কেহ করিতে পারে না। ঘৃণা, লজ্জা, ভয়, সঙ্কোচ এগুলি পরিহার করিতে না পারিলে সেবা-ধর্ম্মে কেহ দীক্ষিত হইতে পারে না। যাঁহারা সেবক তাঁহারা এটুকু বুঝেন। যাঁহারা দুর্ভিক্ষপীড়িত দেশে, ক্লেশপীড়িত নগরে যাইয়া রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের সেবকগণের কার্য্য দেখিয়াছেন, তাঁহারাই স্বীকার করিবেন যে, সেবার মহামন্ত্র কাণের ভিতর দিয়া মরমে প্রবেশ না করিলে এমন কাজ মনুষ্যের দ্বারা হয় না। যিনি বিলাসীকে দেবতা করিতে পারেন, নাস্তিককে আস্তিক করিতে পারেন, আচারীকে শুশ্রূষাকারী করিতে পারেন, তিনি দেবতা নহেন তো দেবতা কে?

অন্য পরিচয় আর দিব না, বুঝি বা সে পরিচয় দিবার সময় এখনও হয় নাই। তবে এ কথাটী বলিব, যাঁহার আশীর্ব্বাদের প্রভাবে ব্রহ্মানন্দ, বিবেকানন্দ প্রভৃতি নরদেবতা সকলের উদ্ভব হইতে পারে, যাঁহার ব্যবস্থাগুণে এত সহজ অথচ এত কঠোর, এত মধুর অথচ এত দুঃসাধ্য, এত সুন্দর অথচ এত বিভীষণ ধর্ম্মের ও ধর্ম্মপদ্ধতির সৃষ্টি হইতে পারে, তিনিই তো ভাবাবতার। রামকৃষ্ণ কথামৃত পড়িয়া দেখ, তাহাতে ভাবের কোটী মন্দাকিনী-ধারা অনবরত ছুটিতেছে ও উথলিয়া উঠিতেছে।

এই ফাল্গুনী শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে সেই মহাপুরুষের, বাঙ্গালার পরিত্রাতার, রক্ষাকর্ত্তার জন্মোৎসব। ভাগীরথীর পশ্চিমতটে বেলুড় মঠে তাঁহার আসন। সেইখানে তাঁহার বিরাট জন্মোৎসব হইবে। ভাগীরথী কুল্‌কুল্ কল্‌কল্ ছল্‌ছল্ শব্দে বাঙ্গালার অতীত গাথা গান করিয়া তোমাদের হৃদয়-মন পবিত্র করিবেন। আর সেই ধ্বনির উপর বাঙ্গালার শ্যাম শ্যামার নাম লক্ষকণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হইবে। পতিত-পাবনীর তীরে পতিত-পাবনের স্মৃতির ধারা আসিয়া মিলিয়া অপূর্ব্ব ত্রিবেণী-সঙ্গমের সৃষ্টি করিবে। বাঙ্গালার এই কুম্ভযোগে—তুমি বাঙ্গালী একবার ডুব দিয়া লও, একবার নাম শুনিয়া ঘটে পটে মূর্ত্তি দেখিয়া, স্মৃতিচিহ্নের পরিচয় লইয়া জীবন সার্থক কর।
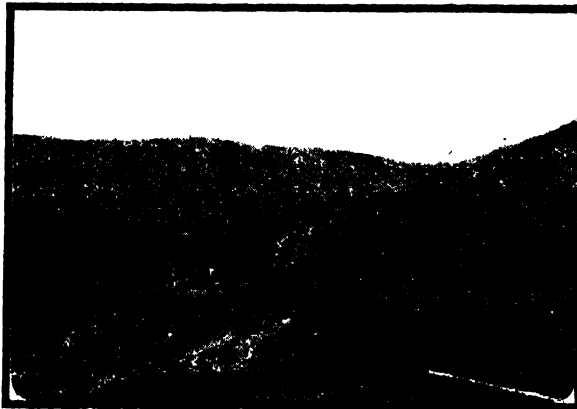
পশ্চিমঘাট পর্ব্বতবক্ষে পথ

গল্প

পুনরাগমন

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ পালিত

১

বাহিরে জানালার পাশে চাঁপার ডালে শুক হাঁকিয়া কহিল—"নিরালা! ওঠো নিরালা!—ঐ উষা এলো;—ঐ তার আলো।"

ভিতরে রজত পালঙ্ক। পালঙ্কের উপর তার অনুরূপ—সুকোমল মসৃণ, দুগ্ধাভ শয্যা। তদুপরি নিদ্রিতা নিরালা—রাজকন্যা। তার অঙ্গে অতি সূক্ষ্ম কার্পাস-বস্ত্র তার গায়ের রংয়ের সহিত মিশিয়া রহিয়াছে।

প্রহরী সমীরণ। প্রভাতের পালা তার। সে হাসিয়া কহিল—"উষা! তুমি ফিরে যাও। অতুল সৌন্দর্য্য এখানে। রূপের ভাণ্ডারী নিঃশেষে তার রূপের ভাণ্ডার শূন্য করিয়া ঢালিয়া দিয়াছে।"

পাতার আড়ে চাঁপার দল উঁকি দিল। সুগন্ধ কহিল—"হেথা নয়! যেতে হবে ঐখানে। ঐ শয্যার উপরে যেখানে রূপের সম্রাজ্ঞী শায়িতা।"

পাতার ঘোম্‌টা টানিয়া চাঁপার দল মিনতি করিল। সমীরণ সুগন্ধকে ডাক দিল—"ফেরো বন্ধু!—ফেরো,—এই দেখ রূপের নগ্নতা।"

চাঁপার দল লজ্জায় ঝরিয়া পড়িল। সুগন্ধ কাঁদিয়া কহিল—"যৌবনের পরিপূর্ণ-বিকাশে রূপের এত মাধুরী—এত নগ্নতা! এ যেন রূপ-অরূপের সন্ধির কালোছায়া—যেন রূপের মাধুরী ও নগ্নতায় দ্বন্দ্ব।"

স্বপ্নে যেন নিরালাকে কেহ প্রেম-সম্ভাষণ করিল। নিরালা ঘুমের ঘোরে যেন তাহার দিকে ফিরিল। তাহার রক্তিম গণ্ডদেশে বসোরা-গোলাপ ফুটিয়া উঠিল। তাহার অধরে পিপাসার আকুল আগ্রহ।

শুক ডাকিল—"ওরে নিরালা!—ওরে লজ্জা-হীনা!—নিশা তোব চিরভোর! স্বপ্নে তোর প্রেমাভিসার! হতভাগী চেয়ে দেখ—ছি ছি! আমি লাজে মরি।"

নিরালা উঠিয়া বসিল। শুক গা ঝাড়িয়া কহিল—"বুঝি আর এলো না সে!—নিরালা! নিবালা! তোর হৃদয়ের রাজা বুঝি তোরে ভুলে গেছে। নিরালা! নিরালা!—তোর ফাগুনের বেলা ঐ বুঝি ব'য়ে গেল। নিরালা! নিরালা!"

একটু উত্তেজিত হইয়া নিরালা আসিয়া জানালার নিকট দাঁড়াইল।—আজ সে শুকের জীবন শেষ করিয়া দিবে!

শুক গিয়া শেফালির ডালে বসিল।—"নিরালা! নিরালা! কেঁদ না নিরালা! নিরালা!—আমি তারে এনে দেবো!—তোব জীবন-কুঞ্জের শ্যাম—তাকে এনে দেবো।

নিরালা শেফালির বনে গেল। নিদ্রালস পদ-ক্ষেপ তার,—ক্রোধ-বিকম্পিত দেহ তার। তার লুণ্ঠিত অঞ্চলে, আলুলায়িত কুন্তলে, গণ্ডে কপোলে, বক্ষে নিতম্বে, চরণে রাশি রাশি শেফালি ঝরিল। শুক পাড়ি দিল।

সম্মুখে সরোবর—প্রস্ফুট কমলে ভরা। তার মর্ম্মর-সোপানশ্রেণী স্বচ্ছ জলতলে বহু দূর চলিয়া গিয়াছে—যেন ভূতলের রাজ-অন্তঃপুরে। হেথা হোথা রাজ-হংসী চরে।

নিরালা মুখে জল দিল! জল কাঁদিয়া বলিল—"নিদ্রার অলসমাখা ও রূপের পিপাসা কি জলে মিটে? নিরালা! নিরালা!—কৈ তোর প্রিয়-সখা?"

রাজ-হংসী আসিয়া কহিল—সে এলে একদিন জ্যোৎস্নারাতে প্রস্তর-সোপানে—এইখানে তার গলা ধ'রে প্রেম সম্ভাষণ করিস্।"

নিরালা রাজহংসীকে অঞ্চলের আঘাত করিল।

সারিকা কোথায় ছিল,—সে আসিয়া নিরালার বাহুতে বসিল। কহিল—"একি গো নিরালা! চক্ষে তোমার স্বপনের ঘোর—কার স্বপনে নিশা ভোর করেছ?"

নিরালা সারিকার ডানা মুচড়াইয়া ধরিল; গলা টিপিবার উপক্রম করিল। সারিকা চীৎকার করিয়া ডাকিল—"সংগোপনী!—সংগোপনী!"

সংগোপনী আসিল তাড়াতাড়ি।—"এ কি রে, নিরালা!—সারিকা যে বধ হ'ল—"

সারিকা চীৎকার করিতে লাগিল—"সংগোপনী! সংগোপনী!"

সংগোপনী নিরালার হাত ধরিলে নিরালা সারিকাকে ছাড়িয়া দিল। সংগোপনীকে জড়াইয়া ধরিয়া, তার বুকের উপর মুখ রাখিয়া নিরালা কাঁদিতে লাগিল।

সারিকা প্রাণে বাঁচিল। সে কষ্টে উড়িয়া গিয়া তমালের উচ্চ শাখে বসিল; ডানা ঝাড়িয়া চঞ্চু-পুটে তার পালক আঁচড়াইতে লাগিল।

২

সংগোপনী নিরালাকে লইয়া গিয়া, মাধবীতলায় প্রস্তর-বেদীর উপর বসাইল। নিজেও পার্শ্বে বসিল। নিরালার গাল টিপিয়া, তার চুমা খাইয়া,—তারে আদরে জড়াইয়া ধরিয়া কহিল—"প্রিয় সখি, বোন! প্রাণে তোর কি ব্যথা বেজেছে? মহারাজা পিতা তোর;—তুই তার প্রাণের দুলালী। দুঃখ তোর—সে যে উপকথা! বল—কেন চোখে জল? নীরস বদন কেন? বল কে বা কি কথা ব'লেছে। সারিকা কি আজো তোর খোঁপায় ব'সেছে?"

নিরালা কেবলই কাঁদিতে লাগিল।

"হ্যারে নিরালা! কাল বুঝি সারারাত বিনিদ্র কেটেছে তোর? খুলে বল—স্বপন কি কিছু—"

"সখি! স্বপ্নে কাল এক নবীন সন্ন্যাসীকে দেখেছি—কি রূপ তার! যেন কুমার কার্ত্তিকেয়—যেন তরুণ মদন—যেন অনিরুদ্ধ!"

সংগোপনী হো হো করিয়া হাসিল।

নিরালা কাঁদিতে লাগিল।

সংগোপনী কহিল—"সখি! তুই কি পাগল হলি?—স্বপ্ন কখনো সত্য হয়?—সেদিন জ্যোতিষী গুণেছে, কোষ্ঠী দেখে বলেছে—রাজচক্রবর্ত্তী বর হবে তোর—"

"জ্যোতিষী—সে সবি বলে। সংগোপনী! তুই না হিন্দুর মেয়ে?—স্বপনে কি জাগরণে, হিন্দু নারী যারে একবার আত্মসমর্পণ করে—সেই তার হৃদয়-দেবতা। স্বপ্ন মিথ্যা সকলেই বলে। কিন্তু কে জানে—হয় ত বা এ জগতে সত্য যা সে স্বপ্ন—মিথ্যা যা তা জাগ্রৎ। সখি! তুই পিতাকে গিয়ে বল। দেশে দেশে প্রতিনিধি যাক্। ত্রিভুবন খুঁজে তারে এনে দিক্। তা না হ'লে আত্মঘাতিনী হব।"

সংগোপনী মনে মনে হাসিল যৌবনের ছোঁয়া লাগলে এমনি লজ্জাহীনাই হ'তে হয়! নিরালারে কহিল—"নিরালা! কাতর হ'স্‌নে ভাই—ধৈর্য্য ধর্। পিতামাতা গুরুজন—কন্যা হ'য়ে

স্বপ্নকথা তাঁদের কাছে কেমন করে বল্‌বি—ছি ছি ছি ছি তার চেয়ে আমায় বল্। বল্ তোর স্বপ্নেনর সে সন্ন্যাসী কেমন? কেমন—তার নাক মুখ চোখ? চিত্র এঁকে দেখা। দেখি আমি কি উপায়—"

কয়েকটা পত্রপুষ্প লইয়া নিরালা প্রস্তরখণ্ডের উপর চিত্র আঁকিতে লাগিল।

"এ যে বুদ্ধ—গৌতমের ছবি—"

"থাম্ তুই সংগোপনী!—এখনও আঁকা হয় নি। বুদ্ধদেব নয় প্রায় তাঁরই মত।" নিরালা চিত্র শেষ করিল।

"বুদ্ধদেব নহে,—বৌদ্ধভিক্ষুমাত্র!"

সংগোপনীব চক্ষু স্থির!—"সখি এ যে ভিক্ষু!"

"হয়েছে কি?—আমার স্বামী ভিক্ষু কি ভূপতি —তা'তে আসে যায় কি? আমার পিতা ভারতেব রাজা—আমি তাঁর একমাত্র কন্যা।—এ ভারত আমারই ত! ভারত-সম্রাজ্ঞীপতি—সে কত দিন ভিক্ষু রহিবে—বল সংগোপনী?"

"নিরালা!—নিতান্ত বালিকা তুই। সে ভিক্ষু —রাজৈশ্বর্য্য রমণী তার ভোগ্য নহে—তুই তারে যা দিতে চাস্—তা যদি সে না নেয়! তোর প্রেম যদি সে প্রত্যাখ্যান করে!

"ওরে সংগোপনী!—ভারতের ভাবী সম্রাজ্ঞী, তারে বন্দী ক'রে রেখে দেবে নয়ন-সমুখে তার— চিরদিন—"

সংগোপনী মিনতি করিয়া কহিল—"নিরালা! প্রিয় সখি! তোর পায়ে ধরি—তুই স্বপ্নস্মৃতি মুছে ফেল। সে কথা ভুলে যা। তুই ব্রাহ্মণকুমারী, তোর পতি নির্ব্বাচন সে কি সামান্য কথা! কত আয়োজন হবে। দেশে দেশে দূত যাবে। কত রাজা মহারাজা তোর আশায় হেথায় আসবেন। তুই স্বয়ম্বরা হবি—"

নিরালা ভাঙ্গা ভাঙ্গা স্বরে কহিল—"আর কবে হবে সে!—"

"জ্যোতিষী গুণে বলেছে কুলগুরু তোর পিতাকে আদেশ ক'রেছেন—আর পঞ্চবর্ষ পরে। এই পঞ্চবর্ষ মধ্যে তুই স্বয়ম্বরা হ'লে মহা অমঙ্গল হবে।"

নিবালা অভিমানে ফুলিতে ফুলিতে, উদ্যান, প্রাসাদ অতিক্রম করিয়া মন্থরপদে মর্ম্মর-সোপান-শ্রেণী বাহিয়া আপন অন্তঃপুরকক্ষে চলিয়া গেল।

৩

অন্য দিন। রাজপথে কোলাহল শ্রুত হইল। বাতায়ন-পথে নিরালা দেখিল—এক বিপুল জনতা রাজপুরীর দিকে অগ্রসর হইতেছে।

সংগোপনী আসিল। নিরালা জিজ্ঞাসা করিল, —"ব্যাপার কি?

সংগোপনী কহিল—"একজন ভিক্ষু—দশজন নগরবাসীকে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করেছে।"

দরবার বসিল। রাজা কহিলেন—"ভিক্ষু! এর চেয়ে গুরুতর অপরাধ আর কি হ'তে পারে? ধর্ম্মের নামে তুমি আমার প্রজানাশ, সঙ্গে সঙ্গে রাজশক্তির ক্ষয় সাধন করেছ! তোমার শাস্তি— মন্ত্রী!—সভাসদগণ—"

রাজধানীর মাঝে ভিক্ষুর প্রাণদণ্ড বিঘোষিত হইল। ভিক্ষুকে নগর পরিভ্রমণ করান হইল। সর্ব্বশেষে সে কারাগারে আনীত হইল।

নগরবাসিগণ মত প্রকাশ করিল—"স্বয়ং বুদ্ধ-দেব!" "কি সুন্দর রূপ!" "মৃত্যু দণ্ডে দণ্ডিত,— তবু কি প্রফুল্ল!" "নেহাত অল্পবয়স্ক!" "বোধ হয় রাজপুত্র।"—ইত্যাদি

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে উদ্যানের নির্জ্জন প্রদেশে ঘনপল্লবিত তরুতলে নিরালা ও সংগোপনীকে

বসিয়া থাকিতে দেখা গেল। চিন্তার অলসতা—মলিনতা উভয়ের সর্ব্বাঙ্গে—বদনে।

নিরালা কহিল—"সংগোপনী!—বাধা দিস্ নে আমায়। এ সংসারে রাজপুত্র যারা, শত শত মহিষী তাদের। আমি হব তাদেরি মাঝে একজন। সংগোপনী!—তুই আমার প্রিয় সখী। শুধু রাজৈশ্বর্য্য ভোগ, ইন্দ্রিয়ের সেবা—এরি তরে কি এ জীবন? প্রতিদিন নিশাকালে ক্ষণতরে স্বামি-সন্দর্শন,—তারি আশায় সুদীর্ঘ দিনগুলি কর্ম্মহীন কেটে যাবে।—সেই প্রেম আমার হবে? এই কি দম্পতির প্রেম?—প্রবৃত্তির তাড়নায় কর্ত্তব্যের অনুরোধে এই প্রেমাভিনয় করতে হবে? অনুরাগে প্রতিদিন একবার স্বামী গাঢ় আলিঙ্গন দেবে;—প্রতিদিন একবার নারী ভিক্ষে মেগে তার ভালবাসা চেয়ে নেবে? কি বলিস সংগোপনী!"

"সখি! বলবার কিছু নাই আর আমার!" সংগোপনী কাঁদিবার উপক্রম করিল।

নিরালা কহিল—"সংগোপনী! প্রিয়সখি!—ঐ সন্ধ্যা নেমে আসে—ঝোপে ঝোপে কুঞ্জের আড়ালে সরসীর কালোজলে!—ঐ তার আঁধিয়ার। ঐ পাখী ফেরে তার প্রেমনীড়ে। ওদেরো দাম্পত্য-সুখ রাজদম্পতি হতে ভালো। চল সখি সংগোপনী অঞ্চল ফুলে ভ'রে মোরে নিয়ে চল মোর প্রেমনীড়ে। কুঞ্জ সাজাতে হবে। শয্যা বিছাতে হ'বে নতুন ক'রে। সখি! তুই জানিস নে? আজ আমার ফুলশয্যা—কাল প্রাতে অনন্ত শয়ন!"

সংগোপনী একবার সন্দেহপূর্ণ দৃষ্টিতে নিরালার মুখের দিকে চাহিল। তার পর কাঁদিয়া ফেলিল। কহিল,—"সখি! আমি জানিনে কিছুই। মাকে গিয়ে বলি—"

সংগোপনী প্রস্থান করিবার পূর্ব্বেই নিরালা কুঞ্জের আঁধারে মিশিয়া গেল।

৪

রাত্রি দ্বিপ্রহর। নিরালা অন্তঃপুর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল—উন্মাদিনী অভিসারিকার মত। অঙ্গে অল্প ফিকে নীল রেশমী বসন—তা'তে সোণার ঝালর। মস্‌লিনের ওড়না হাওয়ায় উড়ে। জনমুক্ত রাজপথ—তার পদ-ভরে যেন কাঁপে। অঙ্গে সুগন্ধ উড়ে,—কেশদামে বসনে ভূষণে। কোথা লাগে রজনী-গন্ধার গন্ধ! পুরবাসী নিদ্রিত, হেথা হোথা সঙ্গীতের ক্ষীণ মৃদুধ্বনি শুনা যায়। নিরালা কারাগার-মুখে দ্রুত চলে রত্নদীপ হাতে। প্রহরীরা নির্ব্বাক্, নিশ্চল;—নিদ্রালস-নয়নে খালি চায়।

কারাগারের দ্বার মুক্ত হইল। রত্নদীপ জ্বলিল। তাহার আলোকে নিরালা দেখিল—সম্মুখে উদ্ভাসিত,—নিটোল ভিক্ষুমূর্ত্তি;—যেন পাষাণে খোদিত-আঁখি নিমীলিত—ধ্যানমগ্ন। নিরালা একে একে তার মণিবন্ধের, কটির, চরণের লৌহশৃঙ্খল খুলিতে লাগিল। তরুণ ব্রহ্মচারীর অঙ্গস্পর্শে, মুহুর্মুহু তার সর্ব্বাঙ্গে কিসের মৃদু শিহরণ জাগিতে লাগিল। রমণীর সুকোমল করস্পর্শে ভিক্ষুর ধ্যান ভঙ্গ হইল। পদ্মপলাশ-আঁখি মেলিয়া সে নিরালার মুখের দিকে চাহিল।

অস্ফুটোচ্চারণে ভিক্ষু কহিল—"এ যে নারী!"

"হাঁ নারী—রাজকন্যা।" নিরালা আর কিছুই বলিতে পারিল না। এক নিঃশ্বাসে সে জীবনের সমস্ত কথা বলিয়া ফেলিবে ভাবিয়া আসিয়াছিল।

ভিক্ষুর পাষাণ প্রাণেও যেন বসন্তের স্পর্শ লাগিল। তার মরুহৃদয়েও মলয় বহিল। কারাগার-প্রাচীর খল খল করিয়া হাসিয়া উঠিল। অন্তরীক্ষে কে যেন কহিল—"তুমি তো সামান্য! মহাযোগী তার জন্ম জন্ম সাধনার ধন, ঐখানে—ঐ রক্ত-কমলে—শক্তির চরণে পূজা দেয়।

নিরালা কহিল—"ভিক্ষু! সংসারধর্ম্মে কি আত্মোন্নতি নাই?—সেখানে থেকে কি ভগবানকে পাওয়া যায় না?"

"খুব পাওয়া যায়। যেখানে দুঃখ,—যেখানে মৃত্যুর চির আর্ত্তনাদ সেথা তাঁর নিত্য আনাগোনা! সংসারীর সঙ্গে তাঁর খুব নিকট সম্বন্ধ।"

"ওরে ভীরু, কাপুরুষ!—তবে তুমি এ পথ নিয়েছ কেন? এ সংসারে যত সব যোগ্য বস্তু, বিধাতা রচনা ক'রেছেন, সে সকলি কি অভুক্ত রবে ব'লে তিনি রচনা করেছেন? নরে উহা ভোগ করিবে না? যদি করে সে মনুষ্যত্বহারা হবে? ত্যজিবে রমণী যদি, কেন তবে ধরেছ ও রূপ রমণীয়! কেন বক্ষঃ সুবিশাল, -যদি তাহে রমণী আশ্রম পাবে না! রাজবালা ও বক্ষঃ আশ্রয় করবে। কারাগার তোমার স্থান নয়। তুমি এসো মোর সনে। প্রিয়তম! দেবতা আমার! চল মোর অন্তঃপুরে। সেথা আছে নিভৃত শয়ন রজত-পালঙ্কোপরি—সুকোমল। সেথা আছে গন্ধধূপ। রত্নদীপে আলো জ্বলে। কক্ষের প্রাচীর-গাত্রে মণি জ্বলে শত শত—চিত্র বিচিত্র কত। শুক শারী, চক্রবাক চক্রবাকী, হরিণ হরিণী খেলে; ময়ূর ময়ূরী নাচে; কপোত কপোতী কূজন করে; বাহিরে কুঞ্জবনে পাখী গান গায়; পুষ্পে মধুপ গুঞ্জে। শিহরে কেতকী যূথিকা। হাসে বেলা গন্ধরাজ। ওরে! কত গন্ধ, কত বর্ণ, কত গান সেথা! হেথা শুধু মৃত্যুর ঝঞ্ঝনি। ওঠো দেব! আজ মোদের ফুলশয্যা! কাল ভোরে দু'জনারই মৃত্যু।" নিরালা ভিক্ষুর হাত ধরিল।

ভিক্ষু গাত্রোত্থান করিল। স্মিতবদনে কহিল—"রাজবালা! তুমি ত সেখানকার প্রাণী! -ঐ সকলে এত সুখ, এত শান্তি যদি—তোমার এ দুঃখ কেন?"

নিরালা ক্ষণেক নীরব রহিল। পরে কহিল,—"কোনো অমাবস্যা রাতে, নীলাকাশকে জিজ্ঞাসা করো—তার দুঃখ কিসের? তুমি আমার আঁধার হৃদয়ের একশ্চন্দ্র। আমার আঁধার কুঞ্জের আলো!"

নিরালা ভিক্ষুর গলা জড়াইয়া ধরিল।—তার স্কন্ধে গণ্ড স্থাপন করিয়া কাঁদিতে লাগিল। সে কি কান্না!

ভিক্ষু হাসিল। নিরালার চিবুক ধরিয়া, তার মাথা তুলিয়া ধরিল। কহিল—"চল রাজবালা।"

নিরালা তার শয়ন কক্ষে চলিল! সঙ্গে ভিক্ষু। দূরে আলো দেখা যায়—লাল, নীল, সবুজ,—কত বর্ণের। উভয়ে অগ্রসর হইতে লাগিল। অনেক দূর আসিল। কিন্তু এ কি! এ কিসের আলো! কোথায় শয়নকক্ষ, শয্যা, রত্নদীপ, গন্ধধূপ? এ যে ভীষণ শ্মশান! চারিদিকে চিতা জ্বলে। রাজা পুড়ে, রাণী পুড়ে, পুড়ে ভিক্ষু, সন্ন্যাসী, শিশু, যুবক যুবতী। সবাকার নগ্ন দেহ,—উচ্চ নীচ, ভাল মন্দ, সকলই সমান! হিংসা, দ্বেষ, বিবাদ, কলহ, প্রেম কিছুই নাই। ছি! ছি! এ কি? পূতিগন্ধ! হোথা ওকি! নারী! এ যে সর্ব্বাঙ্গ গলিত! বক্ষে গণ্ডে কীট চরে, শৃগালেরা অঙ্গ ছিঁড়ে খায়। নিরালা থমকিয়া দাঁড়াইল।

পশ্চাৎ হইতে ভিক্ষু কহিল—"প্রিয়তমে! রাজবালা! প্রেয়সী আমার! রাত হ'ল শোবে চল।"

চারিদিক অট্টহাসিতে ভরিয়া গেল।

৫

সারা বিশ্বে প্রভাতের আলো। রাজপুরী অন্ধকার। নগরময় কর্ম্ম-কোলাহল—রাজপুরী নীরব। পরিচারক-পরিচারিকাগণ, প্রহরী প্রহরিণীগণ—বিষণ্ণবদন। তোরণে প্রভাতী বন্ধ। বাগানে মালি ঝাঁট দেয়—মুখে তার সাড়া নাই। চাঁপা গাছে ফুল নাই। শেফালীর তলা শূন্য। বকুলের ডালে ঝাঁকে ঝাঁকে মৌমাছির গুঞ্জন নাই।

শুক শারী শুক্না কদমডালে ঘেঁসাঘেঁসি বসিয়া রহিয়াছে—যেন তখনও কত রাত আছে। সমীরণ থামিয়া গিয়াছে। সরসীর জল যেন জমিয়া গিয়াছে। পদ্মবনে ভ্রমর-ভ্রমরী কাঁদিতেছে। রাজহংসী বিমর্ষ।

অন্তঃপুরে রাজমহিষী ঘন ঘন মূর্চ্ছা যাইতেছেন। চতুষ্পার্শে তাঁর শুশ্রূষাকারিণীগণ। কেহ মাথায় জল ঢালিতেছে; কেহ পাখা করিতেছে, কেহ চোখ মুছাইয়া দিতেছে; কেহ দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিতেছে; কেহ বা নীরবে কাঁদিতেছে।

কক্ষান্তরে রাজা। তাঁহার মুখে চোখে দুশ্চিন্তার জ্বালা। মন্ত্রী সভাসদ্‌গণ সকলে উপস্থিত। সকলেই রাজার দুঃখে দুঃখিত—তাঁদের চিন্তাক্লিষ্ট বদনই তার প্রমাণ। রাজ-জ্যোতিষী ও তাঁহার সহকারিগণ গভীর চিন্তানিমগ্ন। মেঝেময় তাঁহারা খড়ি দিয়া সরল বক্র বহুসংখ্যক রেখা টানিয়াছেন; বহু অঙ্ক কষিয়াছেন ও কষিতেছেন। রক্ষী আসিয়া সভয়ে অভিবাদন করিল।

মন্ত্রী তাড়াতাড়ি রক্ষীকে বাহিরে লইয়া গেলেন,—পাছে রাজা উত্যক্ত হন।

ক্ষণপরে মন্ত্রী ফিরিয়া আসিলে রাজা মন্ত্রীর দিকে চাহিলেন।

মন্ত্রী কহিলেন—"কারারক্ষী"

রাজা কহিলেন—"নিয়ে এসো।"

মন্ত্রী ইঙ্গিত করিলেন। কারারক্ষী আসিয়া অভিবাদন করিল।

মন্ত্রী কহিলেন—"কি সংবাদ বল?"

কারারক্ষী অভিবাদন করিয়া কহিল—"কাল রাত্রে কারাগার উন্মুক্ত ছিল। ভিক্ষু ছিল না। আজ প্রাতে আবার তাকে শৃঙ্খলিত অবস্থায়, পূর্ব্ববৎ কারাগারে আবদ্ধ দেখছি।"

সকলেই অবাক্ হইয়া পরস্পর মুখ চাওয়া চায়ি করিলেন। রাজাও মন্ত্রীর দিকে চাহিলেন।

সকলে কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিবার পর রাজা কহিলেন—"যাও!"

মন্ত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন—"ভিক্ষুকে এখানে আনয়ন করা হবে কি?"

রাজা নীরব রহিলেন।

কারারক্ষী অভিবাদন করিয়া কহিল—"ভিক্ষুকে বধ্যভূমে—"

মন্ত্রী রাজার মুখের দিকে চাহিলেন।

রাজা কহিলেন—"তার প্রাণদণ্ড এখন স্থগিত থাক্‌বে।"—তার পর ক্ষণেক কি চিন্তা করিয়া মন্ত্রীকে কহিলেন—"মন্ত্রী! তুমি যাও! দেখ গিয়ে একবার—"

মন্ত্রী তাড়াতাড়ি অভিবাদন করিলেন। কারারক্ষী মন্ত্রীর পশ্চাদনুসরণ করিল।

যত শীঘ্র সম্ভব ফিরিয়া আসিয়া মন্ত্রী রাজাকে জানাইলেন—"ভিক্ষু বলে যে, রাজকন্যা তাহাকে তাহার শয়নকক্ষে লইয়া যাইতেছে বলিয়া এক মহাশ্মশানে লইয়া গিয়া হাজির করিয়াছিল। তার পর আর সে কিছুই জানে না।"

রাজা অধিকতর চিন্তিত হইলেন।

জ্যোতিষীগণ সকলে একমত হইয়া কহিলেন—"রাজকন্যা যেখানেই থাকুন—নিরাপদে থাকবেন। পঞ্চবর্ষ পরে তিনি রাজমহিষী হবেন।"

রাজকন্যার অন্বেষণে যাহারা বহির্গত হইয়াছিল, তাহারা ফিরিয়া আসিল। সকলে কাঁদিয়া কহিল—"রাজকন্যার সন্ধান মিলিল না।"

রাজা সকলকে বিদায় দিলেন।

অপুত্রক রাজা। গুরুদেবের আশীর্ব্বাদে বৃদ্ধবয়সে তাঁর একমাত্র কন্যালাভ হইয়াছিল। কন্যার জন্মদিনে গুরুদেব তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—বিংশতি বর্ষ বয়স পূর্ণ না হ'লে কন্যার বিবাহ দিও না!—ঐ দিন তিনি তাঁহাকে দুইটি লিপি দিয়াছিলেন,

একটি কন্যার বিপৎকালে, অন্যটি কন্যার বিংশতি বর্ষ বয়স পূর্ণ হ'লে খুলিয়া পড়িতে আদেশ করিয়াছিলেন।

রাজা তাড়াতাড়ি উঠিয়া শয়নকক্ষে আসিলেন। পালঙ্কের উপর বিছানো শয্যার শিয়রদেশ উত্তোলন করিয়া পালঙ্কেরই এক অংশ সরাইয়া ফাঁক করিলেন। সেই গুপ্ত স্থান হইতে লিপি বাহির হইল। একটি যথাস্থানে রাখিলেন। অপরটি পড়িলেন—

"কন্যার সন্ধান করো না ভিক্ষুকে মুক্ত ক'রে দাও!"

রাজা শিহরিয়া উঠিলেন।

ভিক্ষু মুক্ত হইল। সকলেই অবাক্। নগরময় জনরব উঠিল—রাজার মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়াছে।

রাজমহিষী আশ্বস্তা হইলেন—কন্যা তাঁর রাজ-রাজেশ্বরী হয়ে ঘরে আসবে। জ্যোতিষী বলেছে! হিন্দুর জ্যোতিষশাস্ত্র! গুরুর বচন—"

রাজকার্য্য পূর্ব্ববৎ চলিতে লাগিল।

সেদিনকার অরণ্যের মূর্ত্তি যেন মৃত্যুর কালিমা মাখানো। সহস্র শ্মশানের নিস্তব্ধতা যেন সেখানকার বৃক্ষলতায়, পত্রে পত্রে পুঞ্জীভূত। কারামুক্ত ভিক্ষু গভীর অরণ্য ভেদ করিয়া চলিয়াছে।

প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী কাল দেশে ব্রাহ্মণপ্রতাপ। কাজেই ভিক্ষুর আশ্রয় অরণ্যের দুর্ভেদ্য প্রদেশ। সেইখানেই তাহাদের বিহার সঙ্ঘারাম—তাহাদের যা কিছু সব সেইখানে। সুযোগ বুঝিয়া তাহারা লোকালয়ে প্রবেশ করে, আর জাতি-নির্ব্বিচারে সকলকে দীক্ষা দেয়।

ভিক্ষু আসিল অরণ্যের প্রান্তদেশে—নির্ঝর-তীরে। সায়াহ্নকাল। ভিক্ষুণীকে জিজ্ঞাসা করিল—"সংজ্ঞাশূন্য?—এখনও?"

তৃণশয্যায় শায়িতা নিরালা। কর্ত্তিত লতিকার ন্যায় এলায়িত সর্ব্বাঙ্গ তার, বিশুষ্ক মলিন। মস্তক—ভিক্ষুণীর অঙ্কদেশে স্থাপিত।

"কি—এখনও জ্ঞান হয় নি!"

ভিক্ষুণী নীরবে ঘাড় নাড়িল।

নিরালা চক্ষুরুন্মীলন করিল—"এ যে শ্মশান! কৈ ভিক্ষু?—একা আমি!—চলে গেল!—চলে গেল!"—নিরালা উঠিবার চেষ্টা করিল। বহু ক্রোশ দূর হইতে কে যেন তাহাকে ডাকিল—"নিরালা! প্রিয়তমে!—রাত হ'ল;—শোবে চল।"

ভিক্ষুণী নিরালাকে কোলে তুলিল—তখনও সংজ্ঞাশূন্য।—ভিক্ষু তাহাকে বিহারে লইয়া যাইবার জন্য কহিল।

আরও কিছুদিন পরে। নিরালা সুস্থ হইয়াছে! এখন তার চিত্ত স্থির। বিহারের অধ্যক্ষ চিত্রশিল্প ও ভাস্কর্য্যাচার্য্য ভিক্ষুকে ডাকিলেন। ভিক্ষু আসিল। অধ্যক্ষ কহিলেন—"রাজকন্যা শিল্পানুরাগিণী—তুমি তাহাকে শিল্প এবং ভাস্কর্য্য শিক্ষা দাও।"

ভিক্ষুর মুখমণ্ডল বর্ণহীন—অধ্যক্ষ লক্ষ্য করিলেন। তাহার অধিকতর গম্ভীরভাব জানাইয়া দিল—তাহার আদেশ অটল।

দুই বৎসর পরে ভিক্ষু, নিরালার পরীক্ষা গ্রহণ করিল। গভীর মনোযোগে, অশেষ যত্নে নিরালা শ্বেতপ্রস্তরে ভিক্ষুর নিখুঁত প্রতিমূর্ত্তি গড়িল। ভিক্ষু বিস্ময়ে নির্ব্বাক!

"এ কি!—এ কার মূর্ত্তি?—নিরালা!—এ নিয়েও ছেলে খেলা? শিল্পশিক্ষা—সাধনা। বুঝি পণ্ডশ্রম!"

"জানি না—কিসে শ্রম সার্থক তোমার! বুঝি না—সাধনা কি?—ঐ মূর্ত্তি মনে প্রাণে হৃদি-কন্দরে—শোণিতের প্রতি কণিকায় আঁকা!"

"আমি গুরু,—শিষ্যা তুমি!—ওরে! এ কি হ'ল! সঙ্ঘে মহা অপবাদ!" ভিক্ষু একখণ্ড প্রস্তর তুলিল।

সবলে প্রস্তর মূর্ত্তির মাথায় মারিল—মূর্ত্তি চূরমার হইয়া গেল। কে যেন তার কানে কানে কহিল—"অক্কোধেন জিনে কোধং, অসাধুং সাধু না জিনে।"

অধ্যক্ষ ভিক্ষুরে ডাকিয়া কহিলেন—"ভিক্ষু তুমি!—এ তোমার অপরাধ।"

ভিক্ষু নীরবে অপরাধ স্বীকার করিল।

অধ্যক্ষ কহিলেন—"ঐ তার সাধনা! ভালবাসা—তার পূজা!—যাও তারে দীক্ষা দাও!"

"প্রধানা ভিক্ষুণী—"

"কিছু নয়!—তুমি নিজে দাও।"

"ওর পিতা মাতার আদেশ—"

"মিথ্যা সব। ওর জন্যে পৃথক বিধান।"

পরদিন উপ-ভবনে নিরালা শপথ করিল—

"নম তস ভাগবত অহঁত সম সমবুদ্দস।
বুদ্ধম্ শরণম্ গচ্ছামি।
ধম্মম্ শরণম্ গচ্ছামি।
সঙ্ঘম্ শরণম্ গচ্ছামি।"—ইত্যাদি।

৭

ভিক্ষুণীরা অবাক হইল। নারীর দীক্ষা—ভিক্ষুণীর কাজ সে। অধ্যক্ষের অনুমতি বিনা ভিক্ষুণীর ভিক্ষু সাক্ষাৎ—সঙ্ঘের নিয়ম-নিষিদ্ধ। অধ্যক্ষ প্রধানা ভিক্ষুণীকে বুঝাইলেন—"ধর্ম্মকে পুনরুজ্জীবিত করতে হ'লে মাঝে মাঝে সঙ্ঘের নিয়ম লঙ্ঘন আবশ্যক।"

ভিক্ষুণীরা বিস্মিতও হইল—নিরালার ধর্ম্মানুরাগে—তার নিষ্ঠায়। তারা ভাবিল—রাজকন্যা! তার অঙ্গে শ্মশানের ত্যক্ত বসন!—দিবসের শেষার্দ্ধে অন্ন গ্রহণ!—বৃক্ষতলে রাত্রি যাপন!

নিরালা ভাবিল—"হৃদয়ের দেবতা তুমি আমার!—আমার বসন, ভোজন, রাত্রিবাস"—

ভিক্ষু অতিষ্ঠ হইল—কেবল 'তৃষ্ণা ত্যাগ' 'পঞ্চশীল' 'ত্রিশরণ' 'অষ্টমার্গযোগ' 'নির্ব্বাণ'।—একদিন নিরালাকে কহিল—"নিরালা!—অন্তরে ভোগের লালসা তোমার!—পরিপূর্ণ তৃষা। আমার সর্ব্বাঙ্গ সুধা"—

নিরালা কহিল—"থের যারা,—ভিক্ষুণীরা!—চায় না কি তারা শ্রীবুদ্ধ ভগবানে পেতে—সশরীরে—ঘ্রাণে, স্পর্শে, শ্রবণে, দর্শনে—আপনার প্রতি অঙ্গে তাঁরে অনুভব কর ত কোনো দিন?"—

ভিক্ষু হাসিয়া কহিল—"গোপিকার শ্রীকৃষ্ণ ভজনা—এ নয়!—এর নাম বৌদ্ধধর্ম্ম!"—

"তৃষ্ণাত্যাগী তোমাদের নির্ব্বাণের পূর্ণ তৃষা"—

ভিক্ষু মনে ভাবিল—"পরীক্ষা কঠিন।"

অধ্যক্ষ ভিক্ষুকে ডাকিয়া কহিলেন—"তোমার প্রফুল্লতা যেন কে হরণ ক'রেছে তুমি সাবধান!"

বহুদিন অতীত হইয়া গেল। ভিক্ষু উপায় আবিষ্কার করিল!—নিরালাকে কহিল—"আমার কার্য্য শেষ!—আজ হ'তে ভিক্ষুণী তুমি। কাষায় বসন—এই নাও। আমি যাই কাল দেশ ছেড়ে—দূরান্তরে! বহুবর্ষপরে—"

অপরূপা রাজবালা!—মুখে ব্রহ্মচর্য্যের আলো—চোখে অশ্রুমুক্তা।

ভিক্ষু নিরালাকে বাহুবেষ্টনে আনিল। তার পর—তার পর যাহা করিল—এক উপোসথ দিনে ভিক্ষু তাহাই সঙ্ঘমাঝে আত্মমুখে প্রচার করিল। আর তার শাস্তি!—তাহাকে শুক্লবসন পরিতে হইল। সঙ্ঘ হইতে সে বহিষ্কৃত হইল। নিরালার অবস্থাও অনুরূপ হইল।

নিরালা গৃহে ফিরিল না। সে কহিল—"তুমি যেথা যাবে,—আমিও সেথায় যাব—সেই মোর—"

ক্ষেমেন্দ্র কহিল—"ভুলে যাও বুদ্ধ, সঙ্ঘ, ভিক্ষু বা

ভিক্ষুণী। ফিরে যাও নিজ নিকেতনে।—আবার বলি ফিরে যাও—যদি ভালো চাও—"

নিরালা কাঁদিতে লাগিল।

"এসো তবে!"

ক্ষেমেন্দ্র দ্রুত চলিল। গাছে ঢাকা রাজার নগরী—বহুদূরে দেখা যায়। দেখা যায় শুভ্র সৌধ-শ্রেণী। পাশে সোজা লাল পথ। নিরালা সে পথে চলে, ক্ষেমেন্দ্রের পশ্চাতে পশ্চাতে—তার স্বামীর ভবনে—রমণীর তীর্থধামে—

"ওকি হোথা কোথা যাও?—চণ্ডালের বসতি হোথা;—নগরীর পচাজল, মল-মূত্র যত আবর্জ্জনা চারিদিকে;—ধূমে বাষ্পে পরিপূর্ণ"—

নিরালা যেন পাষাণ হইয়া গেল!

এক বিরাট শোভাযাত্রা রাজধানী হইতে বহির্গত হইয়া, ধীরে ধীরে চণ্ডালপল্লীর দিকে অগ্রসর হইতেছিল। কি বিপুল সে জনশ্রেণী। হস্তিপৃষ্ঠে রাজারাণী;—পাশে সংগোপনী পুষ্পের শকটে। আগে আগে কত সৈন্য—পদাতিক অশ্বারোহী। পশ্চাতে নগরবাসী—কেহ নাচে, কেহ গায়। নানাবিধ বাদ্য বাজে। ধূলা উড়ে—লাল নীল অসংখ্য পতাকা বায়ুহিল্লোলে দোলে।

রাজা আর একবার লিপি পড়িলেন—"তোমার কন্যা-জামাতা চণ্ডালের গৃহে রহে, দুজনায় উৎসব ক'রে নিয়ে এসো। ক্ষেমেন্দ্র—রাজবংশধর। বৌদ্ধ রাজা—তার পিতা—তোমার ঐ বধ্যভূমে স-মহিষী-পুত্র-কন্যা প্রাণদান ক'রেছিল। অতি শিশু ক্ষেমেন্দ্রকে ঘাতক লুকিয়ে এনে—"

সংগোপনী নিরালাকে জড়াইয়া ধরিয়া অনেক-ক্ষণ কাঁদিল! তার পর—তাহাকে লইয়া গিয়া শকটে তুলিল।

ক্ষেমেন্দ্র কহিল—"আমি অতি ঘৃণ্য, নীচ, জঘন্য চণ্ডাল।"

"ব্রাহ্মণ-কুমার তুমি"—রাজা ক্ষেমেন্দ্রকে আলি-ঙ্গনে বদ্ধ করিলেন। তার পর সোল্লাসে হাঁকিলেন—"মন্ত্রী! মন্ত্রী!—"

মন্ত্রী আসিলেন। রাজা কহিলেন—"ঐ খানে যেথায় ক্ষেমেন্দ্র লালিত হয়েছিল—ঐ ক্ষুদ্র চণ্ডাল কুটীরে—ওর উপরে সজ্জাবাম তুলে দাও।"
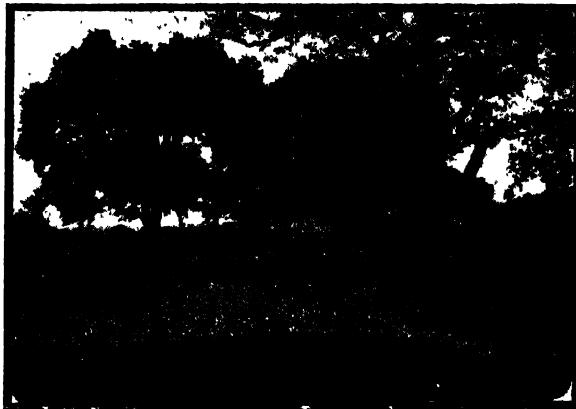
দক্ষিণ ভারতের পল্লীপথ।

কাহিনী

ঝরা-ফুল

শ্রীপূর্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

নভঃ মেঘহীন শ্রাবণ দুপুর
কোথা হ'তে নাহি জানি ?
দাঁড়ালো দুয়ারে ভিখারিণী এক
জুড়িয়া যুগল পাণি।
পাংশু-বরণ অধর গণ্ড,
দেহ-মন্দিরে আর
নাহি ক' পূজারী—পূজাও বন্ধ
যৌবন-দেবতার!
সাগর-সেঁচা সে নয়নের মণি
নন্দনে বুকে ধরি'
এসেছে আমারি কুটীরে কত না
বেদনা বরণ করি!
কমল নয়ন উজ্জ্বল করিয়া
সুকোমল তুলিকায়,
ভুবন-ভুলানো রেখা কে টেনেছে
পলাশ বরণে হায়!
শেষ অজানার অচেনার দেশে
চ'লে গেছে প্রিয়তম,
কাটিয়া সকল মায়ার বাঁধন,
ত্যজি অন্তরতম!
সদ্য-বিধবা শুভ্রবসনা
বক্ষে তনয়ে ধ'রে,
অন্তর হ'তে মর্ম্ম-ব্যথার
অশ্রু নিঙাড়ি' পড়ে!
এ কা'র সাধের সাজানো বাগান
ঝলসি' গিয়াছে হায়!
কণ্টক-ক্ষত চরণে দলিত
কে করিল যুথিকায়?

সহসা আমার মর্ম্ম-মুকুরে
চমকিল' কা'র মুখ,
পাগল-করা এ আনন আমায়
জাগায় অতীত দুঃখ!
এই তো আমারি প্রিয়ারি সে আঁখি
এ নারী নয়নে আঁকা;
ডাগর-চক্ষু, কালো-কটাক্ষ,
সুধা-মধু-বিষ-মাখা।
তেমনি করিয়ে রয়েছে জড়ায়ে
সকরুণ লজ্জায়
সেই তো আমারি প্রিয়ারি আবেশ—
বিহ্বল বেদনায়।
আমারি বধূর মাধুরী মিশায়ে
কোন্ সে চিত্রকরে—
মোহন মূরতি এঁকেছে এ চারু
চন্দ্র আনন পরে?

শুধানু তাহারে পাগল হইয়ে
হৃদয়-আগল ভাঙি,
"তোমারি করুণ কাহিনী কাননে
কি ফুল ফুটেছে রাঙি—
কহিবে কি মোরে তব জনমের
অতীতের অঙ্গনে,
কেমনে অফোটা-কমল-কোরক
ঝরিল' সুরভি-সনে?"
আনমনে বসে কি ভাবিতেছিল,
সহসা দাঁড়াল' বালা,
ক্ষীণ-তটিনীর অঙ্গে যেন রে
গোধূলির-রঙ-ঢালা!
মসীময়-কালো-মেঘের-মেলায়
নীল-নভো-মণ্ডল,
ঘন-কজ্জলে আবরিয়া গেছে
ধরণীর অঞ্চল!

কাতর-বচনে রমণী আপন
কহিল জীবন-কথা—
আগুন-লাগানো-কুটীর হইতে
কেমনে তরুণী-লতা
এসেছে ছুটিয়া নিঠুর সে জমী-
দারের কবল হ'তে,
চক্ষের' পরে ধূলি দিয়া সব
দলবল কল-স্রোতে।
পাগলিনী-সম আগলি' বুকের
রতন মাণিকে হায়,
'ঝাউগ্রাম' দিয়া এসেছে ছুটিয়া
নির্জ্জনে নিরালায়!
তার পরে কত দিবস রজনী
মিশিল কালের কোলে,
মাসের মন্থরতার-গমনে
বয়ষ পড়িল ঢ'লে।

*　　*　　*

একদিন প্রাতে ধরণীর মাথে
পূর্ব্ব অচল হ'তে,
অবগুণ্ঠিতা উষা-বধূ যবে
নামিছে আলোর রথে;
কনক-কিরণ বাহিয়া বাহিয়া,
দূরে শুকতারা ফেলি',
মিশা'লো সরম মনের মরমে
ফাগুনের হোলি খেলি'।

তিমিরাবৃত জীবন-পথের
প্রান্ত উজলি' সে—
চলে' গেল' হায় শান্তি-সীমায়
যেন এক নিমেষে!
তার পরে আর নাহি বলিবার,
নাই গো শকতি নাই,
বক্ষ-দুয়ারে কে করে আঘাত—
যাই তবে যাই যাই।
শিহরি' উঠিল বালিকার' সেই
ননীর কোমল হিয়া,
অশ্রু-ধারার মুকুতার মালা
উঠিল চঞ্চলিয়া!
যেন গো ভগ্ন পরাণ-পবতে
কে দিল' হাতুড়ি ঘা'—
আমি আর সেই আমি নাহি, র'নু
নিবলস চাহিয়া!
বলিবার ভাষা সাগর মথিয়া
কোন' সান্ত্বনা-বাণী,
নাহি পেনু হায়,—হৃদি-বেদনায়
নয়নের কোণে আনি'
থামানু দু' ফোঁটা তপ্ত অশ্রু,
মর্ম্ম-মথন-করা;
আর ভাবিলাম জমীদার-নাম
কলুষ-কীর্ত্তি-ভরা!
কত কাল ধ'রে এ নারী ঝরা'বে
কেবলই নয়ন-লোর,
বহিবে কি শুধু বালিকা এ বধূ
পরাণে পাষাণ-ডোর!

———

জীবন-চরিত

তরু দত্ত

শ্রীপ্রিয়লাল দাস, এম-এ, বি-এল

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

রাম বাগানের দত্ত কবিদের মধ্যে বহুমুখীন প্রতিভা লইয়া মিঃ রমেশচন্দ্র দত্ত, আই-সি-এস, সি-আই-ই, ব্যতীত অপর কেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই। কর্ম্ম-জীবনে তাঁহার মত কোনও বাঙ্গালী সিভিলিয়ান স্বদেশ ও স্বজাতির সেবা করেন নাই। ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত করিয়া তিনি আর্য্যগণের প্রাচীনতম জ্ঞান-ভাণ্ডার বাঙ্গালীকে দান করিয়া গিয়াছেন। সাহিত্যিকের অপরিমেয় দান বর্ণধর্ম্ম মানে না। পৌরাণিক যুগে আর্য্যগণের কীর্ত্তি-কাহিনী সেইজন্য রমেশচন্দ্র পদ্যময় ইংরাজি ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়া ইংরাজ ও ইংরাজি শিক্ষিত ভারতবাসীকে শুনাইয়াছেন। অধঃপতিত পরাধীন জাতি যতদিন না পূর্ব্বপুরুষগণকে শ্রদ্ধা ও ভক্তির চক্ষে দেখিতে শিক্ষা করে ততদিন তাহাদের উন্নতির আশা করা বৃথা। রমেশচন্দ্র এদেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের উপর পাশ্চাত্যের প্রভাব দিব্যচক্ষে দেখিয়া বুঝিয়াছিলেন যে, ভারতবাসী পাশ্চাত্য আদর্শকে অনুসরণ করিয়া জাতীয়-জীবনের পথে অগ্রসর হইলে এমন দিন আসিবে যখন তাহার জাতিগত বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ লোপ পাইবে। তিনি জানিতেন যে, মাতৃভাষা জাতীয়তার প্রধান উপাদান, কিন্তু সাহিত্যের উপযোগী বাঙ্গালা ভাষায় মনোভাব লিপিবদ্ধ করিতে তাঁহার লেখনী প্রথমটা অভ্যস্ত ছিল না। রমেশচন্দ্রের পিতৃবন্ধু সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁহাকে মাতৃভাষায় পুস্তকাদি লিখিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। যে বৎসর তরুদত্ত স্বর্গারোহণ করেন সেই বৎসর (১৮৭৭ সাল) রমেশ চন্দ্র জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যোগেশবাবুকে পত্র লিখিয়া জানাইয়াছিলেন যে, তিনি মাতৃভাষার সেবায় প্রবৃত্ত হইতেছেন। বাস্তবিক, রামবাগানের দত্ত কবিদের মধ্যে রমেশচন্দ্রই বঙ্গভাষার সর্ব্বপ্রথম সাহিত্যিক। এই বৎসরেই তিনি "বঙ্গের সাহিত্য" (Literature of Bengal) নামে সুপরিচিত পুস্তক প্রকাশিত করিয়াছিলেন। ইংরাজি ভাষায় লিখিত বঙ্গ-সাহিত্যের ইহাই সর্ব্বপ্রথম ইতিহাস। তাহার খুল্লতাত রায় শশিচন্দ্র দত্ত বাহাদুরের নামে ইহা উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল। বাঙ্গালীর যে একটা সাহিত্য ছিল, এ কথা শুধু ইংরাজ কেন, এদেশের তৎকালীন ইংরাজি শিক্ষিত বাঙ্গালীরাও জানিতেন না। আলোচ্য পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইলে সুবিখ্যাত ইংরাজি সংবাদপত্র ইংলিশম্যান (The Englishman) তাঁহার সমালোচনায় লিখিয়াছিলেন,—"It will surprise many to learn that Bengali has a literature worth writing about."—রমেশচন্দ্র এদেশের প্রাচীন সাহিত্যের আলোচনায় যথার্থই ডুবিয়া গিয়াছিলেন। বঙ্গীয় সাহিত্যের একটু খানি অধিকারের বাহিরে সংস্কৃত ভাষায় লিখিত

মানব জাতির আদি সাহিত্যের সীমাহীন রাজ্যে প্রবেশ করিয়া তিনি এদেশের প্রাচীন সভ্যতা সম্বন্ধে যে বিপুল তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন তাহারও ইতিহাস তিনি "প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে" (Civilization in Ancient India) লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। বাঙ্গালা ও ইংরাজি গদ্য সাহিত্যে রমেশচন্দ্র অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিলেও ইংরাজি-ভাষায় রচিত যে সকল কাব্য-গ্রন্থ তিনি প্রকাশিত করিয়াছিলেন তাহার মূল্য নেহাত কম নয়। তাঁহার "কর্ম্ম-জীবনের স্মৃতি" নামক (Reminiscences of A Workman's Life) কাব্য-গ্রন্থ ১৯০২ সালে আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু বান্ধবগণের মধ্যে বিতরিত হইবার উদ্দেশ্যে মুদ্রিত হইলেও এই কবিতা-পুস্তকে সন্নিবিষ্ট অনেকগুলি কবিতা তাঁহার কিশোর বয়সে রচিত হইয়াছিল। তরু দত্ত যে বৎসর (১৮৬৯ সালে) য়ুরোপ-যাত্রা করেন, তাহার পূর্ব্ব বৎসর (১৮৬৮ সাল) রমেশ চন্দ্র ইংলণ্ডে গমন করিয়াছিলেন। পথিমধ্যে তিনি ভূ-মধ্যসাগরে ভাসমান অর্ণবপোতে "নির্ব্বাসিত" (The Exile) নামে যে খণ্ড-কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, তাহাই তাহার ইংরাজি কবিতা রচনা-ক্ষেত্রে প্রথম উদ্যম বলিয়া মনে হয়।

It is the sunny April,—
  My native skies are blue ;
My native fields are painted fresh
  In nature's fairest hue ;
It is the season of the year
  When life the sweetest seems,
When brightens Age's cheerless face,
  And Youth is lost in dreams !

It is the sunny April,—
  But what is that to me ?
An exile rom my father's home,
  A wanderer o'er the sea !
Ten thousand waves around me rage,
  And roar in wanton glee,
The sea wind soundeth in my ear,
  A boisterous melody !

3

It is the sunny April,—
  The April of my life !
Ambition sounds her bugle wild,
  It is the time for strife.
Away each timid, pensive thought,
  Ye treach'rous drops away,
I'll follow that soul-maddening tune,
  O ! lead me where it may !

১৮৬৮ সালের এপ্রিল মাসে এই কবিতা রচিত হইয়াছিল। উক্ত মাসে রচিত আর একটি স্বল্পায়তন কবিতায় রমেশচন্দ্র ভূ-মধ্যসাগরের যাত্রীর মনোভাব প্রকাশ করিয়াছেন। "গৃহ" (Home) নামে এই রচনায় বাঙ্গালী কবির হৃদয় বর্ণে বর্ণে গলিয়া বাহির হইয়াছে।

রমেশচন্দ্র দত্ত।

I

I stand upon the airy deck,
  And gaze upon the wide wide sea,

Yon distant hills a purple speck,
Yon sea-fowls swimming merrily,
But in whatever realms I roam,
My heart still yearns for thee, My Home.

2

I've been among the spicy trees
Of Ceylon's most enchanted land,
I've been where beat the eternal seas
'Gainst Aden's barren rocks and sand !
But in whatever realms I roam,
My heart still yearns for thee, My Home.

3

I've been where Pompey's lofty spire
Since thousand years hath braved the sky,
I've trod the floor where,—souls of fire,—
The knights of St. John buried lie,
But in whatever realms I roam,
My heart still warms for thee, My home.

4

In foreign climes when wandering long
Still shall I mourn thy countless woes,
The Rhine, the Thames, the dark blue Rhone
Will call to mind where Ganges flows.
For in whatever realms I roam,
My heart still yearns for thee, My Home.

রমেশচন্দ্র ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার জন্য ১৮৬৮ সালের ৩রা মার্চ্চ কলিকাতা হইতে যাত্রা করিয়াছিলেন। তখন তাঁহাব বয়স মাত্র উনিশ বৎসর। মিঃ সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জি (স্যার সুরেন্দ্রনাথ) ও মিঃ বিহারীলাল গুপ্ত তাঁহার সহযাত্রী হইয়া ডায়মণ্ড হারবার হইতে "মূলতান" নামক জাহাজে ইংলণ্ডাভিমুখে যাত্রা করেন। ইংলণ্ড যাত্রার বহু পূর্ব্বে ১৮৬৪ সালে পনেরো বৎসর বয়সে রমেশচন্দ্রের বিবাহ হইয়াছিল। বিবাহের পরে তিনি ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়াছিলেন। দুইটী কন্যারত্ন জন্মগ্রহণ করিবার পর রমেশচন্দ্র গোপনে গৃহত্যাগ করিয়া উক্ত বন্ধুদ্বয়ের সহিত ইংলণ্ডে গমন করেন। "নির্ব্বাসিত" ও "গৃহ" নামে উক্ত কবিতা দুইটিতে রমেশচন্দ্রের আন্তরিকতা সেইজন্য যে ভাবে পরিস্ফুট তাহার মর্ম্মগ্রহণ করা পাঠকের পক্ষে সহজ বলিয়া মনে হয়। রমেশচন্দ্রের জীবনী-লেখক মিঃ জে, এন, গুপ্ত, আই-সি-এস প্রবাসী রমেশচন্দ্রের প্রথম পত্রখানি তাঁহার জীবন-চরিতের ১৭—১৮ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন। এই পত্র রমেশচন্দ্র জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যোগেশচন্দ্রকে লিখিয়াছিলেন। ইহাতে গৃহত্যাগী উক্ত বন্ধুত্রয়ের মনোভাব সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

"But as we sat for hours together on the deck watching this still nightly scene, other thoughts than those suggested by the scene oft arose in our minds. For we have left our home and our country, unknown to our friends, unknown to those who are nearest and dearest to us, staking our fortune, staking all, on success in our undertaking which past experience has proved to be more than difficult. The least hint about our plans would have effectually stopped our departure, our guardians would never have consented to our crossing the seas, our wisest friends would have considered it madness to venture on are impossible undertaking. Against such feelings, and against the voice of experience and reason, we have set out on this difficult undertaking—stealthily leaving our homes—recklessly staking everything on an almost impossible success. Shall we achieve that success ? Or shall we come back to our country impoverished, socially cut off from our countrymen, and disappointed in our hopes, to face the reproaches of advisers and the regrets of our

friends ? These thoughts oft arose in our minds in the solemn stillness of the night, and the prospect before us seemed to be gloomier than the gloomy sky, and the gloomy sea around us, without a ray of hope to enlighten the dark prospect."

রমেশচন্দ্র লণ্ডনে অবস্থানকালে যে কবিতাগুলি রচনা করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে কয়েকটি আলোচ্য স্মৃতি-কাব্যে স্থান পাইয়াছে। "লণ্ডনের অনাথ বালক বালিকাদিগের প্রতি" (To Children at the Foundling Hospital, London) নামে ১৮৭০ সালে রচিত কবিতাটিতে বাৎসল্য প্রেমের পরিচয় পাওয়া যায়। বালক বালিকাদের কণ্ঠনিঃসৃত মধুর সঙ্গীতে কবির হৃদয়ে যে পবিত্রভাব জাগিয়া উঠিয়াছিল তাহার সহিত কবিত্ব মিশিয়া গিয়া এই কবিতার প্রত্যেক ছত্রে রমেশচন্দ্রের উদার-হৃদয়ের বার্ত্তা ব্যক্ত হইতেছে।

I

Sweet pretty things ! Who to your tongue
Could give a voice so soft and dear ?
How song so sweet your holy song
Like cherubs of th' etheresl sphere ?

2

Or 'tis the native melody,
Of childhood's heart of sinlessness !
Spontaneous music flowing free,—
An echo from a soul of bliss !

3

In thrilling voice so sings the lark
The deep felt feelings of his heart,
So sings the night-bird, hid in dark,
Till woodlands lone in music start ?

4

Ye children fair ! how on each face,
As blooming fresh as flowers of May,
Still could I gaze for hours and trace
Of human life the poetry !

5

The infant feelings void of guile,
On every face reflected clear !
The passing shade, the glowing smile,
Like new-born sun-beams fresh and fair !

6

Though on your birth a stain shall last,
Though born in shame and bred in woe,
Though penury's cold chilling blast
Had almost froze life's early flow.

7

For Sorrow's child there is a rest,
A wealth byond the miser's dreams !
Go reap fair Virtue's treasures blest,
'Tis free to all as heaven's own beams !

"পিতার কবর" (The Father's Grave) ও "আয়ারল্যাণ্ডের প্রতি" (Lines on Ireland), —এই দুইটি কবিতা পাঠ করিয়া বুঝা যায় যে, বৃটিশদিগের জাতীয় জীবনের অনেক ঘটনার সংবাদ রমেশচন্দ্র সংগ্রহ করিতেছিলেন। এই কবিতা দুইটি ১৮৭০ সালে রচিত হইয়াছিল। আয়ারল্যাণ্ডের দুর্ভাগ্যের কথা স্মরণ করিয়া কবির কাতর হৃদয় কাঁদিয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু আশাহীন হয় নাই। শেষোক্ত কবিতাটি তিনি এই ভাবে সমাপ্ত করিয়াছেন,—

7

And must this emerald isle for aye
Remain in endless penury ?
And mourn the night that knows no day
This home of patriots bold and free ?
Queen of a thousand ocean wave !
Land of the Shamroc and the brave !

8

Rend Future ! Rend thy mistry veil,
A glorious day is still to shine.
And as in the antique days this isle,
Shall be once more the dearest shrine
Of freedom born in skies above,
Of truth and valour and of love !

রমেশচন্দ্রের জীবনীতে লিখিত আছে যে, তিনি ১৮৭০ সালের জুন ও জুলাই মাসে আয়ারল্যাণ্ড ও ওয়েলসে পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। আইরিশ কৃষকগণের দারিদ্র্য তিনি স্বচক্ষে দর্শন করিয়া লিখিয়াছিলেন,—"গ্রামের লোকেরা যথার্থ ই অত্যন্ত গরীব। স্বামী, স্ত্রী ও পুত্রকন্যাগণ, যাহাদের সংখ্যা খুব বেশী, প্রায়ই দেখা যায় একই ভূমিখণ্ডে রৌদ্রে ও বর্ষার জলে কাজ করিতেছে। তাহারা একসঙ্গে একই কুটীরে বোধ হয় শূকর ও হাঁসের সহিত রাত্রি যাপন করে।" আলোচ্য কবিতাটি আয়ারল্যাণ্ডেই রচিত। আয়ারল্যাণ্ড যাত্রার পূর্ব্বে উক্ত সালের এপ্রিল মাসে রমেশচন্দ্র লণ্ডনে অবস্থানকালে "ভারতবর্ষ" (Lines on India) নামে যে কবিতা লিখিয়াছিলেন তাহাতে স্বদেশের অতীত ইতিহাসের স্মৃতি কবির অন্তরে অমৃত-ধারা বর্ষণ করিয়াছিল।

LINES ON INDIA.

1

'Twas once great Ganga ! on thy shore
I silent stood one eventide,
Thy rushing waters ran before,
Frowning, dashing in their pride,
And foaming down unchained and free,
And reckless in their boisterous glee.

2

I heard thy sea-like solemn roar,
I marked thy billows fierce and free,
I deemed the land thou rollest o'er
Must be the land of liberty,
Alas ! the soil thy waters lave
Has been for aye fair Freedom's grave !

3

Is this the land of ancient pride
Where Freedom lived, where heroes bled?
Ask of these regions vast and wide
From billowy sea to mountains dread !
Hark, every spot in India wide
Doth tell a tale of ancient pride !

4

Hark, every pass and every hill
Recalls the days of liberty !
Hark, how from every peak and rill,
From echoing vales, from woods and lea,
Awakes one voice of maddening glee,
The thrilling voice of liberty !

5

In vain ! In vain ! the stirring voice
No echo finds in haunts of men,
From peopled marts no sounds arise,
No hamlets answer back again.
What silent all ! No sound, no breath !
A nation sleeps---the sleep of death !

6

The children of a godlike race
Sleep senseless of their glorious past,
Or void of strength and manly grace
They tremble at each passing blast,
Unconcious of their ancient name,
Unmindful of their father's fame !

7

Enough ! Enough ! What boots it then
To sing of days now passed away,
In halting verse why call again
The glories which have had their day ?
Because I cannot e'er forget
My ancient country once so great.

8

Remembrance sweet ! mine be it then
To muse on days when brightest shone
Thy light among the haunts of men,
Thy glories bright as Eastern Sun !
Thy Strength of thought, thy Manhood's
power !
Thy wealth of song, thy Beauty's dower!

রমেশচন্দ্র সুদূর প্রবাসে গঙ্গার তরঙ্গমালার চিত্র ভুলিতে পারেন নাই। ১৮৭১ সালে "বিহারী লাল গুপ্তের উদ্দেশে" (To B. L. G.) যে কবিতা রচিত হইয়াছিল তাহাতেও কবির জন্মভূমির এই স্রোতস্বিনীর কলনাদ শুনা যায়। এই কবিতায় রমেশচন্দ্রের ছাত্র-জীবনের স্মৃতি জাগিয়া উঠিয়াছে।

3

The evening hours we happy passed
By rolling Gunga's billows strong,
Or heard her solemn sea-like voice,
Or chanted loud as wild a song.

4

The twilight hours we silent spent
Romantic in those village scenes,
Or smiled on Nature's placid face,
Or wept on human woes and sins.

5

Days that we have struggled through
Ceaseless with our college schemes,
Slow we paced rhe college walls,
Raised a thousand wild'ring dreams.

6

Nights that we have talked together,
Talked of youthful feelings wild,
Talked of aspirations high,
Wept on woes and hopes beguiled.

8

Fair scenes of friendship, scenes of home!
How oft those thoughts my bosom
greet !
Like visions of another world,
Steal recollections passing sweet !

১৮৭১ সালের অক্টোবর মাসে রমেশচন্দ্র লণ্ডন হইতে গৃহাভিমুখে যাত্রা করেন। ইহার পূর্ব্বে তিনি জানুয়ারী মাসে "আশ্চর্য্য রোগমুক্তি" (The Wonderful Cure) নামে একটি কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। ইহার উপকরণ পারস্যের সুপ্রসিদ্ধ কবি সাদির কথা সাহিত্য হইতে গৃহীত হইয়াছিল। উক্ত বৎসর আগষ্ট মাসে রমেশচন্দ্র "রোজামণ্ডের প্রতিশোধ" (Rosamond's Revenge) নামে একটি দীর্ঘ কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। ইহার গল্পাংশ গিবন্-লিখিত "রোমান সাম্রাজ্যের পতন" নামে সুপরিচিত ইতিহাসের ৪৫শ অধ্যায় হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল। ১৮৭০ সালের ডিসেম্বর মাসে ফ্রাঙ্কো-জারমান যুদ্ধোপলক্ষে রচিত কবিতায় (The War of 1870) আমরা তরু দত্তের "ফ্রান্স" শীর্ষক কবিতার প্রতিধ্বনি শুনিতে পাই। তরু দত্তের ন্যায় রমেশচন্দ্রও ফ্রান্সের ভাগ্যোদয় কল্পনা করিয়া উক্ত কবিতার শেষ শ্লোকে লিখিয়াছিলেন,—

But if the ruthless Prussian bands
The claims of mercy will deny
And wrench from French her homes
and lands,
The Frenchman knows the hour to die!
For hark the sound ! the trumpet's call
With shriller accents never rose,
The maddened millions of proud Gaul
Will smiling die or drive the foes.
And every drop for freedom shed
Will call for vengeance for the dead!

তরু দত্ত ১৮৭৩ সালে ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। ইহার পূর্ব্বে তিনি উক্ত "ফ্রান্স" শীর্ষক কবিতা ব্যতীত অন্য কোনও ইংরাজি কবিতা রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া আমরা জানি না। তবে, "ফ্রেঞ্চ-সাহিত্য-ক্ষেত্রে সংগৃহীত কবিতা-গুচ্ছ" শীর্ষক কাব্য-গ্রন্থের অনেক কবিতা যে তরু ও অরু ইংলণ্ডে অবস্থানকালে রচনা করিয়াছিলেন, ইহা নেহাত অনুমান-সাপেক্ষ নহে। প্রবাসে রচিত রমেশচন্দ্রের উপরোক্ত কবিতাগুলির কোনও প্রভাব সেইজন্য তরু দত্তের ইংলণ্ডে অবস্থানকালে রচিত কোনও কবিতায় দেখা যায় না। ফ্রাঙ্কো-জারমান যুদ্ধ-সম্পর্কে রচিত উক্ত কবিতা দুইটিতে যে ভাবের ঐক্য আছে তাহার কারণ তরু ও রমেশচন্দ্র উভয়েই ১৮৭০ সালে এই যুদ্ধ ব্যাপারে ইংলণ্ডে যে উত্তেজনার স্রোত বহিতে ছিল তাহার সহিত মিশিয়া গিয়াছিলেন। এই যুদ্ধই তরু দত্তের ফ্রান্স বিদ্যা-শিক্ষালাভের অন্তরায় হইয়াছিল। তাঁহার জীবন-চরিত লেখকগণ বলেন যে, ফ্রান্সের পরাজয়-বার্ত্তায় ইংলণ্ডপ্রবাসী দত্ত-পরিবারের, বিশেষতঃ তরু দত্তের মন চাঞ্চল্য হেতু বিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। তরু ও রমেশচন্দ্রের মধ্যে ধর্ম্মের বৈষম্য হেতু হৃদয়ভাবের কিছুমাত্র অসমতা ছিল না, বরং খুবই মিল ছিল বলিয়া মনে হয়। তরু ও তাঁহার পিতার সহিত রমেশচন্দ্র প্রায়ই লণ্ডনে দেখা করিতেন। মিঃ হরিহর দাস-লিখিত তরু দত্তের জীবনী পাঠে জানা যায় যে, লণ্ডন ও লণ্ডনবাসিদের সম্বন্ধে রমেশচন্দ্রের অভিজ্ঞতা বেশী ছিল বলিয়া গোবিনচন্দ্র দত্তের পরিবারবর্গ অনেক বিষয়ে তাঁহার পরামর্শ শুনিতেন। দত্ত কবিরা লণ্ডনে অবস্থানকালে যখন একত্র সম্মিলিত হইতেন তখন যে তাঁহারা সাহিত্যালোচনা করিতেন, এই অনুমান অসঙ্গত নহে। গোবিনচন্দ্র দত্ত ও তাঁহার কন্যাদ্বয় তরু ও অরু এবং রমেশচন্দ্র এই মিলন-ক্ষেত্রে পদ্যময় ইংরাজি ভাষায় রচিত বা অনূদিত তাঁহাদের কবিতাগুলি সম্বন্ধেও যে আলোচনা করিতেন, এই অনুমানও অসঙ্গত নয়। বাস্তবিক, তরু দত্ত তাঁহার কবি-জীবনের সেই যুগে ফ্রেঞ্চ সাহিত্য ক্ষেত্র হইতে কবিতা-সংগ্রহ কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া অনুবাদমূলক কাব্য-সাহিত্যে যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন তাহা তিনি ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিবার পরে তাঁহার রচিত "কবিতা গুচ্ছে" পর্য্যবসিত হয় নাই। পাশ্চাত্যের এই অভিজ্ঞতা ও শিক্ষা তরু দত্তকে সংস্কৃত সাহিত্য-ক্ষেত্রেও সংগ্রহ-কার্য্যে ব্যাপৃত রাখিয়া পৌরাণিক জগতের উৎকৃষ্ট চিত্রাবলী পদ্যময় ইংরাজি ভাষায় অনূদিত করিতে প্রণোদিত করিয়াছিল। ইহার ফলে "প্রাচীন ভারতের গাথা ও কাহিনী" তাঁহার লেখনী হইতে জন্মলাভ করিয়াছিল। তরু দত্তের ন্যায় কবি রমেশচন্দ্রও পারস্যের যে কাব্য-কুঞ্জ হইতে কবিতা-প্রসূন চয়ন করিয়া ইংরাজি ভাষাকে উপহার দিয়াছিলেন, ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার পরেও তিনি তাহার প্রভাব উপেক্ষা করিতে পারেন নাই। ১৮৭২ সালে রমেশচন্দ্র কলিকাতায় অবস্থানকালে পারস্যের কবি সাদির কবিত্বময় রচনা হইতে "সৌন্দার্য্যের স্বপ্ন" (A Vision of Beauty) নামে একটি মনোহর কবিতা ইংরাজি পদ্যে অনূদিত করিয়াছিলেন। "সৌন্দর্য্যের স্বপ্ন" মাধুর্য্যময় গীতি-কবিতার ছন্দোবন্ধে প্রেমিক কবির পরিপূর্ণ হৃদয়কে সংযত রাখিতে পারিতেছে না!

8

Happy Youth ! whose eye each morn
  Opens on so sweet a face !
Happy youth ! whose night's last glance
  Closes on so sweet a face !

9

Intoxication from the red wine
Ceases when night fades away,
Intoxication with such beauty
Ceases not till judgment day !

যৌবনের স্বপ্ন যখন ভাঙ্গিয়া গেল কবি তখন বাঙ্গালা দেশের বিভিন্ন জেলায় বাস্তবতার অভিজ্ঞতা লাভ করিতেছেন। কবির হৃদয়ে উচ্চাভিলাষ যে জাঁকিয়া বসিতেছে তাহার প্রমাণ আমরা ১৮৭৩ সালে রচিত একটি কবিতায় পাই। রমেশচন্দ্র তখন বনগ্রাম মহকুমার সব ডিভিসনাল অফিসরের পদে অধিষ্ঠিত। এই কবিতার নাম যদিও "জীবনের শেষ স্বপ্ন" (The Last Dream of Life), তাহা হইলেও ইহাতে তিনি যে তাঁহার ভাবী কর্ম্ম-জীবনের স্বপ্নময় আশার উল্লেখ করিয়াছেন তদ্বিষয়ে সন্দেহমাত্র নাই। যৌবনের বন্ধুত্ব ও ভালবাসাকে জলাঞ্জলি দিয়া কবি শেষ শ্লোকে বলিতেছেন,—

There's one hope yet. Still shines afar
E'en like a steady beacon flame,
Ambition's bright and lofty star,
The brightly beaming star of Fame !
Great, noble deeds, attempted, done,
Life's battle boldly faced and won,
For this my bosom burns,
If this last hope deceitful turns,
I care not,—Dust to Dust returns.

রমেশচন্দ্র স্বরচিত খণ্ড কবিতাগুলির ভিতর দিয়া আত্মকথা যে ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার প্রশংসার্হ আন্তরিকতার প্রমাণ পাওয়া যায়। কর্ত্তব্যময় কর্ম্ম-জীবনের শৃঙ্খলতার মধ্যে আসিয়া মিঃ দত্ত দার্শনিকের মত চিন্তাশীল হইতেছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার কবি-কল্পনা অবকাশ পাইলেই তাঁহাকে বাঙ্গালা দেশের বাহ্য প্রকৃতির অনন্ত সৌন্দর্য্যের মধ্যে লইয়া যাইত। বনগ্রামে অবস্থানকালে শরতের স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না-পুলকিত যামিনীর সৌন্দর্য্য বর্ণন করিয়া রমেশচন্দ্র যে কবিতা রচনা করিয়াছিলেন তাহার তুলনা নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের সুজলা সুফলা মলয়জশীতলা শস্যশ্যামলা বঙ্গমাতার সর্ব্বপ্রথম পদ্যময় ইংরাজি ভাষায় আভাসে বর্ণনা এই কবিতাতেই পাওয়া যায়।

Autumn-Night In A Bengal Village.

I

'Tis midnight, and the bright autumnal moon
Flings radiance on the golden Aush crops
That grow in wild profusion, stretching far
Around me, bending with their load of corn ;
And on the varnished green of Amon fields
Sheds softer brilliance. Silvers all the scene,—
The fields, the distant huts, the tops of trees,
And glitters on the swelling Indian stream,
And makes it almost day.

2

All, all is light,
Save where the pepul rears his aged height,
O'er acres throws his ancient out-spread arms
And flings a sombre darkness on the ground,
A sight of noble majesty in woe,
A sight of deep-felt, self-collected gloom,
In midst of light and joy. Save where in shade
The bamboo trees appear in lighter green,
And graceful throw their bending branches out,
Like rockets bursting in the open sky,
Then gently falling on the earth again.
Save where the distant line of darksome trees
O'ershade and fence some humble village in,
And humble huts and tanks and jungle shrubs
Primeval rural scene, where harmless birds

Build nests in ancient trees or weed-grown lakes,
And simple creatures live with brother man,
He simple, even as they.

3

All, all, is still,
Save when the passing wind breathes soft and sweet,
And shakes forth music from the pepul tree,
And wakes the ripples on the spacious stream.
Save when the sleepless dog howls at the moon,
And breaks the calm of night. Save when perchance
Some half sung strain of some lone villager
Comes floating o'er the stillness of the air,
Its rudeness mellowed by the distance long,
And sets my thoughts to music, fills my heart
With past recollections.

4

All nature sleeps
Save those, not few I ween, those kept awake
By qualms of conscience or the throes of woe,
By carking cares that mock the power of rest,
By sleepless thoughts of ill-requited love,
By midnight watchings by the bed of the death,
By grief for those they miss around their hearth,
By grief for those they ne'er shall see again,
O! woful, woful heritage of man!

রমেশচন্দ্রের দীর্ঘতম খণ্ড কবিতা ১৮৭৪ সালে যখন তিনি পলাশীর সন্নিকট মেহেরপুরে সব্-ডিভিসনাল্ অফিসরের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন সেই সময়ে লিখিত হইয়াছিল। কবি বোধ হয় সরকারি কার্য্যোপলক্ষে নৌকারোহণে ধান্য-ক্ষেত্রের ভিতর দিয়া জলপথে গমন করিতেছিলেন। বর্ণনার মনোহারিত্বে ও ভাবের গভীরতায় এই কবিতা অননুকরণীয়। জ্যোৎস্না-প্লাবিত আমন ধান্যের ক্ষেত্রে কবি এক বৃদ্ধ কৃষকের দুঃখময় জীবনের কাহিনী শুনিয়া শোকার্ত্তহৃদয়ে যে করুণ-সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন, তাহার বর্ণে বর্ণে সহৃদয়তা ও সমবেদনা কবি-হৃদয়ের আকুলতা ব্যক্ত করিতেছে।

Autumn-Night In A Bengal Rice-Field.

Far and near the moonbeams fall
On the rice, luxuriant, tall,
Bounteous nature's richest scene,
Endless sea of waving green!

*   *   *   *

Yon dark line of deaper hue
Is a village in our view,
Pass the island village by,
Stretches still the Amon sea.
'Tis evening now, my boat goes on
Still rustling through the green Amon,
On either side they bending gently,
Leave a way as reverently,
No sound is in the earth or sky,
Save of my boat that rustles by.
Save of some boatman's distant cry
In evening stillness faintly heard,
Save note of some wild lonesome bird,
That on the plant had built her nest,
And nestled there in quiet rest.
She sees the intruding boat and flies,
And flapping upwards fills the skies
With clamours against intruding men,
Disturbers of her nightly reign.

*   *   *   *

I stretch myself the bark upon
And gaze upon the bright full moon.
O! Autumn's moon is clear and bright,
And sheds a dazzling flood of light,
I gaze, and think, and gaze again,
And pensive fancies fill my brain.
The mellow stillness of the scene,

মিঃ জে, এন, গুপ্ত আই-সি-এস।

The moonbeams sleeping on the green,
The dark line of the hazy shore,
The drip from the suspended oar
Like music on my ear soft stealing,
Fill my heart with tender felling !
Ah ! tender thoughts of days gone by,
When hope was high and blood was young,
When love was new and friendship strong.
But soft ! I hear a distant song,
And sound of boatmen's dashing oar,
And in an instant see before
Some boats that swiftly pass along.
The merry tillers of this place,
Await a goodly harvest yield,
And with no work at home or field,
With gladsome heart they hold a race !
And loud they sang some stirring song,
Composed by some unlettered bard,
And all their oars plied quick and hard
Keep time to their tempestuous song !
For their's a life of joy and sorrow,
Without a care or thought of morrow,
Their Zemindars are rich and great,
And paddy lenders hard as fate !
The tillers have no thought of saving,
Borrowing live all twelve-month round,
And when the autumn floods come round
Hold their *back* and merry-making !
I'd merrily lead a boatman's life,—
Ah ! censure not a poet's d eam,—
Their joys and woes a mingled stream,
Their artless converse, simple life,
Are dear to me. Then would I row
My little fish-boat to and fro,
Then would I toil, and sing the while,
From morning's glow till evening's smile.
And when my work and toil was o'er,
Would hasten to my cottage door.
For there, my love, my village fair,
The gentle partner of my care,
She would my daily meals prepare,
And wait beside the cottage door,
With throbbing heart and anxious thought,
To view the far benighted boat,
To meet her loving spouse though poor.

* * *

For sooth, a boatman's life I'd lead,
A life of sweet content in need,
And where yon topes of mango tree
Disclose long vistas to the eye,
And clumps of arched bamboo green
Create a cool and fairy scene,
And humble huts beneath yon tree
Bespeak content in poverty,
There, there mid scenes of sweet repose,
With summer breeze its music lending,
And shade and sunshine sweetly blending,
Mid scenes of mingled joy and woes,
Content to till the live-long d y,
I'd work and sing my life away.
Where mango branches spread above,
And Kokil sings eternal love,
I'd lay me on the bright green grass,
In toil and rest my hours would pass.

* * *

Thou bird of love and winsome art !
And simple-hearted village men,
With lusty limbs and open mien,
And gentle,bashful village girls,
With down-cast eyes and raven curls,
And healthy limbs, and rounded arms,
And gentle face and sable charms,
Would meet their fond familiar friend,
And tales of joys and woes would blend,
Smile o'er the prospects of the year,
And for their sorrows claim a tear.
Dearer to me such converse kind
Than polished art and talk refined,
Where midst the honied words, I feel
The heart, the heart, is wanting still.
But truce. What sounds my ear assail,
At midnight hour what voice of wail ? *
Upon the islet village standing,
Upon the waters eager bending
Her locks dishevelled on the air,
Her arms extended, bosom bare,
Oppressed with woe, oppressed with fears,
A very Niobe in tears,
Why, with repeated shrieks of pain,
Doth she disturb night's silent reign ?
She's heard,—her father old and grey
Has mid the waters lost his way,
Drowned where 'tis ten feet deep or more,
Not lon . ago, not far from shore,
What pain, what woes more cruel prove
Than death of those we fondly love ?
Speed, speed my boatmen swiftly on
Like lightning through the tall Amon !
The boat flies bouncing o'er the wave,
Perchance the man we still may save.
But long before we reached the goal,
A braver heart, a kinder soul,
Had jumped into the midnight wave,
And saved the old man from his grave.
"Old man ! the hair upon thy head
Is gray," 'twas thus to him I said,
"Thy frame is feeble, steps all slow,"
Why in this midnight's feeble ray
Did'st venture lone this watery way ?"
"Sire !" 'twas thus to me he said,
"The hair is gray upon my head,
My eyes have lost their wonted glow,
My frame is feeble, steps all slow,
Yet in this midnight's feeble ray,
Still must I cross this watery way.
My boy—great Alla bless his soul!
My boy—the darling of my soul,
For years wide fertile acres held,
And paid his rent and ploughed his field,
And reaped his harvest, gentle boy,
And filled my aged heart witb joy.
But Alla gives and takes away,
And each hath his ordained day,
The arrow sped,—I only grieve,
It struck not me my boy to save."
The old man slowly bent his head,
And fast and thick the tear-drops sped.
I silent marked the old man's grief,
It gave his swelling heart relief.
"My daughter, my remaining joy,
The wife of my departed boy,
Wept day and night, yet toiled in grief,
To give my old age some relief.
She milked the cow, she spun the thread,
For work to distant places sped,
From morning's smile till evening's glow
She ceaseless toiled and toiled in woe,
And still as we returning came,
Her placid, drooping face the same,
I saw her toiling still in grief,
To give my old age some relief.
But this unwonted ceaseless toil,
And grief as ceaseless all the while,
Did break her heart,—oh ! she is gone,

* The story narrated in the succeeding verses is founded on fact.

Great Alla, let thy will be done !
My story need I further say ?
It is a tale of every day.
My neighbour saw me old and poor,
With bribes he sought the richman's door,
Our gomashta, a faithless man,
Transferred to him my fie'ds of dhan,
Which we have tilled this hundred year
And I must wander,—where, oh where !
A week is gone, a week is come,
From village I to village roam,
Perchance a few more weeks will come
Before I cease to weep and roam.
My hut is down, my things are sold,
Gone is my son, so true and brave,
My heart is weary, I am old,
Great Alla ! Speed me to my grave."
Enough, old man, thy simple tale
Doth smite this heart, as with a flail.
What throes of woe, what deep-felt pain,
What bitter tears that unseen start,
What silent anguish of the heart,
Even at this hour pollute night's reign !
Ah, dreams of rural bliss are vain
And life hath trouble, life hath pain !

Then toil, it is the will of Heaven,
And labour all thy mortal span,
For rest unto us is not given,
Still toil and help thy brother man !
When next thou sailest o'er life's calm sea
'Neath moon-beams of prosperity,
Thy work remember,—'tis to save,
The old man in the midnight wave !
And thou ! proud man of wealth and power,
When maddened in thy prosperous hour,
Thou liftst thy hand to smite and quell,
Be calm and stretch thy hand to save,
Think of the maiden's midnight wail,
Think of the old man in the wave !

ইণ্ডিয়ান্ সিভিল সার্ভিসে নিযুক্ত সরকারি মানুষটির কর্ম্ম-জীবন সম্বন্ধে রমেশচন্দ্রের জীবন চরিত বিশদ ভাবে আলোচনা করিয়াছে, কিন্তু এই কবিতাতে আমরা ভিতরের মানুষটির যে সংবাদ পাই তাহার মূল্য সমধিক বলিয়া মনে হয়। রমেশচন্দ্রের নৈতিক জীবনটি যে কত সুন্দর তাহা এই কবিতার অন্তর্নিহিত কবির সারল্যময় আত্মকথায় আমরা বুঝিতে পারি।

(ক্রমশঃ)

নাটক

মীনা

শ্রীপাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায়

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

হংসরাজের আশ্রম

হংসরাজ ও স্নচেৎসিংহ

হংস। এখন বুঝ্‌তে পেরেছ, স্নচেৎসিংহ, বালিকা নির্দ্দোষ?

স্নচেৎ। তা' হ'লে কুম্ভই ঐ বালিকাকে হত্যা করেছে?

হংস। কুম্ভ নিজে হত্যা করে নি, তার অনুচরেরা ঐ পুরুষবেশিনী বালিকাকে কুমার উৎপলাপীড় মনে ক'রে হত্যা করেছিল।

স্নচেৎ। তাতে তার স্বার্থ?

হংস। তার স্বার্থ অনেক খানি, স্নচেৎসিংহ। আমি এখন সে কথা বল্‌ব না। রাজপুরীতে প্রত্যাগমন করলেই সমস্ত সংবাদ অবগত হবে।

স্নচেৎ। তা' হ'লে আমার মনে হয়, প্রভু! এর ভেতর একটা ভীষণ ষড়যন্ত্র আছে।

হংস। নিশ্চয়ই। ভেবেছিলুম—না থাক্; দেখ, স্নচেৎসিংহ! তুমি এ গূঢ় রহস্যের বিষয় ঐ বন্দিনী বালিকার কাছে ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ ক'র না।

স্নচেৎ। যখন আপনি নিষেধ করছেন, তখন সে গুপ্ত রহস্য চিরদিনই গোপন থাক্‌বে। আচ্ছা, প্রভু! তা' হ'লে ঐ হত বালিকা কে?

হংস। যখন হত বালিকার মুণ্ড অপহৃত, তখন আমার বিশ্বাস তাকে মৃত সপ্রমাণ করতে কুম্ভই সে ছিন্নমুণ্ড অপহরণ করেছে; সে সংবাদও রাজধানীতে গিয়ে অবগত হবে।

স্নচেৎ। থাক্, যখন প্রভু সে কথা বল্‌তে প্রস্তুত নন্, তখন আর এ প্রশ্নের পুনরুত্থাপন ক'রে প্রভুর অপ্রিয়ভাজন হ'তে চাই না। তা' হলে ঐ বন্দিনী বালিকার সম্বন্ধে প্রভুর আদেশ?

হংস। সেই কথাই বল্‌তে তোমায় আহ্বান করেছি, স্নচেৎসিংহ! তুমি বালিকাকে আমার হস্তে সমর্পণ কর, আর তাকে জানিয়ে দাও যে—তার অপরাধের বিচারকর্ত্তা মহারাজ নয়—আমি।

স্নচেৎ। প্রভুর যেমন অভিরুচি!

হংস। যাও, স্নচেৎসিংহ! অবিলম্বে বালিকাকে এখানে আনয়ন কর। হাঁ, একটা কথা—তুমি কি এখন রাজধানীতেই ফির্‌বে?

স্নচেৎ। না, প্রভু! নগরবাসী প্রজাবৃন্দ প্রতিজ্ঞা করেছে, যতদিন না কুমার উৎপলাপীড়ের সন্ধান হয়, ততদিন তারা রাজধানীতে প্রত্যাগমন কর্‌বে না। তারা চায়—কুমার উৎপলকে কাশ্মীর-সিংহাসনে বসাতে; তাতে যে বাধা দেবে, তার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ কর্‌তে তারা এতটুকু দ্বিধা কর্‌বে না।

হংস। হুঁ, যাও—

[স্নচেৎসিংহের প্রস্থান

বন-বিহঙ্গিনি—এইবার দেখব তুমি পোষ মান কি না! এই যে,—দুর্ল্লভ—কি সংবাদ?

দুর্ল্লভের প্রবেশ।

দুর্ল্লভ। সংবাদ আর কি, দেবতা! সেই আদিকালের ভাঙা নোনা ধরা মন্দির একরাত্রের মধ্যে ত দূরের কথা—একমাসের মধ্যে কেউ মেরামত কর্‌তে পার্‌বে না। রাজমিস্ত্রি খুঁজতেই ত রাতটুকু কাবার হ'য়ে গেল। তার পর সকাল থেকে প্রহর খানেক বেলা উৎরে গেলে একজন

মিস্ত্রিকে পেলুম, তার থাই বেজায়—দুমাস কি চার মাসে মোটামুটি রকম মেরামত করতে পাবেন। তার পর দু-নম্বরের সঙ্গে সাক্ষাৎ—তিনি ত চামচিকে বাদুড় দেখে আঁৎকে উঠলেন, তার পর তিনি চার, পাঁচ—তাঁরা মা মনসার দোহাই দিয়ে পাশ কাটালেন। তার পর ছয়, সাত আট—তাঁরা আট-ঘাট বেঁধে কাজ করেন কি না, পরিষ্কার বল্লেন—সামনে বর্ষা, তা ছাড়া এ বছর ভূমিকম্প হবার কথা; শেষটায় কি মন্দির মেরামত করতে গিয়ে ফর্সা হব। তাঁরাও সর্লেন—নয় ত গোড়া থেকেই নয়; দশের দশম দশা—রাজী হলেন, তবে মাসখানেক লাগবে। এখন দেবতার যা অভিরুচি।

হংস। অপদার্থ!

দুর্লভ। দেবতা যখন সেটা বুঝেছেন, তখন রেহাই দিলেই গোল মিটে যায়।

হংস। যাও—মূর্খ!

[দুর্লভ গমনোদ্যত হইল]

দুর্লভ!

দুর্লভ। (প্রত্যাবৃত্ত হইয়া) দেবতা!

হংস। আজ কোন্ তিথি বল্‌তে পার?

দুর্লভ। আজ্ঞে, অষ্টমী কি অমাবস্যা-

হংস। মূর্খ! হাঁ, মনে পড়েছে—আজ একাদশী। শোন, দুর্লভ! আজ আমার মহা সাধনার দিন—কেউ যেন আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে না আসে। মন্দিরদ্বারে তুমি প্রহরায় থাক্‌বে। সকলকে জানিয়ে দেবে যে মন্দিরে প্রবেশ করবে, আগামী অমাবস্যায় সেই মহামায়ার বলিরূপে নির্ব্বাচিত হবে, বুঝেছ?

দুর্লভ। বুঝেছি, দেবতা!

হংস। যাও।

দুর্লভ। (স্বগত) কি খর্পরেই পড়েছি, বাবা! বেটা যেন আমায় যাদু করেছে! যা বল্‌ছে, সাধ্যমত তার উল্‌টো কর্‌তে চেষ্টা কর্‌ছি, তবু রেহাই দেয় না।

[ধীরে ধীরে প্রস্থান।

হংস। দুনিবার আকাঙ্ক্ষার তাড়নায় দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞান হারিয়েছি—উদ্দাম গতিতে আকাঙ্ক্ষার পশ্চাতে ছুটেছি—বাসনা পূর্ণ কর্‌ব—বাসনা পূর্ণ কর্‌ব—

(মীনাকে লইয়া সুচেৎসিংহের প্রবেশ)

সুচেৎ। বন্দিনি! এই মহাপুরুষই তোমার অপরাধের বিচারকর্ত্তা।

মীনা। কেন, দেশের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা রাজা—সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী বা সাধুনামধারী কোন ভণ্ড বিচারক হ'তে পারে না।

সুচেৎ। সে বিষয়ের বিচার কর্‌বার স্বাধীনতা হত্যা-অপরাধে অভিযুক্তা বন্দিনীর নেই।

মীনা। আমি হত্যা করি নি।

সুচেৎ। মিথ্যা কথা। হত ব্যক্তির কাছে তুমিই রক্তাক্ত অস্ত্র নিয়ে দাঁড়িয়েছিলে—আর কোন ব্যক্তি ছিল না।

মীনা। এই জন্যই আমাকে হত্যা-অপরাধে অভিযুক্ত কর্‌লেন?

সুচেৎ। তোমার সঙ্গে অযথা তর্ক ক'রে কালক্ষেপ কর্‌তে চাই না। রাজগুরু ইনি—যা বিচার কর্‌বেন, ধর্ম্মাধিকরণের বিচার ব'লে মেনে নিতে হবে।

মীনা। দেশে কি রাজা নেই—রাজ্য কি অরাজক যে, ধর্ম্মাধিকরণের বিচার-কর্ত্তা একজন পথের ভিক্ষুক?

সুচেৎ। বন্দিনি—তোমার অপরাধের মাত্রা ক্রমশঃ বেড়ে উঠ্‌ছে!

মীনা। বিনা দোষে হত্যা অপরাধে অভিযুক্ত করেছেন, এতেই হয় ত আমায় চরম শাস্তিভোগ

কর্‌তে হবে, তখন এর উপর আর আমায় কি শাস্তি দেবেন? জেনে রাখবেন—সত্য কথা বল্‌তে আমি মহারাজকেও ভয় করি না।

সুচেৎ। বালিকা—আমি তোমার সঙ্গে বৃথা তর্ক কর্‌তে চাই না।

মীনা। তা চাইবেন কেন—হীন শৃগাল কুক্কুরের ন্যায় এই বন্য বালিকার জীবনটাও যে মূল্যহীন। তা ছাড়া একটা অসভ্য বন্য বালিকার সঙ্গে অযথা তর্ক কর্‌লে মহামান্য কাশ্মীর-সেনাপতির যে মর্য্যাদা নষ্ট হবে।

সুচেৎ। (হংসরাজের প্রতি) প্রভু, আমি আর বৃথা সময় নষ্ট কর্‌তে পার্‌ব না—বিরাট কর্ত্তব্যের বোঝা আমার মাথার উপর। এ উদ্ধত বালিকার বিচারের ভার আপনার উপর। [প্রস্থান।

[সুচেৎ সিংহকে যাইতে দেখিয়া মীনা প্রস্থানোদ্যত হইল]

হংস। কোথা যাও? ভুলে গেছ কি—তুমি হত্যা অপরাধে বন্দিনী? বিচারের পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তোমার স্থান উন্মুক্ত বিশ্ব-প্রাঙ্গণে নয়—রুদ্ধ কারাগারে। দুর্লভ—

দুর্লভের প্রবেশ।

দুর্লভ। (স্বগত) তাই ত—ব্যাপারটা ত কিছুই বুঝ্‌তে পারছি নি! দেবতা আবার বিচারক হলেন কবে থেকে?

হংস। দাঁড়িয়ে রইলে যে? নিয়ে যাও—

দুর্লভ। তাই ত, দেবতা—আমি ভেবে উঠতে পার্‌ছি না। কোন্ দিক্‌টা পাহারা দোব—দেবতার মহাসাধনা পীঠ না এই অবরুদ্ধ কক্ষ?

হংস। এই রুদ্ধ কক্ষ—সাধনা পীঠের প্রহরার ভার আমি অন্যের উপর ন্যস্ত কর্‌ব। যাও—

দুর্লভ। যে আজ্ঞে, এস, বন্দিনি!

[মীনাকে লইয়া প্রস্থান।

হংস। চতুরা বালিকা! এইবার তোমায় আয়ত্তের মধ্যে পেয়েছি—দেখি, তুমি কেমন ক'রে ফাঁকি দাও। কিন্তু ঐ বিকৃতমস্তিষ্ক যুবকের উপর বালিকার প্রহরার ভার দেওয়া কি সঙ্গত হ'ল? যুবককে কর্ত্তব্য-পরায়ণ বলে মনে হয়, তবুও বিশ্বাস নেই—সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

বনপথ

উৎপলের প্রবেশ

উৎপল। বড় ভুল করেছি—আমার স্নেহের ভগিনী সুভদ্রার প্রতি কঠোর হ'য়ে! কেন আমার এমন দুর্ব্বুদ্ধি হ'ল? সংসারের গণ্ডী পার হ'য়ে, তুচ্ছ লোকনিন্দার ভয়ে তা'র প্রতি অযথা রূঢ় হ'য়েছি। অভিমানিনী ভগিনী আমার—অভিমানে আমার সঙ্গ পরিত্যাগ ক'রে গেল। বিমাতার ষড়যন্ত্রে অবিচারে পিতা আমায় নির্ব্বাসন-দণ্ড দিলেন। অভাগিনী মাতার দুর্ব্যবহারে ব্যথিতা হ'য়ে স্বেচ্ছায় নির্ব্বাসন-দণ্ড গ্রহণ কর্‌লে, আর আমি কাপুরুষ—লোকনিন্দার ভয়ে সেই সহায়হীনা অবলা বালিকাকে এই শ্বাপদসঙ্কুল দুর্গম অরণ্যে একাকিনী পরিত্যাগ ক'রে খুব পৌরুষ দেখালুম! ধিক্ আমাকে—আর শতধিক্ আমার দুর্ব্বল মনকে! জানি না—হতভাগিনী আজও বেঁচে আছে কি না। সপ্তাহ অতীত হ'তে চলেছে—শুধু সপ্তাহ কেন—মাস বর্ষ যুগ অতীত হ'য়ে যাক্—তথাপি আমি গৃহে ফির্‌ব না—আমার এই কাপুরুষের ন্যায় আচরণের কথা যখন পিতা শুন্‌বেন, তিনি কখনই আমায় মার্জ্জনা কর্‌বেন না। এই অপকীর্ত্তির গাঢ় কালিমামাখা মুখ আর কাকেও দেখাব না—দেখাতে পার্‌ব না। রাজ্য? আমার মত হীন অযোগ্য কাপুরুষের রাজ্যে

কোন অধিকার নেই। প্রকৃতির চির উদার উন্মুক্ত বক্ষই আমার বাঞ্ছিত আশ্রয়—বনের ফল আর স্রোতস্বতীর জল আমার উপযুক্ত খাদ্য—উপযুক্ত পানীয়। সুভদ্রা—ভগিনী আমার—আয় ফিরে আয়! মূর্খ আমি—কাপুরুষ আমি—তাই তোর প্রতি অযথা রূঢ় হয়েছি। সে সব কথা ভুলে যা—আয়, অভিমানিনী—ফিরে আয়!

(গীতকণ্ঠে রমাই পাগলের প্রবেশ।)

রমাই।— **গান।**

বলিহারি বাহাদুরী সাবাস্ বলি বুদ্ধিবল।
আগে গাছের গোড়া কেটে শেষে আগায় ঢাল জল॥
দাঁত থাকতে দাঁতের কদর
বোঝে না যে আস্ত বাঁদর,
হামবড়িয়া বড়াই করে—ঠেক্‌লে বলে কর্ম্মফল॥

উৎপল। কে তুমি?

রমাই। আমি রমাই পাগল।

উৎপল। রমাই, তোমার কথাই ঠিক; আমি মূর্খ—দাঁত থাকতে দাঁতের মর্য্যাদা বুঝি নি। বল্‌তে পার, রমাই আমার কৃতকর্ম্মের প্রায়শ্চিত্ত কি?

রমাই। পাগলের অসংলগ্ন প্রলাপবাণী কি রাজকুমার উৎপলাপীড়ের ভাল লাগ্‌বে?

উৎপল। রমাই, আজ আমি কুমার উৎপলাপীড় নই—ভগিনী-শোকে উন্মাদ! উন্মাদই উন্মাদের বন্ধু। বল, বন্ধু—আমার কৃতকর্ম্মের প্রায়শ্চিত্ত কি?

রমাই। যা হারিয়েছ তা পাবার চেষ্টা না ক'রে—যা হারাতে বসেছ, তা রাখ্‌বার চেষ্টা কর।

উৎপল। তোমার এ হেঁয়ালীর অর্থ ত কিছুই বুঝতে পারছি না, রমাই! যা বল্‌তে চাও—স্পষ্ট ক'রে বল।

রমাই। বুঝতে না পার, সেয়ানাকে জিজ্ঞাসা কর; এর চেয়ে স্পষ্ট বল্‌তে আমি নারাজ।

[প্রস্থান।

উৎপল। পাগলের সব কথাই গোলমেলে—খুলেও বল্‌লে না অথচ কেমন একটা ধোঁকায় ফেলে দিলে! কি কর্‌ব, কিছুই ত ভেবে পাচ্ছি না! সঙ্কল্প করছি—রাজধানীতে ফিরে যাব না। এই সীমাশূন্য বনপথে কোথায় যাব কিছুই ভেবে পাচ্ছি না। অনাহারে অনিদ্রায় দেহ দুর্ব্বল হ'য়ে পড়েছে; কণ্টকাকীর্ণ পথভ্রমণে পদযুগল ক্ষত-বিক্ষত; একটা দারুণ অবসাদে দেহ যেন ভেঙ্গে পড়ছে—এ কি! অকস্মাৎ মাথাটা এমন ঘুরে উঠ্‌ল কেন? নিমিষে যেন চতুর্দ্দিক্ অন্ধকার হ'য়ে গেল। এ কি দুর্ব্বলতা! পা আর চলে না—এইখানে একটু বসি। (উপবেশন, সহসা ব্যাঘ্র-গর্জ্জনে চমকিত হইল) একি শ্বাপদ-গর্জ্জন! এই দুর্ব্বল দেহভার বহনে অশক্ত আমি—শেষে কি হিংস্র শ্বাপদ-কবলে প্রাণ দিতে হবে! অদৃষ্টের অখণ্ডনীয় লেখা মুছে দেবার সাধ্য বোধ হয়, বিধাতারও নেই। বেশ বুঝতে পারছি—এই আমার প্রাক্তন! এ শ্বাপদসঙ্কুল জনশূন্য অরণ্যে কে আমায় শ্বাপদ-কবল হ'তে রক্ষা কর্‌বে! কেউ নেই—কেউ নেই—ঈশ্বর! [অবসন্নভাবে ঢলিয়া পড়িল]

(এদিক ওদিক সভয়ে চাহিতে চাহিতে অতি সন্তর্পণে ছদ্মবেশী মেঘার প্রবেশ)

মেঘা। বেশ নির্জ্জন স্থান—এইখানে একটা পাহাড়ের গুহা খুঁজে নোব। আমায় তাড়িয়ে দিয়েও দেবতা নিশ্চিন্ত হ'তে পারে নি—আমার সন্ধানে চর পাঠিয়েছে। ছদ্মবেশে আমি ক'টা আনাড়ির চোখে ধূলো দিয়ে পালিয়ে এসেছি; কিন্তু যতই ছদ্মবেশ ধরি না কেন, এ বকেয়া চেহারাখানা

ঢাকবার কোন উপায় নেই—পিঠে কুঁজ, এক চোখ কাণা—ত্রিভঙ্গ মুরারি—এ ছদ্মবেশে কুলাবে না। এবার ধরলে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী! দেবতা এখন মরিয়া—সব পারে। (সহসা উৎপলকে দেখিয়া) ও বাবা! এ আবার কে? যেখানে বাঘের ভয়, সেইখানে সন্ধ্যা হয় দেখছি? কে জানে—এ সেই রাক্ষুসে দেবতার চর কি না। কাজ নেই, বাবা—আস্তে আস্তে গা ঢাকা দিই। [পলায়নোদ্যোগ; কিন্তু উৎপল তাহাকে দেখিতে পাইল]

উৎপল। কে তুমি—কে তুমি—তুমি কি মানুষ? যদি মানুষ হও, একটু দয়া কর—একটু দয়া কর—

মেঘা। কে, বাবা তুমি—রাজার চর নও ত? দেবতার বাহন নও ত?

উৎপল। তুমি কি বলছ?

মেঘা। তুমি দেবতার বাহন-টাহন কি না, তাই জিজ্ঞাসা করছি। যদি তা হও, চাঁদ—তোমাকে দূর থেকেই নমস্কার!

উৎপল। যেয়ো না—যেয়ো না—একটু দয়া কর। ক্ষুধা-তৃষ্ণায় আমার প্রাণ যায়—আমায় বাঁচাও।

মেঘা। আগে পরিচয় না দিলে, মেঘা সর্দ্দার বাবারও তোয়াক্কা রাখে না।

উৎপল। পরিচয়? পরিচয় দিলে কি তুমি আমায় চিনতে পারবে? আমি দেবতা বা দানবের বাহন নই; আমি মানুষ—ভাগ্যতাড়িত দীন ভিক্ষুক!

মেঘা। তা' হ'লে মেঘা তোমার জন্য প্রাণ দেবে। এস, যুবক, আমার স্কন্ধে ভর দাও—ঐ গুহায় তোমায় রেখে, আমি তোমার আহার্য্য ও পানীয়ের যোগাড় ক'রে দিচ্ছি।

[উৎপলকে লইয়া প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

কক্ষ

অবরুদ্ধ মীনা

মীনা। সমস্তই যেন একটা বিরাট প্রহেলিকা ব'লে মনে হচ্ছে। এই প্রহেলিকায় জীবনের কুটিল গতি অবিরাম—অবিশ্রান্ত—মানুষের জ্ঞানের অতীত—বুদ্ধির অতীত! সেই নিমেষের চোখের দেখায় হৃদয়ের নিভৃত কন্দরে যে মোহন-মূর্ত্তি অঙ্কিত ক'রে রেখেছি—শয়নে স্বপনে জাগরণে যে স্মৃতির পূজা করছি—যার চিন্তায় সুখ—কল্পনায় শান্তি—আশায় আকাঙ্ক্ষার তীব্রতা বাড়িয়ে দেয়, আর কি তাকে দেখতে পাব না? কেন এমন হয়? তাকে দেখবার জন্য মন এমন হু হু করে কেন? সে আমার কে? কেনই বা তার ভাবনা ভাবি? বেশ ছিলুম—বনের চিরমুক্ত বিহঙ্গিনা—ইচ্ছামত বনে বনে বেড়াতুম, কারো ভাবনা ভাবি নি। আমার হৃদয়ে প্রথম চিন্তার চিতা জেলে দিলে সর্দ্দার বাবা। সে আগুনের তুষানল ধিকি ধিকি জ্বলে উঠল—সমস্ত বুকখানা আগুনে ভ'রে গেল! আবার জ্বালার উপর জ্বালা—এই কামান্ধ কাপালিকের অত্যাচার? রাজকর্ম্মচারীর নির্য্যাতন? কত সইব—কত সয়?

(হংসরাজের প্রবেশ)

হংস। বন্দিনি! আমি আবার এসেছি—তোমার উত্তর চাই। তুমি কি চাও—রাজদণ্ড না মুক্তি?

মীনা। সাধুবেশধারী ভণ্ড—আবার কি উত্তর শুনতে চাও? তুমি ষড়যন্ত্র ক'রে আমায় নিজের আয়ত্তে পেয়েছ ব'লে মনে ক'রো না, নরপশু—আমি তোমার জঘন্য প্রস্তাবে সম্মত হব। যাও—তুমি আমার সম্মুখ থেকে দূর হও—

হংস। (স্বগত) দাম্ভিকা! (প্রকাশ্যে) আমার
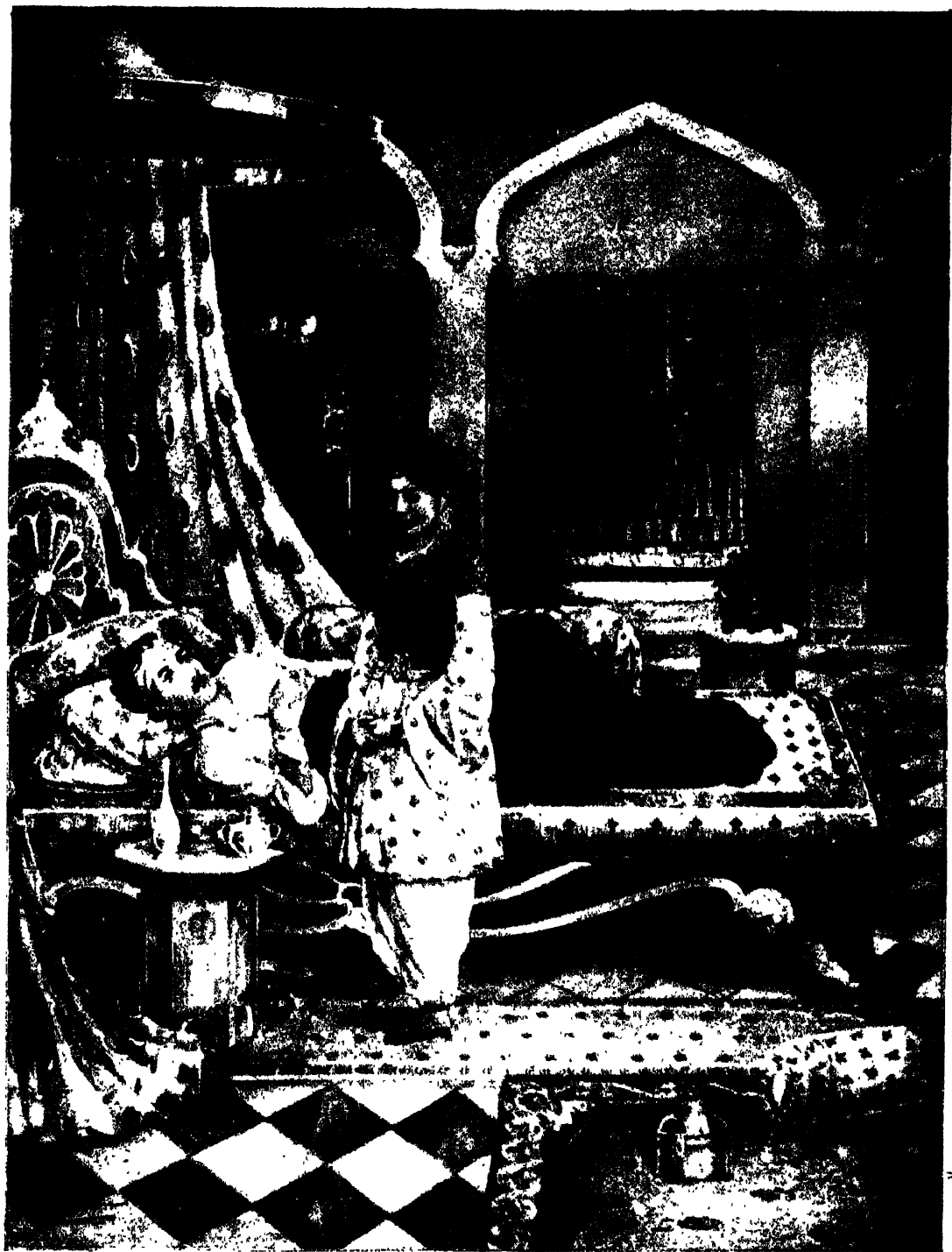
জগৎসিংহ কহিলেন,—"আমি পীড়ার মোহে স্বপ্ন দেখিতাম, স্বর্গীয় দেবকন্যা আমার শিয়রে বসিয়া শুশ্রূষা করিতেছেন, সে তুমি না তিলোত্তমা?"

আয়েষা কহিলেন,—"আপনি তিলোত্তমাকে স্বপ্নে দেখিয়া থাকিবেন।" দুর্গেশনন্দিনী।

প্রশ্নের উত্তর দাও, বন্দিনি ! কি চাও—রাজদণ্ড না মুক্তি ?

মীনা। যখন তোমার মত ভণ্ড প্রতারকের চক্রান্তে বিনাদোষে বন্দিনী হয়েছি, তখন রাজদণ্ডই চাই—তোমার মত নরপশুর অনুগ্রহপ্রার্থিনী নই। কিন্তু তৎপূর্ব্বে আমি জানতে চাই—রাজ্য কি অরাজক হয়েছে ? কাশ্মীরের রাজশক্তি কি এত দুর্ব্বল অকর্ম্মণ্য হ'য়ে পড়েছে যে, মহারাজ অনঙ্গাপীড়ের দুর্ব্বল হস্তের শাসনদণ্ড আজ সংসারত্যাগী তাপসের হস্তে ন্যস্ত হয়েছে ?

হংস। তোমার এ যুক্তিহীন প্রশ্নের উত্তর দিতে আমি বাধ্য নই ; আমি শুধু জানতে চাই—তুমি কি চাও।

মীনা। রাজদণ্ড চাই। যদি নিরপরাধকে দণ্ড দেওয়াই রাজধর্ম্ম হয়, তা' হ'লে আমি রাজদণ্ডই চাই।

হংস। তুমি মুক্তি চাও না ?

মীনা। না।

হংস। জান, তোমার অপরাধের শাস্তি কি ? তুমি হত্যা অপবাদে অপরাধিনী—তোমার শাস্তি প্রাণদণ্ড।

মীনা। তা জানি।

হংস। তবু তুমি মুক্তি চাও না ?

মীনা। না।

হংস। সুন্দরি—দেখতে পাচ্ছ কি, আমি তোমার জন্য কি হয়েছি ? যপ তপ শাস্ত্রালোচনা, সন্ধ্যা পূজা ধ্যান সব বিসর্জ্জন দিয়েছি—আজন্ম সঞ্চিত কঠোর ব্রহ্মচর্য্য আকাঙ্ক্ষার প্রদীপ্ত অনলে আজ ভস্মীভূত হ'তে বসেছে ! সুন্দরি—প্রসন্ন হও !

মীনা। ব্রহ্মচারি, এ কি বিসদৃশ আচরণ আপনার ? আজন্ম শাস্ত্র অধ্যয়ন ক'রে একি জঘন্য আপনার প্রবৃত্তি ! কঠোর তপানুষ্ঠানে জীবনের মধ্যাহ্ন অতিবাহিত ক'রে দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্ক্ষার তাড়নায় পাপের পঙ্কিল পথে অগ্রসর হ'তে চলেছেন এই অন্তঃসারশূন্য মাটীর দেহ—কৃমি-কীটপূর্ণ জঘন্য নরকের পশ্চাতে ছুটেছে এক দেবতা দেবত্ব বিসর্জ্জন দিয়ে জঘন্য লালসার দ্বারে আত্মবিক্রয় করতে ? ঋষিকল্প মহাপুরুষ ! দোহাই আপনার—দেবতার পবিত্র হৃদয়ে পশুত্বের প্রভাব বিস্তার করতে দেবেন না—এখনও নিবৃত্ত হোন।

হংস। এখন আর তা হয় না, সুন্দরি ! ব্রহ্মচারীর সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা ক্রুদ্ধ সিংহের মত গর্জ্জে উঠেছে—দুনিবার প্রভাব তার ! তোমার ঐ সৌন্দর্য্য আমার চিরজয়ী মনকে পরাজিত ক'রে কি এক মোহময় নাগপাশে বেঁধে ফেলেছে। আমি আমার আমিত্বটুকু হারিয়ে উন্মত্তের মত ছুটেছি—তোমার ঐ শরদেন্দুনিভ মুখখানি দেখতে—ঐ পক্ক বিম্বাধরের সুধা পান ক'রে আকাঙ্ক্ষার দুর্নিবার তৃষ্ণা মিটাতে ! সুন্দরি, প্রসন্ন হও—একটী চুম্বনের জন্যে আমি তোমায় মুক্তি দোব ! একবার—একবার—একবারমাত্র একটী চুম্বন—তাতেই আমি কৃতার্থ হব।

মীনা। তোমার সে আশা কখনও পূর্ণ হবে না। ভণ্ড—আমি তোমার ও করুণার প্রত্যাশী নই—আমি মুক্তি চাই না।

হংস। তুমি মুক্তি চাও না ? তোমার কি মৃত্যুভয় নেই ? সুন্দরি—সুন্দর মুখের একটী চুম্বন।

মীনা। জন্মালেই যখন মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, তখন আবার সে মৃত্যুকে ভয় করব কেন ?

হংস। সুন্দরি, একবার তুমি আমাকে তোমার মুখখানি চুম্বন করতে দাও—আমি তোমায় মুক্তি দোব। তোমার জীবনে কি কোন সাধ আশা নেই ?

মীনা। আর যদিই থাকে, আমি তা স্বেচ্ছায় পরিহার করতে প্রস্তুত আছি।

হংস। একটী চুম্বন, সুন্দরি—সুন্দর মুখের একটী চুম্বন। তুমি কি বধির—এত কাকুতি-মিনতি কিছুই শুন্‌তে পাচ্ছ না? তোমার হৃদয় কি পাষাণে গড়া?

মীনা। কঠিন পাথরের কোলেই যখন এতটুকু থেকে এত বড় হয়েছি, তখন জন্মগত সংস্কার ভুল্‌ব কেমন ক'রে?

হংস। এখনও ভাল ক'রে বিবেচনা কর, সুন্দরি! একদিকে মুক্তি—অন্যদিকে মৃত্যু; একদিকে জীবনব্যাপী সুখ, অগাধ ঐশ্বর্য্য—অন্যদিকে নির্ম্মম ঘাতকের খড়্গাঘাতে যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যু; বেছে নাও, সুন্দরি—কি চাও! একটি মাত্র চুম্বনের বিনিময়ে আজীবন মুক্তি! বেছে নাও—মৃত্যু না মুক্তি?

মীনা। লম্পট হিংস্র নরপশু—আমি চাই মৃত্যু!

হংস। অবাধ্য নারী—তবে মৃত্যুর জন্যই প্রস্তুত হও—[সহসা কি ভাবিয়া] না-না তা হবে না—তোমায় মৃত্যুদণ্ড দিলে আমার আকাঙ্ক্ষা আজীবন অপূর্ণ থেকে যাবে—আমি তা পার্‌ব না। যার জন্য সব ত্যাগ করেছি, সে উদ্দাম আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ কর্‌ব। এই নিভৃত কক্ষে লোকচক্ষুর অন্তরালে আমি যদি তোমার অঙ্গস্পর্শ করি, কেউ বাধা দেবে না। সুধাপাত্র হাতে পেয়েছি, তৃষিত ওষ্ঠাধরকে বঞ্চিত কর্‌ব না। এস—এস, সুন্দরি—

(মীনাকে ধরিবার জন্য হস্ত প্রসারিত করিল। মীনা সদর্পে দুইপদ সরিয়া গিয়া ক্ষিপ্রহস্তে বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে লুকায়িত ছুরিকা বাহির করিল এবং ক্রুদ্ধা ব্যাঘ্রীর ন্যায় গর্জ্জন করিয়া কহিল)।

মীনা। সাবধান, নরপশু—আর একপদ অগ্রসর হ'লে, এই শাণিত ছুরিকা তোমার বক্ষে আমূল বসিয়ে দিতে এতটুকু দ্বিধা কর্‌ব না।

[হংসরাজ স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল]

হংস। রাক্ষসী—কিন্তু অতি সুন্দর! সর্পী—সুবর্ণরূপা! (স্বগত) মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও রূপোন্মাদ পতঙ্গ যেমন জলন্ত আগুনে ঝাঁপ দেয়, আমার দুর্দ্দমনীয় লালসা আমায় তেমনি উন্মত্ত ক'রে তুলেছে। পার্‌ব না, রমণী—তোমার আশা আমি প্রাণ থাক্‌তে ত্যাগ করতে পার্‌ব না। (প্রকাশ্যে) ভাল তাই হোক্, অবাধ্য নারী—যত দিন না তুমি আমার প্রস্তাবে সম্মত হও, ততদিন, এমনি ভাবে এই কক্ষে অবরুদ্ধ থাক। দেখি, অনাহারে অনিদ্রায় অন্ধকার কক্ষে অবরুদ্ধ থেকেও তোমার দম্ভ চূর্ণ হয় কি না। দুর্লভ—

দুর্লভের প্রবেশ।

দুর্লভ। এমন অসময়ে আমায় কি প্রয়োজনে আহ্বান কর্‌লেন, দেবতা?

হংস। এ রমণী হত্যাপরাধে অভিযুক্তা; রাজাদেশে এর বিচারের ভার আমার উপর ন্যস্ত হয়েছে। এর অপরাধ সম্বন্ধে আমার সন্দেহ হওয়ায়—যতদিন না প্রমাণ সংগ্রহ হয়, ততদিন আমি একে এই কক্ষে নজরবন্দী রাখতে চাই; তুমিই এর প্রহরায় থাক্‌বে। সাবধান, যেন চতুরা রমণী কোনরূপে পলায়ন না করে। মনে রেখো—তোমার অসতর্কতার জন্য তোমার শির জামিন্।

দুর্লভ। ঘরে কি তালা দিয়ে রাখব, দেবতা?

হংস। তুমি যা ভাল বিবেচনা কর, তাই কর।

দুর্লভ। ছুঁড়ীর হাতে হাতকড়ি লাগাব কি?

হংস। সেও তোমার ইচ্ছা।

দুর্লভ। নইলে বিশ্বাস কি, দেবতা! যে মেয়ে মানুষ খুন-খারাবি কর্‌তে ভয় পায় না, সে মেয়ে হ'লেও পুরুষের বাবা! হাতে হাতকড়ি, পায়ে বেড়ি না লাগালে সাম্‌লানো যাবে না দেবতা।

হংস। বেশ—কিন্তু খুব সাবধান। (স্বগত) মূর্খ অত শত বোঝে না—বুঝতে চেষ্টাও করে না; কিন্তু কর্ত্তব্যপরায়ণ—এরূপ কার্য্যের যোগ্য পাত্র; অন্য কারও হস্তে এ ভার অর্পণ করলে, প্রকাশ হওয়া সম্ভব। তাতে উদ্দেশ্য-সাধনে ব্যাঘাত হ'তে পারে। (প্রকাশ্যে) বুঝতে পেরেছ, দুর্লভ কি গুরুতর দায়িত্বভার আমি তোমার উপর দিয়ে যাচ্ছি!

দুর্লভ। তা বুঝেছি বৈ কি, দেবতা! কিন্তু হাতকড়া কোথায় পাব, দেবতা—খুনে মাগীকে বেঁধে না রাখলে বিশ্বাস নেই; ও হয়েছে—মনে পড়েছে—হাতকড়া না পাই, ভাঙা মন্দিরে কুকুর-বাঁধা শেকল একগাছা প'ড়ে আছে; একটু অপেক্ষা কর দেবতা—আমি এক দৌড়ে শেকল গাছটা নিয়ে আসি।

[প্রস্থান।

হংস। সুন্দরি! তোমার অন্ধকার ভবিষ্যৎ একবার কল্পনার চক্ষে চেয়ে দেখ—এখনও বিবেচনা কর—

[মীনা নিরুত্তর—প্রস্তরমূর্ত্তির ন্যায় নিঃস্পন্দ।
শৃঙ্খল লইয়া দুর্লভের পুনঃ প্রবেশ।]

দুর্লভ। ব্যস, ইয়া মজবুত শেকল—দশটা বাঘে ছিঁড়তে পারবে না, বেটী ত মেয়ে মানুষ!

হংস। কিন্তু হুঁসিয়ার দুর্লভ।

[প্রস্থান।

দুর্লভ। এইবার সুড় সুড় ক'রে এগিয়ে এস ত চাঁদ! [মীনার নিকটবর্ত্তী হইল, এবং মীনাকে চিনিতে পারিয়া চমকিত হইয়া দুইপদ পিছাইয়া আসিল।]

দুর্লভ। [শৃঙ্খল মীনার পদতলে ফেলিয়া দিয়া] চমকাব না! আমাকে কি এত বড় অকৃতজ্ঞ মনে করেছিস্ যে, আমি আমার জীবন-দাত্রী দেবীকে ভুলে যাব? মা! আমি এ নিষ্ঠুর কাপালিককে ভাল ক'রে চিনি। আমি বেশ বুঝেছি—সে তার একটা গূঢ় উদ্দেশ্য সাধন করতে তোর উপর অযথা হত্যা অপরাধ চাপিয়ে দিয়ে তোকে এমনি ভাবে অবরুদ্ধ করেছে। আমার কথা শোন্—এই শৃঙ্খলে আমায় বেঁধে রেখে তুই আশ্রমের পশ্চিম দিকের গুপ্ত পথ দিয়ে পালিয়ে যা—এখানে আর এক মুহূর্ত্ত থাকিস নি। ঈশ্বরের অশেষ করুণা—তাই আজ নিষ্ঠুর কাপালিক আমাকেই তোর প্রহরায় নিযুক্ত করেছে! পালিয়ে যা, মা—পালিয়ে যা।

মীনা। উন্মাদ তুমি কি বলছ? আত্মরক্ষা করতে নিষ্ঠুর তান্ত্রিকের উদ্যত খড়্গের মুখে তোমায় নিক্ষেপ করব? তা হয় না, প্রহরি! তুমি তোমার কার্য্য কর।

দুর্লভ। জীবন-দাত্রী মা আমার! সন্তানের একটা অনুরোধ রক্ষা কর্। সন্তান কৃতজ্ঞতার ঋণ-মুক্ত হবার সুযোগ পেয়েছে, তার আশা পূর্ণ কর্, মা! সে আমায় বিশ্বাস করে, আমি কৌশলে তাকে প্রতারিত করব; তুই নিশ্চিন্ত হ'য়ে চ'লে যা—কিছু ভাবিস্ নি! ঈশ্বরের দোহাই—সন্তানের অনুরোধ রাখ্!

মীনা। (স্বগত) এ আবার কি নূতন বিপদে ফেললে, ঈশ্বর! আমি যে কিছু বুঝতে পারছি নি—ভাবতে পারছি নি—বিচার করতে পারছি নি! তোমার অনন্ত করুণা যেন মহান্ আত্মোৎসর্গের মূর্ত্তি ধ'রে, নারীর ধর্ম্মরক্ষা করতে ছুটে আসছে—প্রত্যাখ্যান করা মহাপাপ! কি করি—কি করি?

দুর্লভ। কি চিন্তা করছিস্, মা! চিন্তার অবসর নেই—সন্তানের অনুরোধ রক্ষা কর্—আমায় শৃঙ্খলিত ক'রে অবিলম্বে এ স্থান ত্যাগ কর্।

মীনা। তবে তাই হোক্। ঈশ্বর, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক্! হতভাগ্য মাতৃ-সম্বোধন করেছে, দয়াময় জগদীশ্বর! হতভাগ্য সন্তানের রক্ষার ভার তোমার উপর দিয়ে গেলুম। এস, পুত্র—

[দুর্লভকে শৃঙ্খলিত করিয়া প্রস্থান।

দুর্লভ। (কিয়ৎক্ষণ একদৃষ্টে মীনার দিকে চাহিয়া রহিল) এতক্ষণ বোধ হয়, আশ্রম পার হ'য়ে গেছে। দেবতা—দেবতা—

(হংসরাজের পুনঃ প্রবেশ।)

হংস। ষাঁড়ের মত চীৎকার করছিস্ কেন, মূর্খ?

দুর্লভ। সর্ব্বনাশ হয়েছে, দেবতা—আমার দুর্দ্দশাটা একবার দেখ—

হংস। একি! কে তোর এ দুর্দ্দশা করলে? রমণী কোথায়?

দুর্লভ। ঐ খুনে পাহাড়ী মাগী, আবার কে করবে, দেবতা? আমি যেই শেকল দিয়ে মাগীকে বাঁধতে গেছি, মাগী অমনি ঝাঁ ক'রে একখানা ছোরা বে'র করলে, আমি তখন ভয়ে ঠক্ ঠক্ ক'রে কাঁপ্‌ছি—চেঁচাবার জোগাড় করছি—মাগী চক্ষু রক্তবর্ণ ক'রে শাসিয়ে বল্‌লে—যদি চেল্লাবি ত দেখ্‌ছিস্ এই ছোরা। আমি আর ভয়ে চেঁচাতে পারলুম না,—মাগী তখন আমার শেকলে আমাকেই বেঁধে ফেল্‌লে; তার পর ভোঁ দৌড়—সঙ্গে সঙ্গে আমিও চেঁচিয়ে উঠলুম!

হংস। বন্দিনী পলায়িতা! মূর্খ—অপদার্থ—করেছিস্ কি? হীন রমণীর কাছে প্রতারিত হলি?

দুর্লভ। রমণী কোথায়, দেবতা—সে যে জাঁহাবাজ পাহাড়ে মাগী! বাপ্—কি ছোরা!

হংস। মূর্খ—অকর্ম্মণ্য—আমি তোকে হত্যা করব।

দুর্লভ। তাই কর, দেবতা! যখন মাগীর হাতে ছোরা ঝক্‌ঝকিয়ে উঠেছে, তখনই বুঝেছি—আমার বরাতে ওটা ঘনিয়ে এসেছে। আর এখন এগুলে নির্ব্বংশের বেটা, পেছুলেও ভেড়ের ভেড়ে!

হংস। না, তোর মত হীন মেষশাবককে হত্যা ক'রে কোন ফল নেই। শোন্, মূর্খ! সিংহের বিবর থেকে চতুরা পলায়ন করেছে, অবিলম্বে তার সন্ধান করতে হবে। যেমন ক'রে হোক্—বিশাল বিশ্বের একপ্রান্ত হ'তে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত অনুসন্ধান করতে হবে। কান্তারে, প্রান্তরে, শৈলশিখরে—এমন কি অগাধ জলধির অগাধ তলে লুক্কায়িত থাক্‌লেও তার অনুসন্ধান করতে হবে—আমি পলায়িতা বন্দিনীকে চাই!

[নিষ্ক্রান্ত।

চতুর্থ দৃশ্য

গিরিপথ।

গীতকণ্ঠে সন্ন্যাসিগণের প্রবেশ।

সন্ন্যাসিগণ— **গান।**

মিছে কেন মন আমার আমার, মিছে কেন অহঙ্কার।
ক্ষণিকের আশা ক্ষণিকের নেশা, মুদ্‌লে আঁখি অন্ধকার॥
আমার দৌলত বাগান ঘর,
ওরা সব আমার ওরা পর,
আমার বিদ্যা আমার বুদ্ধি, আমার মত ক'জনার,
জ্ঞানের চোখে দেখলে চেয়ে ঘুচবে ধোঁকা সবাকার
বড় হবে ত ছোট হও, খাঁটি কথা মেনে নাও
ঝেড়ে মনের মলা-মাটি খাঁটিমানুষ হও;
(দেখবে) আপন পরে নাই ভেদাভেদ, মাটী টাকা একাকার॥

(সহসা পাগলিনীর প্রবেশ।)

পাগ। হ্যাঁ গা, তোমরা শুনেছ—ঐ পাহাড়ী মেয়েটা রাজার মেয়েকে খুন করেছে? আমি অনেকদিন থেকে জানি—ঐ পাহাড়ীরা সবাই খুনে।

এতদিন কাকেও বলি নি—তাকে পাবার আশা ছিল কি না, তাই বলি নি; এখন আর আশা নেই তাই বল্‌ছি—ডাক্ ফুঁড়ে চীৎকার ক'রে বল্‌ব—তাকেও তারা খুন করেছে। নইলে কি সে আস্‌ত না? নিশ্চয়ই আস্‌ত। আমি যে তার মা—সে আস্‌বে ব'লে তার আশাপথ চেয়ে রয়েছি—নিশ্চয়ই সে আস্‌ত। সে নেই—নেই—ঐ খুনে পাহাড়ীরা কেমন হাস্‌ছে দেখ? আমি দিনরাত কাঁদ্‌ছি কি না, তাই ওরা হাসছে; লোকের কান্না দেখলে ওদের আনন্দ হয় কি না, তাই ওরা হাসে। ওরা বড় নির্ম্মম—পাহাড়ে থেকে বুকখানাকেও পাথরের মত শক্ত করেছে; তাই ননীর পুতলীকে খুন কর্‌তে ওদের এতটুকু মমতা হয় না। তোমরা সন্ন্যাসী—তোমরা ওদের ছায়া মাড়িয়ো না—খুনেদের ছায়া মাড়ালে মহাপাপ হয়। তোমরা ও পথে যেয়ো না, হয় ত তোমাদেরও খুন কর্‌বে।

১ম সন্ন্যাসী। বুঝতে পেরেছ—এ রমণী সন্তান-শোকে উন্মাদিনী।

২য় সন্ন্যাসী। আহা, হতভাগিনী!

[সন্ন্যাসিগণের প্রস্থান।

পাগ। এরাও তাই বলে গেল—ঐ পাহাড়ীরা সব খুনে; এরাও জানে ঐ পাহাড়ীরা তাকে খুন করেছে—ওদের ভয়ে বল্‌তে পার্‌লে না। হায় নিরীহ গো-বেচারী সন্ন্যাসীর দল!

(সুচেৎ সিংহের প্রবেশ।)

সুচেৎ। আর কোথায় অনুসন্ধান কর্‌ব? গিরি, কান্তার, উপত্যকা, অধিত্যকা, নদীতট সকল স্থানই ত তন্ন তন্ন ক'রে অনুসন্ধান কর্‌লুম, কোথাও কুমারের সন্ধান পেলুম না। সপ্তাহ অতীত হ'য়ে গেছে, রাজধানী থেকেও সংবাদ পেয়েছি—কুমার রাজধানীতেও প্রত্যাবৃত্ত হন্ নি। তবে কি কুমার জীবিত নেই? এ কথা ভাবতেও যে প্রাণ শিউরে উঠছে! পুত্রশোকে মহারাজ উন্মাদ, মহারাণী উন্মাদিনীপ্রায়—রাজ্য ঘোর অরাজক! রাক্ষসী ছোটরাণীর চক্রান্তে আজ সোণার কাশ্মীর শ্মশানে পরিণত হ'তে বসেছে! হা, রাক্ষসী! নিজের হীন স্বার্থের জন্য কি সর্ব্বনাশ কর্‌লি—কি সর্ব্বনাশ কর্‌লি? তাই ত—কি করি? যে আশার উদ্দীপনায় কুমারের অনুসন্ধানে এতদূর এসেছিলুম, আজ নিরাশায় ভাঙ্গা বুকে বেদনাভার নিয়ে কোন্ মুখে কাশ্মীরে ফিরে যাব? ঈশ্বর—কি কর্‌লে? কাশ্মীর-রাজকুলতিলক কুমার উৎপল কি তবে সত্যই জীবিত নেই?

পাগ। নেই গো—নেই! সে যখন ঘর ছেড়ে পাহাড়ে এসেছে, তখন সে নিশ্চয়ই বেঁচে নেই—এ কথা আমি হলপ ক'রে বল্‌তে পারি। আর যারা তাকে খুন করেছে, তাদেরও জানি; কিন্তু প্রাণান্তে তাদের নাম কর্‌ব না। তোমরা রাজপুরুষ—তোমাদের কাছে তাদের নাম কর্‌লে তারা ভারি চ'টে যাবে—আমার হারানিধিকে আর ফিরিয়ে দেবে না। তোমরা মিছে কেন তার অনুসন্ধান ক'রে বেড়াচ্ছ? আমি বল্‌ছি—সে নেই—নেই—নেই—

[প্রস্থান।

সুচেৎ। রমণীর কথা কি সত্য, না উন্মাদের প্রলাপ? কিন্তু প্রত্যেক কথাই যেন রহস্যময় ব'লে মনে হচ্ছে! কুমার হত না হ'লে, রমণী এতখানি দৃঢ়তার সঙ্গে বল্‌লে কেন—'নেই—নেই—নেই?' তা ছাড়া সে হত্যাকারীর নাম প্রকাশ করলে না; এর মূলেও রহস্য নিহিত আছে ব'লে মনে হয়। এমন রহস্যময় উন্মাদের প্রলাপ! এ যেন ধারণা করা যায় না। আমায় রাজকর্ম্মচারী ব'লে চিন্‌তে পার্‌লে, এও কি উন্মত্ততা? সবই যেন রহস্যময়! কিছুই বুঝতে পারছি না। তাই ত, দেখতে দেখতে

রমণী অনেক দূর চ'লে গেল। যাই হোক্, রমণীর অনুসরণ করাই এখন প্রথম কর্ত্তব্য ; তার পর ছলে বলে কলে কৌশলে যেরূপেই হোক্, তাকে আয়ত্তে আন্‌তে হবে। তাকে আয়ত্তে আন্‌তে না পার্‌লে, কিছুতেই এ জটিল রহস্য ভেদ হবে না। সপ্তাহাধিক কাল অক্লান্তভাবে কুমারের অনুসন্ধান করেও যখন তাঁর অস্তিত্বের কোন নিদর্শনই পেলুম না, আর মুহূর্ত্তমাত্র কালক্ষেপ না ক'রে রমণীর অনুসরণ করি ; দেখি—উদ্দেশ্য পূর্ণ হয় কি না।

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

পর্ব্বত-গুহা।

উৎপল ও মেঘা।

উৎপল। মেঘা, তোমার উপকার আমি কখনও ভুল্‌ব না। তুমি নিজের জীবনকে বিপন্ন ক'রেও আমায় অনাহারে মৃত্যুমুখ হ'তে রক্ষা করেছ।

মেঘা। বার বার ও কথা ব'লে আমায় লজ্জা দিচ্ছেন কেন, প্রভু ? মানুষে যা করে, তার বেশী ত কিছুই করি নি।

উৎপল। কিন্তু এই মনুষ্যত্ব পৃথিবীর এত মানুষের মধ্যে ক'জনার আছে, মেঘা ? পৃথিবীর মানুষ তারা—যারা নারীর প্ররোচনায় প্রাণাধিক পুত্র-কন্যাকে নির্ব্বাসন-দণ্ডে দণ্ডিত করে। পৃথিবীর মানুষ তারা—যারা তুচ্ছ সিংহাসনের লোভে পুত্র-হত্যা, স্বামিহত্যা কর্‌তে দ্বিধা করে না। পৃথিবীর মানুষ তারা—যারা হীন লালসায় অন্ধ, দিগ্বিদিক্-জ্ঞানশূন্য হ'য়ে গুপ্ত ঘাতকের কাজ কর্‌তে ইতস্ততঃ করে না ? আবার ভ্রাতৃগতপ্রাণা যে ভগিনী একমাত্র ভ্রাতার জন্য সংসারের সমস্ত সুখশান্তি, সমস্ত আকাঙ্ক্ষা জীবনের মধুময় প্রভাতে বিসর্জ্জন দিয়ে ত্রেতার আদর্শচরিত্র মহাপ্রাণ রামানুজের মত নির্ব্বাসিত ভ্রাতার অনুগমন করে, তারাও এই পৃথিবীর মানুষ ! পৃথিবীতে কুম্ভ দেবলও আছে, আবার মেঘাও আছে ; সুনীতার মত জননীও আছে, আবার সুভদ্রার মত ভগিনীও আছে।

মেঘা। থাক্ না, প্রভু, ওসব বাজে আলোচনাগুলো ; তাতে লাভের মধ্যে মনটা খারাপ হ'য়ে যায়, মগজটাও কেমন বিগড়ে যায়, তার চেয়ে দুঘড়ি ভগবানের নাম কর্‌লে—

উৎপল। চুপ কর, মূর্খ—ভগবান নেই ! যার অস্তিত্ব নেই, তার নাম ক'রে ফল কি ? কোন ফল নেই। শোন্, মেঘা—যখন যা খুসী করিস্, কেউ বাধা দেবে না - কিন্তু ভুলেও ভ.বানের নাম মুখে আনিস্ নি।

(গীতকণ্ঠে রমাই পাগলের প্রবেশ)

রমাই— **গান**

তোমার ওই কথাটী ভুল।
হেলায় উড়িয়ে দিচ্ছ তাঁরে, যিনি সকল কাজের মূল ॥
যিনি সৃষ্টি স্থিতি লয়কারী,
অনন্ত মহিমা তাঁরি,
ভেবে পাগল ভোলা শ্মশানচারী,
যাঁর নাইকো সমতুল ॥

[প্রস্থান।

মেঘা। বেশ জ্ঞানের কথা ব'লে গেলে ত ! আমরা মুখ্যু শুখ্যু লোক, কিছু বুঝি, আর নাই বুঝি, তবে এটুকু বেশ বুঝতে পারি, যা কানে আর প্রাণে ভাল লাগে, তা নিশ্চয়ই ভাল।

উৎপল। মেঘা !

মেঘা। প্রভু !

উৎপল। মেঘা, এখন আর আমি ক্ষুৎপিপাসায় কাতর, চলচ্ছক্তিহীন, অকর্ম্মণ্য নই ; অশক্ত অলসের মত এই অন্ধকার গিরি-গুহায় বাস ক'রে অযথা কালক্ষেপ করব না। আমি আজই এ স্থান ত্যাগ করব।

মেঘা। চারিদিকে শত্রু আপনাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে, এ সময় এই গুপ্ত গুহা ছাড়লে বিপদ্ ঘটবে।

উৎপল। নারীর মত দুর্ব্বল হৃদয় আমার নয় মেঘা যে, শত্রুভয়ে ভীত হ'য়ে চিরদিন অন্ধকার গিরিগুহায় আত্মগোপন করে থাক্‌তে হবে। না, মেঘা—আমি এখনই এ গিরি-গুহা ত্যাগ করব।

মেঘা। গিরিগুহা ত্যাগ ক'রে কোথায় যাবেন?

উৎপল। প্রথমতঃ ভগিনীর অনুসন্ধানে; তার পর যদি সে সুযোগ হয়—যদি তার দেখা পাই ভাল, না পাই—ভারতের তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ ক'রে জীবনের অবশিষ্ট দিন ক'টা কাটিয়ে দেব।

মেঘা। আপনার সঙ্কল্পে বাধা দেবার যোগ্যতা আমার নেই; ইচ্ছাও করি না। তবে ভয় হয়, একা নিরস্ত্র আপনি—সম্বলের মধ্যে দুই একখানি ছুরিকামাত্র। শত্রু পদে পদে; তারা আপনাকে হত্যা করবার জন্য আপনার অনুসন্ধান ক'রে বেড়াচ্ছে।

উৎপল। অস্ত্রশস্ত্রশূন্য অসহায় হ'লেও কাশ্মীরের প্রবলপ্রতাপ মহারাজ অনঙ্গাপীড়ের পুত্র উৎপলাপীড় কাপুরুষ নয়, তার বাহুতে মত্ত হস্তীর বল—হৃদয়ে দুর্জ্জয় সাহস। অস্ত্রচালনার কথা দূরে থাক্, মল্লযুদ্ধে তার সমকক্ষ বীর বোধ হয়, কাশ্মীরে নেই।

(মীনার প্রবেশ)

মীনা। আস্ফালন মুখে না ক'রে যে প্রকৃত বীর—সে কার্য্যে তার বীরত্বের পরিচয় দেয়।

উৎপল। কে তুমি? য়্যাঁ, তুমি! তুমি এখানে?

মীনা। বিস্মিত হচ্ছ আমি এখানে কেমন ক'রে এলুম? বিস্ময়ের কোন কারণ নেই। আমরা যে পাহাড়ী—পাহাড়, জঙ্গল, উপত্যকা, অধিত্যকায় ঘুরে বেড়ানো যে আমাদের অভ্যাস।

উৎপল। আমি সেজন্য বিস্মিত হই নি, বালিকা! আমি বিস্মিত হচ্ছি তোমার সাহস দেখে। আমার অপরাজেয় শক্তির কথা নিয়ে ব্যঙ্গ কর্‌তে সাহস করে, এমন একটা লোকও আমি আজন্ম দেখি নি; কিন্তু আজ তোমার সাহস দেখে মুগ্ধ বিস্ময়ে তোমার সাহসের প্রশংসা কর্‌ছি।

মীনা। সৌভাগ্য আমার! কিন্তু আর কেউ হ'লে কি কর্‌তে?

উৎপল। তার এ ঔদ্ধত্যের তখনই শাস্তি দিতুম।

মীনা। তা' হ'লে আমিই শুধু ক্ষমার পাত্রী হলুম কিসে?

মেঘা। প্রভু, ঐ ঝরণার ধার থেকে গোটা কতক ফল পেড়ে নিয়ে আসি—এখনই আস্‌ছি।

[প্রস্থান।

মীনা। চুপ ক'রে রইলে যে, উত্তর দাও?

উৎপল। কারণ—কারণ—তুমি একদিন আমার দারুণ পিপাসায় সুস্বাদু দুগ্ধ দান ক'রে আমার প্রাণ রক্ষা করেছিলে, সেই কৃতজ্ঞতার অনুরোধ—

মীনা। কেন, তুমিও ত একদিন এক দুর্ব্বৃত্তের হাত হ'তে আমায় উদ্ধার ক'রে সে কৃতজ্ঞতার ঋণ কড়ায় গণ্ডায় শোধ দিয়েছিলে।

উৎপল। হাঁ, তা বটে! তবে কি জানো—আমি—আমি—

মীনা। তুমি—তুমি—কি বল—থামলে কেন?

উৎপল। আমি ভা—

মীনা। তুমি ভালুক—কাম্‌ড়াবে না ত?

উৎপল। আমাকে দেখে কি তেমনি হিংস্র প্রকৃতির নরপশু ব'লে মনে হয়?

মীনা। তা মনে হয় না; তবে তুমি ভা—ভা কর্‌ছিলে কি না, তাই মনে হ'ল আমার পাহাড়ী বুদ্ধিতে—বুঝি বা ভালুকের কথাই বল্‌ছ।

উৎপল। বল্‌তে কেমন বাধো বাধো ঠেক্‌ছিল, তাই—

মীনা। যা বল্‌তে বাধো বাধো ঠেকে, তা কাজে দেখানো বড় শক্ত!

উৎপল। সে সঙ্কোচের বাধা ক্ষণিকের। পাহাড়ী আমি তোমায় ভালবাসি।

মীনা। ইস্, সত্যি কথা—আমায় ভালবাস? তোমরা সুসভ্য হ'য়ে আমার মত অসভ্য পাহাড়ী মেয়েকে ভালবাস? আমার যেন বিশ্বাস হচ্ছে না!

উৎপল। বিশ্বাস কর, পাহাড়ী—আমি তোমায় ভালবাসি।

মীনা। না—না—আমার বিশ্বাস জন্মে দিয়ো না, আমার মনে তেমনি বিশ্বাস হচ্ছে—বুঝি তুমি সত্যই বল্‌ছ। ব'লো না—ব'লো না—বল তুমি ভালবাস না—বনের চিরমুক্ত স্বাধীনা বিহঙ্গীকে সোহাগের শিকল পরিয়ো না।

উৎপল। কেন, পাহাড়ী ও কথা বল্‌ছ? তুমি কি ভালবাসতে জান না—না ভালবাসা নিতেও চাও না?

মীনা। (বস্ত্রাঞ্চলে মুখ ঢাকিয়া নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল।)

উৎপল। ওকি, পাহাড়ী—তুমি কাঁদ্‌ছ? কেন, আমি ভালবাসি ব'লে কি তোমার প্রাণে ব্যথা দিয়েছি? নিষ্ঠুর বালিকা! পাহাড়ে জন্মেছ ব'লে প্রাণটাকেও পাহাড়ের মত কঠিন করেছ যে!—নিজে ভালবাসার ধার ধার না, অথচ কেউ বুক-ভরা ভালবাসার ডালি দিতে এলে প্রাণে ব্যথা পাও—নীরস নীল নয়নে নীলাচলের প্রস্রবণ বহাও?

মীনা। আমায় মার্জ্জনা কর—আমি কি বল্‌তে কি ব'লে ফেলেছি।

উৎপল। কিছুই ত বল নি, পাহাড়ি! তবে এত অপ্রতিভ হচ্ছ কেন? আমি বুঝতে পার্‌ছি না—তোমার মনের ভাব কি? তোমাদের পাহাড়ী আচারে কি ভালবাসা অন্যায়?

মীনা। না।

উৎপল। তবে? নিরুত্তর কেন, পাহাড়ী—উত্তর দাও? আমার উপস্থিতি কি তোমার অপ্রীতিকর বোধ হ'চ্ছে?

মীনা। না।

উৎপল। দুষ্ট বালিকা—আর আমি তোমার ছলনায় ভুল্‌ব না! (মীনার হস্ত ধারণ করতঃ) বল, পাহাড়ী—তুমি আমার হবে?

মীনা। কেমন ক'রে হ'তে হয়, তা ত' জানি নি।

উৎপল। ভালবেসে—আবার কেমন ক'রে? বল, তুমি আমায় ভালবাসবে?

মীনা। বাসব। এইবার হাত ছেড়ে দাও।

উৎপল। তা হবে না, পাহাড়ী—তোমাকে হাতে পেয়ে ছাড়ব না। শুন্‌তে পাচ্ছ—কি সুন্দর নির্জ্জনতা!

মীনা। নির্জ্জনতা কি শোন্‌বার?

উৎপল। একমনে কান পেতে থাক—শুন্‌তে পাবে।

মীনা। তুমি কি বল্‌ছ—আমার ভয় কর্‌ছে, যেন কার পদশব্দ পাচ্ছি!

উৎপল। মানুষের অগম্য ভয়সঙ্কুল এই জনশূন্য গিরিগুহায় মনুষ্য-পদশব্দ! আর যদি তাই সম্ভব হয়, ভয়ের কোন কারণ নেই—সে নির্ভীক মনুষ্য আর কেউ নয়, আমারই অনুচর মেঘা।

মীনা। না—না—পদশব্দ ত একজনের নয়!

উৎপল। না হ'লেও, ভয়ের কোন কারণ নেই; ঐ দেখ—শব্দ ক্রমশঃ দূরে পর্ব্বতের অন্তরালে মিলিয়ে গেল। এস মীনা—তুমি আমার বুকে এস! (মীনাকে বক্ষে গ্রহণ)।

মীনা। (উৎপলের বক্ষে মুখ লুকাইয়া) ঐ—ঐ আবার! শব্দ ক্রমশই নিকটবর্ত্তী হচ্ছে! তুমি

আমায় ছেড়ে দাও—এই নির্জ্জন—ক্ষুদ্রমতি রমণী—অসহায়া—

উৎপল। তবুও বল্‌ছি, পাহাড়ী—নিশ্চিন্ত হও। যতক্ষণ আমি জীবিত আছি, ততক্ষণ কোন ভয় নেই। এস দুজনে ঐ গুহামুখে শিলাতলে বসি। (শিলাখণ্ডের উপর উভয়ের উপবেশন এবং মীনা উৎপলের বক্ষে মস্তক ন্যস্ত করিয়া এক-দৃষ্টে মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।)

দূরে হংসরাজ ও দুর্লভের প্রবেশ।

হংস। দেখছিস্, মূর্খ! এই শিলাখণ্ডের উপর মানুষের কর্দ্দমাক্ত পদচিহ্ন এখনও সম্পূর্ণ শুষ্ক হয় নি। নিশ্চয়ই কোন ব্যক্তি ঐ অধিত্যকা-সন্নিহিত গহ্বরে সঞ্চিত জলরাশি দেখে পদপ্রক্ষালন কর্‌তে গিয়ে বিফল-মনোরথ হ'য়ে কর্দ্দমাক্ত পদে ফিরে এসেছে। তার পর এই পথে—তার পর আর কোন চিহ্ন নাই—(ইতস্ততঃ অনুসন্ধান)।

দুর্লভ। দেবতার যেমন খেয়ে দেয়ে কাজ নেই! একে এই ভুতুড়ে পাহাড়, তায় আবার বাঘা ভালুকোর আড্ডা; এখানে আবার মানুষ আস্‌তে পারে?

হংস। মনুষ্য না এলে, মনুষ্য-পদ-চিহ্ন আস্‌বে কোথা থেকে, মূর্খ?

দুর্লভ। ওকি আর মানুষের পা, দেবতা! দেখছ না—সব উল্‌টো পায়ের দাগ, ভূত না হ'য়ে আর যায় না।

হংস। মূর্খ—পদচিহ্ন অনুসন্ধান কর্!

মীনা। শুন্‌তে পাচ্ছ—কারা কথা কইছে?

উৎপল। কেন তুমি অহেতুক ভীত হচ্ছ, পাহাড়ী? এখান কেউ আস্‌বে না।

হংস। [উৎকর্ণ হইয়া শ্রবণ করতঃ] মূর্খ! আমার সন্দেহ অলীক নয়। আমি যার সন্ধানে এত-দূর এসেছি, সে এখানেই আছে।

দুর্লভ। এইখানে?

হংস। হাঁ, এইখানে—এই গিরিগুহায়। দেখ, অগ্রসর হ'য়ে দেখ।

দুর্লভ। ওরে বাপ রে! আমায় মার্‌তে হয় মার, আর রাখতে হয় রাখ, দেবতা! আমার দ্বারা ঐ অগ্রসর কাজটী হবে না।

হংস। কাপুরুষ! তবে এইখানে অপেক্ষা কর্, আমি দেখছি—

(অগ্রসর হইয়া গুহামধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক তথায় উৎপল ও মীনাকে দেখিয়া উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিল।)

উৎপল। কে তুই?

হংস। (স্বগত) এতদিনে বুঝ্‌লুম, এই কারণে তুমি ধরা দিতে চাও না। কিন্তু এ সৌভাগ্য তোমাদের অধিকক্ষণ ভোগ কর্‌তে হবে না, মূর্খ রাজপুত্র! (প্রকাশ্যে) উৎপল!

উৎপল। এ কি আপনি?

হংস। হাঁ আমি, রাজপুত্র বালিকার হস্ত ত্যাগ কর।

উৎপল। এ আদেশ কর্‌ছেন কেন, প্রভু?

হংস। কোন বিশেষ কারণে বালিকার পাণি-গ্রহণ কর্‌তে তুমি পার না।

উৎপল। কারণ?

মীনা। মিথ্যা কথা—প্রবঞ্চনা!

হংস। মিথ্যা নয়, মীনা—উৎপল তোমার ভাই—তুমি তার ভগিনী। প্রমাণ—তোমার ঐ কণ্ঠলগ্ন পদক।

(উৎপল ক্ষিপ্রহস্তে বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে ছুরিকা বাহির করিয়া হংসরাজকে প্রহারোদ্যত, মীনা উৎপলের সম্মুখে গিয়া বাধা দিয়া দাঁড়াইল এবং উদ্যত ছুরিকার মুখে নিজ বক্ষঃস্থলে স্থাপন করিয়া উদ্বিগ্নমুখে কহিল)

মীনা। ঐ ছুরি আমার এই বুকে বসাও—দোহাই তোমার—আমার বুকে বিদ্ধ কর—আমার বুকে বড় যন্ত্রণা—(সে কাঁপিতে লাগিল।)

হংস। দিগ্বিজয়ে বহির্গত হ'য়ে মহারাজ অনঙ্গাপীড় এক অলোকসুন্দরী দরিদ্রা রাজপুতবালার রূপমুগ্ধ হয়ে, তার পাণিগ্রহণ করেছিলেন—সেই রাজপুতনীর গর্ভেই মীনার জন্ম। কিন্তু কন্যা জন্মগ্রহণের পর, মহারাজ সম্ভ্রমের ভয়ে ঐ দরিদ্র মাতা-পুত্রীকে পরিত্যাগ ক'রে, দেশে চ'লে আসেন। তার পর স্বামি-পরিত্যক্তা রাজপুতবালা কন্যাকে নিয়ে দেশত্যাগিনী হয়।

উৎপল। উঃ—ঈশ্বর! [হতাশভাবে, আছাড় খাইয়া পড়িল, মস্তকে আঘাত লাগিল, শোণিতস্রাব হইতে লাগিল।]

মীনা। [সংজ্ঞা হারাইল]

হংস। (স্বগত) এই সুযোগ!

[মীনাকে লইয়া পলায়নোদ্যোগ।

মীনা। (সহসা সংজ্ঞা-লাভে) পাষণ্ড—তুই তুই! হায় পাষণ্ড কাপালিক—মৃত্যুদণ্ড না দিয়ে তুই আমার তুষানলের ব্যবস্থা করলি? ছাড়—ছাড়—(সহসা নিজেকে ছাড়াইয়া লইয়া ছুরিকা বাহির করিয়া দাঁড়াইল)

সহসা মেঘার প্রবেশ।

মেঘা। মেঘা বেঁচে থাকতে মাকে নিয়ে যেতে পারবে না, দেবতা! (হংসরাজকে ধাক্কা দিয়া মীনাকে কাড়িয়া লইল।)

হংস। খুন করলে—খুন করলে—দুর্ব্বৃত্ত সয়তান আর এক রাক্ষসী আমাদের রাজকুমারকে হত্যা করলে।

সসৈন্যে সুচেৎ সিংহের প্রবেশ।

সুচেৎ। এই পাপিষ্ঠকে আর এই শয়তানীকে শৃঙ্খলিত কর। [নিষ্ক্রান্ত।

(ক্রমশঃ)

সাবিত্রী-নদী।

গল্প

গ্রীণরুম

শ্রী অশেষচন্দ্র বসু, বি-এ

রাইকিশোরবাবু একজন শিক্ষিত যুবক। তিনি বিবাহ করিবেন করিবেন করিয়া বিবাহ করেন নাই। পিতামাতা বর্ত্তমান নাই; তবে যে কেহ একজন অভিভাবক হইয়া চাপিয়া ধরিলেই পরিণয়টা হইয়া যাইত। কিন্তু সে ভূমিকায় কেহই অবতীর্ণ হইতে রাজি হয়েন নাই বলিয়াই রাইকিশোরবাবুকে ভীষ্ম সাজিয়া থাকিতে এবং যাত্রা, থিয়েটার, বায়স্কোপ দেখিয়া কাল কাটাইতে হইয়াছিল। যাত্রা, থিয়েটার, বায়স্কোপেই তিনি তাঁহার ভবিষ্যৎ অর্দ্ধাঙ্গিনীর রূপ কল্পনা করিতেন। নভেল-নাটকের সব সুন্দরী সুন্দরী নায়িকা বাছিয়া অগস্ত্যের মত একটী লোপামুদ্রা গড়িয়া ফেলিয়াছিলেন। তবে সে মূর্ত্তিটী কল্পনার প্রত্যেক রঙ্গিন আলোকে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে নব নব রূপ পরিগ্রহ করিয়া গ্রীক উপকথার নার্সিসসের মত অবস্থাতেই তাঁহাকে আনিয়া ফেলিয়াছিল।

যাহা হউক এইরূপে কাল কাটাইতে কাটাইতে একবার কোন এমেচার অভিনয়ে রাইকিশোরের নিমন্ত্রণ হইল। রাইকিশোর এমেচার কলিকাতার না বোম্বায়ের সে বিষয়ে কোন খবরই লইলেন না। কার্ডে দেখিলেন, শনিবার রাত্রি ৮টায় এলফ্রেড ষ্টেজে বঙ্কিমচন্দ্রের "চন্দ্রশেখর" হইবে। রাইকিশোর উপন্যাসের মধ্যে শৈবলিনী আর মৃণালিনীকে অধিক পছন্দ করিতেন। তবে কুন্দ ও রোহিণীর প্রতি যে একটা আন্তরিক অবজ্ঞা ছিল তাহাও নয়; কারণ একদিন তিনি তাঁর প্রিয়বন্ধু ষষ্ঠীচরণের নিকট স্পষ্টই বলিয়াছিলেন যে কৃষ্ণকান্তের উইলে রোহিণীর ঐরূপ শোচনীয় হত্যা ঘটাইয়া বঙ্কিম প্রেমের অবমাননা করিয়াছেন। একদিকে জুলিয়েট্, পোর্‌সিয়া, ডেস্‌ডিমোনা, মিরাণ্ডা প্রভৃতি আর অপর দিকে কালিদাস, বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র, শরৎচন্দ্র প্রভৃতির নায়িকারা তাঁহাকে প্রণয়-জলধিতে মন্দার পর্ব্বতের মত ধর্ষণ করিতেছিলেন, এমনই সময়ে তিনি থিয়েটারের নিমন্ত্রণপত্রখানি পাইলেন।

শনিবারের প্রতীক্ষায় থাকিতে থাকিতেই শনিবার আসিয়া উপস্থিত হইল। ৮টার পূর্ব্বেই রাইকিশোর ঠিক প্রেমিকের ভাব লইয়া থিয়েটারে যাইয়া বসিলেন। শৈবলিনীকে মনে মনে প্রাগ্-যৌবন হইতেই তিনি ভালবাসিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। স্কুলে পড়িবার সময়েই শৈবলিনী রাত্রে রাইকিশোরের শয্যায় পড়িয়া থাকিত। কখন কখন তাঁহার মাতা বালিসের তলা হইতে শৈবলিনীকে বাহির করিয়া কর্ত্তার হস্তে সমর্পণ করিতেন। তখন প্রায় মাস খানেক মাস দেড়েক সভার্য্যা চন্দ্রশেখরকে আলমারির মধ্যে বন্দী হইয়া বাস করিতে হইত। পরে অনেক রাহাজানির পর রাইকিশোর শৈবলিনীকে মুক্ত করিয়া নিভৃতে মনের দরজা খুলিয়া দিতেন। সেদিন সেই শৈবলিনীকে ভীমা পুষ্করিণীর মাঝে জীবন্ত দেখিয়া রাইকিশোর পাগলের মত হইয়া গেলেন। শৈবলিনীর প্রতি কথাতেই ক্ল্যাপ্, বাহবা, "ফাইন্", "এন্‌কোর" প্রভৃতি চলিতে লাগিল। শেষে তাঁহার একজন বন্ধু বলিলেন "রাই প্রকৃতিস্থ হও, প্লেটা মাটি করে দেবে না কি ?"

যাহা হউক পঞ্চম অঙ্কের শেষেই ষ্টেজের এই শৈবলিনী রাইচরণের অন্তরে মনসিজের পঞ্চশর বিদ্ধ করিয়া দিল। অভিনয়ান্তে যবনিকা-পতনের পরেই রাইচরণের মন বড় খারাপ হইয়া গেল। দিন তিনেক পরে তাঁহার বন্ধু আসিয়া দেখিলেন যে, নব-পরিণীতের বধূ পিত্রালয়ে চলিয়া গেলে তাহার,

অবস্থা যেমন হয় রাইচরণেরও সেই অবস্থা ঘটিয়াছে! রাইচরণ ষষ্ঠীচরণকে দেখিয়াই একটা কি লুকাইয়া ফেলিলেন। নানারূপ কথোপকথনে তাহাকে প্রবুদ্ধ করিতে না পারিয়া বন্ধু একরূপ হতাশ হইয়া গেলেন। শেষে নানাকথা প্রসঙ্গে সেদিনকার "চন্দ্রশেখর" অভিনয়ের কথাই ভাসিয়া উঠাতে রাইচরণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ওহে ষষ্ঠীচরণ! সেদিন কে শৈবলিনী সেজেছিলো হে?"

ষষ্ঠী। জ্যোৎস্না—নৈহাটীতে বাড়ী।

রাই। জ্যোৎস্না কি সুন্দর প্লে করেছিল! আমি যেন নভেলের কথা ভুলে গিয়ে সব বাস্তব বলে ভাবতে বাধ্য হয়েছি। ও সব আর আমার কাল্পনিক বলে বোধ হচ্ছে না আর যেমন চেহারায় মানিয়ে ছিল, তেমনি সুমিষ্ট গলা ও মধুর হাব-ভাব। তা ঐ জন্যেই আমি অভিনয় দেখতে যেতে চাই নে।

ষষ্ঠী। কেন হে ভায়া! তুমি কি "লভে" পড়লে না কি?

রাই। যাও যাও। তোমাদের মনে কল্পনা নেই। তোমরা সব desert! desert! আফ্রিকায় নয়—তার মধ্যেও ওয়েসিস্ আছে। তোমরা ঐ জ্যোতির্ব্বিদেরা যা বলেন—ঐচন্দ্রের মধ্যে যেমন মরু, তোমরাও ঠিক সেই রকম।

ষষ্ঠী। তা তুমি কি চাও—বল না। আমি তো তোমায় শৈবলিনীর নাম বলেছি। ঠিকানা চাও? তাও দিতে পারি।

রাই। তা তুমি এখন আমাকে উপহাস করবে বৈ কি!

ষষ্ঠী। তা ঠিকানাই বা কি প্রয়োজন? আমাদের বাড়ীর কাছেই তো তাদের বাড়ী। এক পাড়ায় বাস। প্রতি শনি রবিবারেই তো অন্ততঃ একবার করে দেখা হবেই। আর তারা সব enlightened। তাদের রুচি, হাবভাব, চালচলন সবই মার্জ্জিত।

রাই। তোমার সঙ্গে তার কখন দেখা হয়?

ষষ্ঠী। হয় নাইতে যাবার সময় ঘাটের পথে, নয় বিকালে তাস খেলতে যাবার সময় তাদের বাড়ীর রখে বা জানালার ধারে; আর নয় তো

সন্ধ্যায় ছাদের উপরে। তা আমি যখন তোমার ঘরে প্রবেশ করলাম তখন তুমি কি লিখছিলে বল তো? কবিতা টবিতা না কি? তা তুমি যেমন হয়েছ তাতে Orlandoর মত কোন দিন গাছের ছালে ছন্দ লিখে না বস!

রাই। কবিতা টবিতা নয়।

ষষ্ঠী। তবে চিঠি! নিশ্চয় চিঠি। নীরব কেন ভায়া? কা'কে লিখছিলে বল তো?

রাই। শৈবলিনীকে।

ষষ্ঠী। সে কি হে! তুমি যে দেখছি মরা ছাগলকে জল খাওয়াবে। কি লিখেছ দেখি?

রাই। যদি রহস্য না কর, আর কথাটা গোপন রাখ তো দেখাই। জান তো, এখনও বিয়ে করতে পারি নি। আমাদের মন টেলিগ্রাফের তারের মত দিন-রাতই নড়ছে। আর শুনেছ তো—মাঠের ধারে টেলিগ্রাফের পোষ্টের ভিতরটা কেমন শোঁ শোঁ করে। আমাদের প্রাণের মধ্যে সদাই ঐ রকম শোঁ শোঁ করছে। কে যে তার নাড়িয়ে দেয় তা জানি নে।

ষষ্ঠী। দেখি, দেখি, তোমার চিঠি। এই যে—

"প্রিয়তমে!

তোমায় কি বলিয়া সম্বোধন করিব জানি না। তাই এইভাবে লিপি আরম্ভ করিলাম। সেদিন প্রতাপের জন্য তোমার আকুলতা প্রাণে প্রাণে অনুভব করিলাম। যদিও প্রতাপ বুঝে নাই, আমি বুঝিয়াছি এবং তোমাকে সর্ব্বতোভাবে সুখী করিতে প্রস্তুত আছি। তুমি যদি সুন্দরীর সহিত নিশীথে অভিসারিণী হও তো আমি প্রতাপ অপেক্ষা কোটি-গুণে তোমাকে সুখী করিব। এখন আমার সমস্ত মনটাই ভীমা পুষ্করিণীর মত টলমল করিতেছে। তুমি আসিয়া তাহাতে স্নান না করিলে আমি স্থির হইতে পারিব না।

ইতি—

তোমারই চন্দ্রশেখর,

না, না,

প্রতাপ।"

চিলে যেমন করিয়া ছোঁ মারিয়া খাবার লইয়া যায়, ষষ্ঠীচরণও সেইভাবে চিঠিখানা লইয়া প্রস্থান করিল। রাইচরণ ঘরের বাহির হইয়া চীৎকার করিতে থাকিলে ষষ্ঠী দূর হইতে বলিল—

জান তো ভায়া সেই হিতোপদেশের শ্লোকটা—

"—গুহ্যম্ আখ্যাতি পৃচ্ছতি—"

শুনিয়া রাইচরণ এসকল বিষয় রাজনৈতিক ব্যাপারের মত গোপন রাখিতে অনুরোধ করিলেন।

সপ্তাহ খানেক পরে সোমবার রাত্রে ষষ্ঠীচরণ আহারাদির পর আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন রাইচরণ একমনে "চিত্রে চন্দ্রশেখর" দেখিতে-ছিলেন। পত্নীর নিকট হইতে পত্র আসিবার কথা থাকিলে যেমন পত্রাপেক্ষা পিয়নই প্রথম ঈপ্সিত হইয়া উঠে ষষ্ঠীচরণও রাইচরণের নিকট সেইভাবে আদৃত হইলেন। পরে কথাবার্ত্তা আরম্ভ হইল—

রাই। যাক্ ওসব কথা। আমার চিঠির কি ভাগ্য হ'ল বল।

ষষ্ঠী। ভাগ্য আর কি! সেও "প্রতাপ" "প্রতাপ" করে খুঁজে বেড়াচ্ছিল, এমন সময় আমি গিয়ে উপস্থিত হলাম আর তার ভাব বুঝলাম। বললাম প্রতাপ উদয়নালার যুদ্ধে গেছে আর ফিরবে না। এ কথা শুনে যেমন সে উন্মাদিনীর মত গঙ্গায় ঝাঁপ দিতে যাবে, অমনি তোমার পত্রখানি তার হাতে দিয়ে ছুট দিলাম।

রাই। তার পর, তার পর—

ষষ্ঠী। কি জানি তার পর কি হ'ল? কাল সকালে দেখি, আমার ঘরে, জানালার পার্শ্বে, লতাকুঞ্জের মধ্যে নয়, আমার টেবিলের উপর একখানি চিঠি রয়েছে। খুব যত্ন করে লেখা। বোধ হ'ল অনেক রাতে দুই লম্প তেল পুড়িয়ে, অনেক মাথা ঘামিয়ে লিখেছে। এই নাও সেই "নখৈরর্পিতম্ পদ্মপত্রম্"।

রাই। এই যে চিঠি! এ নিশ্চয়ই আমার সেই শৈবলিনীর পত্র। তা তুমি পড় ভাই।

ষষ্ঠী। তবে শোন,—

"আপনার পত্র পেয়ে বড় তৃপ্ত হলুম। যদি জিজ্ঞাসা করেন কিরূপ, তবে বল্‌বো আপনার পত্র যেন বরফের মত বা ice-bagএর মত এসে আমার প্রবল জ্বরের তাপ কমিয়ে দিয়েছে। আমাকে ভীমা পুষ্করিণীতে নাম্‌তে দেখেছিলেন সত্য কিন্তু আমি তাতে ঠাণ্ডা হ'তে পারিনি। তা আপনি যখন প্রতাপ-রূপে আমার কাছে এসেছেন তখন আমি চন্দ্রশেখরকে ছেড়ে আপনার সঙ্গে গঙ্গার তরঙ্গায়িত বক্ষে ভেসে যেতে রাজি আছি।

ইতি—

আপনার জ্যোৎস্না,

না, না,

শৈবলিনী।"

পত্র শুনিয়া রাইচরণের অবস্থা কিরূপ হইল তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। পরীক্ষার পর ক্যালকাটা গেজেটে নিজের নাম দেখিতে পাইলে ছেলেদের যেরূপ আনন্দ হয়—এ আনন্দ তাহা অপেক্ষা অনেক উগ্র। ষষ্ঠীচরণ চলিয়া যাইবার পর রাইচরণ চিঠিখানি দশবার, শতবার, সহস্রবার পাঠ করিয়াও তৃপ্তি লাভ করিতে পারিল না। এতবার পাঠ করিয়াও বিকারের রোগীর মত তাহার পিপাসা মিটিল না। পাঠ্যাবস্থায় নভেল নাটক যেমন ভাল লাগে ও বারংবার পাঠ সত্বেও নব নব রসের অনুভূতি জাগাইয়া দেয়, জ্যোৎস্নার চিঠিও রাইচরণের নিকট সেইরূপ প্রতীয়মান হইতে লাগিল। তার বুক-ফাটা তৃষ্ণা আর পাগল-করা ক্ষুধা যেন আরও প্রবল হইয়া উঠিল।

এইরূপে ষষ্ঠীচরণ ডাক-হরকরার পার্ট লইয়া যে কতগুলি লিপির আদান-প্রদান করিয়াছিলেন জানি না, তবে রাইচরণের ভালবাসা কণ্ঠা অবধি উঠিয়া আসিল। আশা, আকাঙ্ক্ষা, আবেগ, বিরহে কয়েক মাস কাটিয়া গেল। কি করিবেন। ফাঁসির আসামী যেভাবে দিন কাটায় রাইচরণও সেই ভাবে দিন কাটাইতে লাগিলেন। পূজার পূর্ব্বে এলফ্রেড রঙ্গমঞ্চে আবার "চন্দ্রশেখর" অভিনয়ের বন্দোবস্ত হইল ও অভিনয়ের একখানি কার্ডও ডাকযোগে রাইচরণের নিকট আসিয়া পৌঁছিল।

প্রথম "চন্দ্রশেখর" দর্শনের পর কিছুকাল কাটিয়া গিয়াছিল। তা রাইচরণের নিকট কত শতাব্দীও হইতে পারে। কিন্তু এ "চন্দ্রশেখর" সেই পূর্ব্বেকার পার্টির কি না তাহা জানা গেল না। রাইচরণ অগ্নিমিত্রের মত প্রেমের বুভুক্ষায় অধীর হইয়া আছেন এমন সময়ে ষষ্ঠীচরণ আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়াই রাইচরণ কার্ডখানি দেখাইলেন। কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তার পর ষষ্ঠীচরণ বলিলেন,—"ভেব না ভায়া! এ সেই দল। কয়েকবার 'চন্দ্রশেখর' অভিনয় ক'রে খুব প্রশংসা পেয়েছে বলে, ওরা ওইটাই আবার অভিনয় কর্‌ছে। শুন্‌ছি, ওদের দল পূজার পূর্ব্বে এখানে অভিনয় দেখিয়ে পশ্চিমে টুর্‌ কর্‌তে যাবে। এবারকার অভিনয়টাও খুব উত্তম হবে। কল্‌-কাতার যত বড় বড় লোক সব নিমন্ত্রিত হয়েছেন শুনেছি।"

রাই। তা শৈবলিনী কে সাজবে?

ষষ্ঠী। সেই জ্যোৎস্না। শৈবলিনীর পার্টে নাম কিনেছ বলে ওর বাপ মাও খুব উৎসাহ দিয়েছেন। তুমি দেখবে বলে সে এবার inspiration নিয়ে নামবে। তুমি এবার তাকে চাক্ষুষ দেখতে পাবে। রাই এ তোমার Golden Oppor-tunity, স্বর্ণ সুযোগ।

রাই। আরে আমি যে এবার পশ্চিমে যাব ভাবছি। তা—

ষষ্ঠী। তা আবার কি। এবার মালতী মাধবে মিলিয়ে দেব। তুমি তোমার বসন্তসেনাকে দেখতে পাবে।

রাই। বসন্তসেনা কি হে!

ষষ্ঠী। ঠিক্, ঠিক্; তোমার শৈবলিনীকে—নয়নের মণিকে চোখের সামনেই পাবে।

অভিনয়ের দিবস ষষ্ঠীচরণ রাইচরণের বাটীতে আসিয়া তাঁহাকে একখানি ট্যাক্সিতে উঠাইয়া এল্‌ফ্রেড থিয়েটারে গমন করিল। গাড়ীতে যাইতে যাইতে ষষ্ঠীচরণ বলিল, "আজ জ্যোৎস্নাকে তোমার সঙ্গে দেখা করিয়ে দেব বলেছি। সেও তোমার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে নিশাশেষে চক্রবাকীর মত উৎকণ্ঠিতা হয়ে আছে।" শুনিয়া রাইচরণ বলিলেন, "কি করে তা ঘটবে ভাই?"

ষষ্ঠী। কেন wingsএর পিছনে।

রাই। কখন? কোন্ সময়?

ষষ্ঠী। প্লে ভাঙ্গবার পূর্ব্বে। ভাই তুমি যেমন এখন বিরহের তাপে মরুভূমির মত বিশুষ্ক হয়ে গেছ, সেও এখন ঠিক ঐ তাপেই স্বর্ণ কেয়ার মত শুকিয়ে গেছে। যাক, আজ প্রণয়-গঙ্গার মাঝে দুজনকেই ভাসিয়ে দেব। জান তো লিয়াণ্ডার তার প্রণয়িনী হিরোকে দেখবার জন্যে একটা প্রণালীই সাঁতরে যেত; আর বিল্বমঙ্গল মড়া ধরে গঙ্গা পেরিয়ে গিয়ে সাপ ধরে চিন্তামনির ঘরে উঠেছিল।

রাই। আচ্ছা, দেখা যাবে তোমার কেরামতি!

যথাকালে অভিনয় আরম্ভ হইল। প্রথমাঙ্ক দ্বিতীয়াঙ্ক করিয়া অনেক অঙ্ক শেষ হইয়া গেল। কিন্তু রাইচরণের মন সেই "চীনাংশুকমেব" গ্রীণ-রুমের অন্তর্বর্ত্তী শৈবলিনীর প্রতিই ঘুরিয়া ফিরিয়া যাইতে লাগিল। শেষে দুই এক অঙ্ক অবশিষ্ট থাকিতেই ষষ্ঠীচরণ আসিয়া মাথায় টোকা মারি-লেন। রাইচরণ চমকিয়া বলিলেন, "কে শৈ—শৈ—না কি।"

ষষ্ঠীচরণ। ব্রাভো, ব্রাভো! ওঠ, চল ভায়া, তোমার "শৈকে" একবার দেখিয়ে দি। আর দেরি কেন? চল চকোর! চাঁদের সুধা তোমায় পান করিয়ে দি।

তখন ড্রপ-সিন পড়িয়া গিয়াছিল। পিছনে কনসার্টও বাজিতেছিল। রাইচরণ ধীরে ধীরে সলজ্জভাবে, যেমন ভাবে রোমিও জুলিয়েটের কক্ষে গমন করিয়াছিল সেইভাবে গ্রীণরুমের দিকে চলিতে লাগিলেন। তাঁহার বুকখানি অশ্বত্থপত্রের মত কাঁপিতে লাগিল।

Wingsএর পিছনে একটী সোফার সম্মুখে লইয়া গিয়া ষষ্ঠীচরণ বলিল, "এই তোমার সেই শৈবলিনী। পাগলিনীর পস্‌চার ঠিক করে নিচ্ছেন। জ্যোৎস্না তোমার প্রতাপকে চিনে নাও।"

রাইচরণ সোফার উপর উপবিষ্ট জ্যোৎস্নাকে হঠাৎ সম্মুখে দেখিয়া এত লজ্জিত হইয়া গেলেন যে, আর একবার চক্ষু তুলিয়া দেখিতে পারিলেন না। শেষে জ্যোৎস্না বসিতে বলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আমার প্লে আপনার কেমন লাগছে?"

রাইচরণ। খুব ভাল।

জ্যোৎস্না। আপনারা কি শেষ অবধি থাক্‌বেন?

রাই। হাঁ।

জ্যোৎস্না। আপনার সঙ্গে কি পরে আর দেখা হতে পারে?

রাই। কি জানি। আমার তো দেখা করার উপায় আছে কিন্তু আপনি কি করে—

জ্যোৎস্না। আজ আমি কলকাতাতেই থাক্‌বো। তা আপনি যদি আমার সঙ্গে আসেন

তো আলাপ-পরিচয় হতে পারে। আমি আপনার সব পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হয়েছি।

রাই। আপনি কোলকাতায় কোথায় থাক্‌বেন ?

জ্যোৎস্না। হাল্‌সিবাগানে।

রাই। হাল্‌সিবাগানে! কেন ?

জ্যোৎস্না। হালসিবাগানে আমার শ্বশুর-বাড়ী, আপনি যদি আমার সঙ্গে আসেন ত বড় সুখী হব। আমাদের থিয়েট্রিক্যাল পার্টির আরও কতকগুলি বন্ধুকেও সেখানে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করেছি। পরে কাল সকালে নৈহাটী ফিরে যাব। আপনি যদি সেখানে যেতে চান তো আপনাকে নিয়ে যাব। যেটুকু রাত বাকি আছে বেশ কথাবার্ত্তায় কাটিয়ে দেব। আমাদের সব broader views.

রাইচরণ কি উত্তর দিবেন ঠিক করিতে না পারিয়া অবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। তখন ষষ্ঠীচরণ আসিয়া বলিল,—"ভায়া ভাবছ কেন? শৈবলিনীর তো শ্বশুরবাড়ী ছিল। আর নৈহাটীতে গঙ্গাও আছে আর বেশ স্নিগ্ধ আমবাগানও আছে। এমন সময় ভিতর হইতে কনসার্ট থামাইবার সঙ্কেত-স্বরূপ ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। রাইচরণকে লইয়া ষষ্ঠীবাবু তাড়াতাড়ি গ্রীণরুম হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। আসিবার সময় বলিলেন, "ঐ দেখ ভায়া লরেন্স ফষ্টর কনসার্টে ঢোল বাজাইতেছেন, আর সুন্দরী নাপিতানীর বেশেই বেহালায় ছড়ি টানিতেছেন।" লরেন্স ফষ্টরের নাম শুনিয়া রাইচরণ "পাষণ্ড নরাধম" বলিতে বলিতে চেয়ারে আসিয়া বসিলেন।

ষষ্ঠীচরণ রাইচরণকে আনমনা দেখিয়া পানের কৌটা খুলিয়া দিলেন। রাইচরণ ধীরে ধীরে একটী পান তুলিতে তুলিতে বলিলেন, "জ্যোৎস্নার দেখছি বে হয়ে গেছে। তা হলে"—

ষষ্ঠী। বে হলে কি হয়। ওরা যে উন্নত ধরণের Enlightened—জান না আজকালকার ষ্টেজে পাশ করা মেয়েও অভিনয় করতে নেমেছে। ঋতুচক্র বর্ষামঙ্গল দেখনি? আরও এম্পায়ার ষ্টেজে কত কি যে হয়ে গেল হে! জ্যোৎস্না বড় আদরের কি না, দিদিমা জোর করে অল্প বয়সেই বে দিয়ে দিয়েছেন।"

রাইচরণ। তা বেশ, তা বেশ—শিক্ষিতা কি না। ওদের সব সাজে।

এক ঘণ্টা পরে যবনিকা পতন হইল। রাইচরণ ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া দেখিলেন যে, ষষ্ঠী তাহার পিছনে নাই। রঙ্গালয়ের অনেক স্থলই আঁধার হইয়া গিয়াছে। তিনি বাহিরে যাইবার পথ খুঁজিতেছেন। এমন সময়ে ষষ্ঠী আসিয়া বলিল, "রাইচরণ, শৈবলিনী গাড়িতে উঠে বসেছে। দরজার সাম্‌নেই ফার্ষ্ট ক্লাস ফিটন। তুমি যাও। ভাড়া ঠিক হয়েছে এক টাকা। নাম্‌বে হাল্‌সিবাগানে—সেই যেখানে উমিচাঁদের বাগানবাড়ী ছিল হে!"

রাইচরণ শৈবলিনীর রূপ পরিকল্পনা করিয়া তাড়াতাড়ি গাড়ীর নিকট গমন করিলেন এবং জ্যোৎস্নাকে ভাবিতে ভাবিতে গাড়ীর ভিতরে মাথা প্রবেশ করাইতে গিয়া মাথায় এক ভীষণ ধাক্কা খাইলেন। গাড়ীর ভিতর হইতে জ্যোৎস্না কোমল-কণ্ঠে "আহা, আহা" করিয়া উঠিল। গাড়ীর দরজায় ধাক্কা খাইয়াই রাইচরণ কিন্তু জ্যোৎস্নার পরিবর্ত্তে একটী সুন্দর, সুকোমল যুবককে থিয়েট্রি-ক্যাল ধাঁজে ধূমপান করিতে দেখিলেন। তখনও যুবকের গণ্ডে পেণ্ট ও পাউডার লাগান ছিল। রাইচরণকে দেখিয়া যুবক সাদরে আহ্বান করিয়া আলিঙ্গন করিলেন। রাইচরণ দেখিয়া শুনিয়া অবাক্ হইয়া গেল। গঙ্গায় স্নান করিতে গিয়া গামছা হারাইয়া ফেলিলে বা বাজার করিতে গিয়া

ব্যাগ চুরি গেলে লোকের যেরূপ অবস্থা হয়, রাইচরণেরও সেইরূপ হইল। তাহাকে বিস্ময়-বিহ্বল দেখিয়া যুবক বলিল, "কি মশায়! মাথায় ধাক্কা খেয়ে যে সব ভুলে গেলেন দেখছি। আপনি যে আমায় চিন্‌তেই পারছেন না। আমিই জ্যোৎস্না। শৈবলিনীর part করেছিলুম।" রাইচরণ ষষ্ঠীচরণের রহস্য বুঝিতে পারিয়া তাড়াতাড়ি আত্মগোপন করিবার উদ্দেশে বলিলেন, "আপনার পুরা নাম কি?"

জ্যোৎস্না। জ্যোৎস্নাকুমার ঘোষাল।

রাই। আপনি কি করেন?

জ্যোৎস্না। Kettlewell & Bulletin এর অফিসে কর্ম্ম করি। আজ শ্বশুরবাড়ী থেকে কাল সকালে বাড়ী ফিরবো মনে করছি। তা আপনি চলুন না। কোন কষ্টই হবে না।

রাই। তা বটে, তা বটে, কিন্তু আমাকে বাড়ী ফিরতেই হবে। বাসায় বনমালী ঠাকুর হাড়ী নিয়ে বসে থাকবে। আমাকে বিডন ষ্ট্রীটের মোড়ে দয়া করে নামিয়ে দেবেন।

পিছনে আর একখানা গাড়ী আসিতেছিল। তাহাতে ষষ্ঠীচরণ ছিলেন। তিনি সুন্দরী, রূপসী, ফষ্টর, চন্দ্রশেখর প্রভৃতিকে লইয়া থিয়েটারের সমালোচনায় পথ সরগরম করিয়া আসিতেছিলেন। বিডন ষ্ট্রীটের মোড়ে আসিতেই রাইচরণ শশব্যস্তে নামিয়া পড়িলেন। পিছনের গাড়ী হইতে সকলে বলিয়া উঠিল, "রাইচরণ বাবু বুঝলাম আমাদের প্লে দু'বারই খুব successful হয়েছে। যদি পারেন তো দয়া করে Hormiller এর ৩নং Shed এ যাবেন। সেখানে শৈবলিনীকে এনে আবার দেখা করিয়ে দেবো। আজ আমরা সব চল্লুম। নমস্কার, নমস্কার।"

গঙ্গাবক্ষ হইতে আলমগির মসজিদের দৃশ্য—বারাণসী।

গল্প

ভুল

শ্রীমতী জ্যোৎস্না ঘোষ

স্নান সমাপনান্তে আর্দ্রদেহে ইন্দীবর সিক্ত কেশের সলিলকণাগুলি যখন গাত্রমার্জ্জনী দ্বারা মুছিয়া ফেলিতে ব্যস্ত ছিল, সেই সময় চঞ্চলচরণে ভগিনী অমিতা কক্ষে প্রবেশ করিয়া, ব্যস্তভাবে কহিল, বৌদির জ্বর খুব বেশী হয়েছে দাদা, ছয়ের উপর গায়ের তাপ হয়েছে, তুমি একবার গিয়ে একজন ডাক্তার নিয়ে এস। আমার বড় ভয় করছে, একেবারে আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে। কথা পর্য্যন্ত বলছে না। মাও বড় ব্যস্ত হয়েছেন, তুমি দেরী কর না দাদা শীঘ্র চলে যাও। বস্ত্র পরিবর্ত্তন স্থগিত রাখিয়া চিন্তান্বিতমুখে ইন্দীবর কহিল, জ্বর ছয় হয়েছে? তাই ত বড় ভাবনার কথা তো! হঠাৎ এত জ্বর বেশী হবার কারণ কি?

ব্যাকুলভাবে অমিতা কহিল, তা ত জানি না। অত্যাচারও তো কিছু হয় নি।

আচ্ছা আমি ডাক্তার আনতে যাচ্ছি। তুই বৌমার মাথায় "অডিকলন" দিয়ে দে, মাকে ব্যস্ত হতে বারণ কর। ও ম্যালেরিয়া জ্বর এখনি কমে যাবে। ভয়ের কারণ নাই। শুষ্ক বিষণ্ন মুখে অমিতা গৃহ ত্যাগ করিয়া গেল। দ্রুত হস্তে ইন্দীবর বসন পরিবর্ত্তন করিয়া লইল। পাচিকা আসিয়া বলিল, ভাত দেওয়া হয়েছে দাদাবাবু খাবেন আসুন। দ্বিচক্রযানখানি, গৃহ হইতে বাহির করিয়া ইন্দীবর কহিল, আমার খাবার দেরী আছে। ক্ষণমধ্যে বাইকে উঠিয়া সে বাহির হইয়া গেল।

ইন্দীবরের স্বর্গগত পিতা বিশ্বনাথ রায় স্থানীয় আদালতের একজন খ্যাতনামা ব্যবহারাজীব ছিলেন। সেই কার্য্যে যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিয়া সুদৃশ্য অট্টালিকা, ফলকর উদ্যান, কিছু ভূসম্পত্তি ক্রয় করত পুত্রদ্বয়ের আজীবন সচ্ছন্দে অতিবাহিত হইবার সুব্যবস্থা করিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন। পুত্র ইন্দীবর সব ডেপুটী হইয়া অধিকাংশ সময় বিদেশেই অতিবাহিত করিত। সম্প্রতি কয়েক মাসের ছুটী লইয়া মাতৃসকাশে ফিরিয়া আসিয়াছে। দেবীগঞ্জে ম্যালিরিয়ার বাহুল্য বড় অধিক। বর্ষার শেষভাগেই ইহার প্রাদুর্ভাব হয়! এবার কিছু দিন হইতেই সরোজের পত্নী লীলা কয়েক বার তাহাতে আক্রান্ত হইয়াছিল। কয়েক দিন পূর্ব্বে পুনরায় সে জ্বরাক্রান্ত হইয়াছে। এবার জ্বর একটী দিনও ছাড়ে নাই। অমিতার কথায় অত্যন্ত উদ্বিগ্নহৃদয়ে ইন্দীবর চিকিৎসক আনিতে চলিল। দ্বিপ্রহরের প্রাগু রৌদ্র তাহার দেহ ও অনাবৃত মস্তকের উপর অনলকণা বর্ষণ করিতেছিল। স্বেদবারিসিঞ্চিত দেহ তাহার আতপতাপে সুলোহিত হইয়া উঠিল! সমস্ত পথ তপ্ত! ছায়া-লেশহীন পথের উপর দিয়া দ্রুতবেগে গাড়ী চালাইয়া সে যখন তাহাদের পারিবারিক চিকিৎসক নরেশচন্দ্রের দ্বারদেশে উপনীত হইল, তখন দারুণ শ্রান্তিভরে তাহার সমস্ত দেহ বিকম্পিত হইতেছিল। বাহির বাটীস্থ একখানা গৃহে নরেশচন্দ্রের বৃদ্ধ পিতা একখানা চেয়ারে বসিয়া নিবিষ্টভাবে সংবাদপত্র পাঠ করিতেছিলেন, ইন্দীবরকে গৃহ প্রবেশ করিতে দেখিয়া বিরক্ত দৃষ্টি তাহার প্রতি স্থাপন করতঃ ঈষৎ কঠিন স্বরে তিনি বলিলেন, কে মশাই! কি চান আপনি? ইঁহার বাক্য শুনিয়া ইন্দীবরের রৌদ্রতাপক্লিষ্ট দেহ আরও উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। আত্মসম্বরণ করিয়া সে কহিল, আমি

ডাক্তার বাবুকে চাইছি। তিনি বাড়ী আছেন কি? দয়া করে একবার ডেকে দিন না। বড় দরকার।

রুষ্টস্বরে বৃদ্ধ কহিলেন, এখন হবে না মশায়, সারা সকাল ঘুরে এই সে বাড়ী এসেছে, একটু বিশ্রাম নিতে দিন তাকে আপনারা। সেও তো মানুষ, শরীরটা আগে দেখতে হবে তো, আপনি এখন যান তবে। সে যা ছেলে রোগীর নাম শুনলে এখনি ছুটে যাবে।

ইন্দীবর কিছুক্ষণ নিশ্চল হইয়া রহিল। স্নেহ-ব্যাকুল পিতা পুত্রের শারীরিক ক্ষতি হইবার আশঙ্কায় এখন তাহাকে বাহির হইতে যে দিবে না, ইহা সে বুঝিল। একটা দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া ভীষক-সন্ধানে সে পথ অতিক্রম করিতে লাগিল। ইন্দীবর বাল্যাবধিই দেবীগঞ্জে বড় থাকিত না। পূর্ব্বে কলিকাতায় বোর্ডিংয়ে থাকিয়া সে বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছে, পরে চাকুরী হওয়া অবধি বিদেশে অতিবাহিত হইতেছে। দেবীগঞ্জের কাহারও সহিত তাহার পরিচয় বড় ছিল না। নরেশচন্দ্র ভিন্ন অন্যান্য চিকিৎসকের আবাস-স্থানও তাহার অজ্ঞাত ছিল। পথপার্শ্বে উভয় দিককার বাটীগুলির, দ্বারের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সে অগ্রসর হইতেছিল। ক্ষুদ্র সহরে চিকিৎসকের বাহুল্য অধিক নাই। বহুদূর আসিয়াও সে অভী-প্সিতের সন্ধান লাভ করিল না! হতাশ অন্তরে গাড়ির গতি ফিরাইয়া ইন্দীবর অন্য একটী পথে প্রবেশ করিল, কয়েকখানা বাটী অতিক্রম করিয়াই তাহার আনন উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সম্মুখের বাটীখানির দ্বারে একজন এম, বি, চিকিৎসকের নাম ও উপাধি খোদিত কাষ্ঠ-ফলক দুলিতেছিল। সজোরে দ্বারের কড়া ধরিয়া শব্দ করিতেই, একজন ভৃত্য দ্বার উন্মুক্ত করিল। ললাটের স্বেদবারি হস্ত দ্বারা বিদূরিত করিয়া ইন্দীবর কহিল, ডাক্তার শৈলেনবাবুকে ডেকে দাও। ভৃত্য নীরবে প্রস্থান করিল। ইন্দীবর দ্বারসম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিল। অল্পক্ষণের মধ্যেই ভৃত্যসহ শৈলেন্দ্র নাথ আসিয়া দাঁড়াইলেন। ইন্দীবর কিছু বলিবার পূর্ব্বেই তিনি প্রশ্ন করিলেন, কত দূর যেতে হবে? তাঁহার প্রশান্ত আননের প্রতি চাহিয়া ইন্দীবর কহিল, দূর একটু হবে। গাড়ী নিয়ে আসব কি?

একবার বাহিরের, প্রচণ্ড রৌদ্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া শৈলেন্দ্রনাথ কহিলেন, থাক এই রৌদ্রে আর গাড়ী আনতে যেতে হবে না, আমার বাইক আছে তাইতেই যাই চলুন। আপনিও তো বাইকে এসেছেন। অসুবিধা হবে না।

গাড়ী ডাকিবার সদ্য ক্লেশ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া ফুল্লমুখে ইন্দীবর কহিল, তবে চলুন। উভয়ে যানারোহণ করিল।

শৈলেন্দ্রনাথ চিকিৎসক হইয়া পর্য্যন্তই এই স্থানে চিকিৎসা করিতেন। তাঁহার পৈতৃক বাস-ভবনও এই স্থানেই। বাল্যে পিতৃমাতৃহীন। সংসারে একটী অনুজা ভিন্ন আর আপন বলিতে তাঁহার কেহ ছিল না। ভগিনীটীকে বহু যত্নে প্রতিপালন করিয়া বহু অর্থব্যয়ে তিনি তাহার বিবাহ দিয়াছিলেন। কিন্তু এক বৎসরের মধ্যেই সে কালগ্রাসে নিপতিত হইয়া তাঁহাকে সংসারবন্ধন বিচ্যুত করিয়া দিয়া গেল। শৈলেন্দ্রনাথ বিবাহ করেন নাই। নিজ চিকিৎসাকার্য্য লইয়াই তিনি থাকিতেন। এই সময় নরেশচন্দ্রও ডাক্তারি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এস্থানে আসিয়া ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন। নরেশচন্দ্র মিষ্টভাষী সুরসিক জনপ্রিয়। আপনার দর্শনী তিনি শৈলেন্দ্রের দর্শনীর অর্দ্ধেক করিয়া ধার্য্য করিলেন। রোগী ও তাহার পরিজনবর্গকে মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিয়া করায়ত্ত করিবার পদ্ধতি তিনি বিলক্ষণ অব-গত ছিলেন। কয় মাসের মধ্যেই শৈলেন্দ্রনাথের

পরিবর্ত্তে নরেশচন্দ্রের দ্বারাই স্থানীয় অধিবাসিবৃন্দ চিকিৎসা আরম্ভ করাইলেন। শৈলেন্দ্রকে কচিৎ কেহ আহ্বান করিত; ক্রমশঃ তাহাও লুপ্ত হইয়া গেল। শৈলেন্দ্রের অর্থাভাব ছিল না। আপনার জনমানবহীন বৃহৎ ভবনে নানাবিধ পুস্তকরাশির মধ্যে নিমজ্জিত হইয়া থাকিয়াই তাঁহার সময়াতিবাহিত হইত।

শৈলেন্দ্র ও ইন্দীবর যখন রোগিণীর কক্ষে প্রবেশ করিল, তখন রোগিণী সেইরূপ নিস্পন্দ-দেহে শুইয়া ছিল। লীলা সুন্দরী! দারুণ জ্বর-তাপে তাহার সুগৌর আনন প্রস্ফুটিত রক্ত উৎপলতুল্য দেখাইতেছিল। আকর্ণবিস্তৃত নয়ন দুটী নিমীলিত! মৃদু শ্বাস-প্রশ্বাসে বক্ষটী কম্পিত হইতেছিল। শিয়রে বসিয়া ইন্দীবরের জননী রমাসুন্দরী তাহার মস্তকে মৃদু মৃদু ব্যজন করিতেছিলেন। পাদমূলে অমিতা নীরবে বসিয়াছিল। পালঙ্কের অদূরে টেবিলের নিকট দাঁড়াইয়া ইন্দীবরের সহধর্ম্মিণী শুভ্রা বেদানার রস করিয়া রাখিতেছিল। কক্ষে প্রবেশ করিয়া রোগিণীর প্রতি দৃষ্টি পড়িতেই সহসা শৈলেন্দ্র অত্যন্ত চমকিত হইল। ইন্দীবর রোগিণীর প্রতিই চাহিয়াছিল, চিকিৎসকের এ ভাববিপর্য্যয় সে লক্ষ্য করে নাই। গৃহ-চিকিৎসক নরেশচন্দ্রের আগমনাশায় পুররমণীগণ রোগিণীর পার্শ্ব পরিত্যাগ করেন নাই। অপরিচিত ব্যক্তিকে দেখিয়া রমাসুন্দরী ও শুভ্রা কক্ষ হইতে অপসৃত হইলেন। অমিতা কেবল গৃহে রহিল। বহুক্ষণ ধরিয়া বহু যত্নে শৈলেন্দ্র লীলার দেহ পরীক্ষা করিলেন। অমিতা অত্যন্ত অশ্বস্তির সহিত লক্ষ্য করিতেছিল, চিকিৎসকের ব্যাকুল দৃষ্টি মুহূর্ত্তের জন্যও লীলার আনন হইতে অপসারিত হইল না। পরীক্ষা শেষে চিকিৎসক রোগিণীর পালঙ্কের এক ধারেই উপবেশন করিলেন, ইন্দীবর রোগের পূর্ব্ব বিবরণ বলিতেছিল। তখনও শৈলেন্দ্রের নয়ন তেমনই লীলার মুখের উপর সংস্থাপিত। লীলার শিথিল দক্ষিণ করপল্লবখানি শৈলেন্দ্র আপন করে ধরিয়া রাখিয়াছেন। ইন্দীবর অত্যন্ত নিরীহ শান্ত-প্রকৃতি ব্যক্তি। কোন বিষয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, প্রখর অনুমান শক্তি তাহার ছিল না। শৈলেন্দ্রের প্রতি সে একটুও লক্ষ্য রাখে নাই, আপন মনে সে চিকিৎসকের জ্ঞাতব্য তথ্যগুলি তাহাকে অবগত করাইতেছিল। কিন্তু অমিতা দারুণ বিরক্তি অনুভব করিয়া ক্রমশঃ অতিষ্ঠ হইয়া উঠিতেছিল। একি অভদ্র আচরণ! অথচ একজন ভদ্রবেশধারী চিকিৎসকনামে পরিচিত ব্যক্তিকে সহসা কিছু বলিতেও সে পারিতেছিল না। তীব্র দৃষ্টিতে সে মধ্যে মধ্যে শৈলেন্দ্রের প্রতি চাহিতেছিল। বহুক্ষণ সেই ভাবে বসিয়া থাকিবার পর শৈলেন্দ্র উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, অসুখ 'টায়ফায়েড' বলেই মনে হচ্ছে। আপাততঃ ভয়ের কারণ নাই। আমি সন্ধ্যার সময় আবার আসব। অনুগ্রহ করে রোগীর চিকিৎসা-ভার যদি আমার উপর দেন তবে বড়ই সুখী হব।

ব্যস্তভাবে ইন্দীবর কহিল, বেশ তো। সে তো ভাল কথাই! তাই হবে, আপনিই দেখবেন! অমিতা! মার কাছ হতে এঁর ফিটা এনে দে ত'। বার টাকা।

অমিতা উঠিতেছিল। বাধা দিয়া শৈলেন্দ্রনাথ কহিলেন, আমার ফি এখন থাক। রোগী সুস্থ হলে সে সব কথা হবে। এখন আমার প্রয়োজন মত সব সময় আসতে হবে।

চিকিৎসকের উদারতায় মুগ্ধ হইয়া ইন্দীবর কহিল, বেশ আপনার যখন দরকার হবে আসবেন। চলুন এখন ব্যবস্থাপত্রটা লিখে দেবেন।

হাঁ চলুন! আর একবার লীলার প্রতি চাহিয়া

দেখিয়া শৈলেন্দ্র ইন্দীবর সহ গৃহত্যাগ করিলেন। অমিতার মুখে বিরক্তির ছায়া গাঢ় হইয়া আসিল। শৈলেন্দ্রকে বিদায় দান করিয়া ইন্দীবর পুনরায় লীলার কক্ষে প্রবেশ করিল। রমা ও শুভ্রাও কক্ষ

তখনও শৈলেন্দ্রের নয়ন তেমনই লীলার মুখের উপর সংস্থাপিত।

মধ্যে আসিয়া বসিয়াছিলেন। পুত্রকে দেখিয়া রমা সুন্দরী প্রশ্ন করিলেন, এ আবার কোন ডাক্তার রে ইন্দু। ইন্দীবর উত্তর করিল, শৈলেন ডাক্তারের নাম শোন নি মা! এ সেই, বেশ লোক।

বিরক্ত ভাবে অমিতা কহিল, বেশ না ছাই! একে কেন আনলে দাদা? নরেশ বাবু এর চেয়ে অনেক ভাল!

অন্য দিকে চাহিয়া ইন্দীবর অন্য মনে কহিল, তা হ'ক ভাল, বৌমার যে রকম অসুখ তাতে এখন এমন ডাক্তারের উপর নির্ভর করতে হবে যাকে সর্ব্বদা পাওয়া যায়। নরেশবাবু তাঁর সময় মত ভিন্ন আসবেন না। তখন তাঁর উপর এই রোগীর ভার কি করে দিই।

অপ্রসন্ন মুখে অমিতা কহিল, যাই বল দাদা এ ডাক্তার তোমার বড় অভদ্র! যে ভাবে সে বৌদির দিকে চেয়ে ছিল, তাতে ভদ্র মহিলার অসম্মান করা হয়। তার পর ওর হাত খানা নিজের হাতের মধ্যে রেখেছিল কেন?

বিস্মিত ভাবে ইন্দীবর কহিল, তাই না কি! কৈ আমি তো লক্ষ্য করি নি সেটা!

বিকৃতমুখে অমিতা বলিল, তুমি আবার কবে কি দেখে থাক দাদা! থাক ত যদি ছোড়দা এখানে তা হলে অর্দ্ধচন্দ্র দিয়ে ঐ অভদ্র ডাক্তারকে বিদায় করে দিত।

মৃদু হাসিয়া ইন্দীবর উত্তর দিল, হ্যাঁ তোমার

ছোড়দাটী গুণ্ডামীতে খুব পটু সে আমি অবগত আছি! কিন্তু মানুষকে অত ছোট করেই কেবল দেখিস না। অমি! তার অসৎ উদ্দেশ্য না থাকতেও পারে। হাতের স্পর্শে বৌমার হাতের শীতলতা অনুভব করার জন্যে হাতটা হাতে নেওয়াও তার বিচিত্র নয়। যা হউক ওকে দিয়েই চিকিৎসা করাব, নরেশবাবুর বাড়ী হতে আমি যা অপমানিত হয়ে এসেছি তাতে আর তাঁকে ডাকছি না।

রমাসুন্দরী কহিলেন, তোর যা ভাল বোধ হবে তাই করবি বাবা। সে জন্য বলবার কিছু নাই। বৌমা সুস্থ হয়ে উঠলেই আমি সুখী হই। যা'ক গে ওসব কথা। তুই খাবি আয়।

মাতার সঙ্গে ইন্দীবর কক্ষ ত্যাগ করিল। শুভ্রাও তাঁহাদের অনুগামী হইল।

দশ দিন অতীত হইয়া গিয়াছে! লীলার অসুখ বৃদ্ধির পথ ত্যাগ করিয়া এখন ক্রমশ হ্রাসের দিকে আসিতেছিল। তথাপি তাহার স্বাভাবিক চৈতন্য এখনও ফিরিয়া আসে নাই! শৈলেন্দ্র প্রত্যহ চার পাঁচবার, কোনও দিন ছয়বার পর্য্যন্ত আসিয়া বহুযত্নে বহুক্ষণ ধরিয়া রোগিণীকে দেখিয়া অনেকটা সময় তাহার পার্শ্বেই অতিবাহিত করিয়া যান। সরল প্রকৃতি ইন্দীবর বা রমাসুন্দরী ইহাতে দূষণীয় কিছু না দেখিলেও তাঁহার ব্যবহারে অমিতা মনে মনে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইল। দুই একবার সে তাহাতে মনোভার মাতা ও ভ্রাতার নিকট জানাইলেও তাঁহারা তাহাতে কর্ণপাত করেন নাই! শৈলেন্দ্রের মধুর ব্যবহার ও চিকিৎসা-নৈপুণ্য তাঁহাদের বিমুগ্ধ করিয়াছিল! রমা সুন্দরী সাংসারিক কার্য্যে ও শুভ্রা সন্তান পালনেই সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকিতেন! রোগিণীর পার্শ্বে থাকিবার অবসর তাঁহাদের বড় ছিল না। অমিতাই সর্ব্বক্ষণ লীলার নিকট তাহার শুশ্রূষাকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিত! চিকিৎসকের ভাবভঙ্গীও সে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে পর্য্যবেক্ষণ করিত! তাহার অতি যত্নে রোগী পরীক্ষা, বারংবার আগমন ইত্যাদির মধ্যে সে অসৎ অভিপ্রায়ই নিহিত দেখিল।

এদিকে পূজার ছুটী উপলক্ষে সরোজ বাটী আসিল, পত্নীকে পীড়িত দেখিয়া সে ক্ষুব্ধ হইল। বিষণ্ণচিত্তে সে অসুখের সমস্ত বিবরণ জানিয়া তাহার শয্যাপার্শ্বে আসিয়া বসিল। সন্ধ্যাকালে শৈলেন্দ্র আসিলেন। নরেশচন্দ্রের পরিবর্ত্তে তাঁহাকে দেখিয়া সরোজ বিস্মিত হইয়া ভ্রাতার প্রতি জিজ্ঞাসুনেত্রে চাহিল! ইন্দীবর কিছু জানিল না! সন্ধ্যার অন্ধকার তখন ঘনতর হইয়া মৃদু পদক্ষেপে ধরাবক্ষে আগমন করিতেছিল। মঙ্গলময় শঙ্খনির্নাদ সান্ধ্য-বন্দনায় গম্ভীররবে ধ্বনিয়া উঠিতেছিল। স্নিগ্ধ সমীরণ সমস্ত দিনের শ্রমজাত ক্লান্তি হরণ করিয়া উতলাভাবে বৃক্ষপত্রে লুটাইয়া পড়িতেছিল। পূর্ব্বগগনে শুক্লা একাদশীর চন্দ্র দর্শন দিতেছিলেন। তাঁহার শুভ্র আলোকরাশি রোগশয্যায় শায়িতা লীলার পাণ্ডুর আননের উপর বিধাতার আশীষের মতই ঝরিয়া পড়িতেছিল। শয্যাপার্শ্বে আসিয়াই স্থিরনেত্রে শৈলেন্দ্র কিছুক্ষণ সেই দিকে চাহিয়া থাকিয়া রোগীর পরীক্ষায় মনোসংযোগ করিলেন। বিস্মিত বিরক্তভাবে সরোজ দেখিতেছিল, চিকিৎসকের সতৃষ্ণ দৃষ্টি রোগীর মুখের উপরেই সন্নিবদ্ধ রহিয়াছে। স্বভাবত সরোজ অস্থির ক্রোধপরায়ণ। ইন্দীবরের সম্পূর্ণই বিপরীত প্রকৃতি তাহার। চিকিৎসকের ব্যবহারে সে আন্তরিক ক্রুদ্ধ হইয়া অতি কষ্টে আত্মসংবরণ করিয়া রহিল। কিছুক্ষণের পর শৈলেন্দ্র প্রস্থান করিলেন, ইন্দীবরও গৃহ হইতে অন্যত্র গমন করিলেন। অমিতার প্রতি চাহিয়া রুক্ষস্বরে সরোজ কহিল, কোথাকার অসভ্য পশু

এই লোকটা। উপযুক্ত পাত্র বুঝিয়া অমিতা এই অবসরে বলিল, আজ তো তবু শুধু চেয়ে দেখেছে, —অন্য দিন বৌদির হাত নিজের হাতের মধ্যে তুলে নিয়ে ওর মুখের দিকে চেয়ে বসে থাকে। বৌদির চেহারা দেখে ও একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেছে বুঝলে ছোড়দা। কোন প্রয়োজন নাই, তবুও দিন চার পাঁচ বার আসবে? ওষ্ঠে ও দন্তে নিষ্পেষিত করিয়া তীব্রস্বরে সরোজ কহিল, রাস্কেল আমার সামনে ঐ রকম ব্যবহার করলে ওকে আমি উপযুক্ত পুরস্কার দেব। ক্ষুণ্ণমনে অমিতা কহিল, তোমার সামনে হয় ত অভদ্রতা নাও করতে পারে। আর কিছু না বলিয়া গম্ভীরভাবে সরোজ উঠিয়া গেল। অমিতা লীলার বিশৃঙ্খল কেশরাশি একত্র করিয়া সন্তর্পণে একটা বেণী গ্রন্থিত করিতে লাগিল।

বহুদিন পরে দেশে আসিয়া প্রভাতেই সরোজ প্রতিবেশীবৃন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিতে বাহির হইয়াছিল। কিছুক্ষণ পরিভ্রমণ করিয়া যখন সে ফিরিয়া আসিল তখন বেলা নয়টা বাজিয়া গিয়াছে। প্রভাতের স্নিগ্ধজ্যোতিঃ তপন ক্রমশঃ দীপ্ত মূর্ত্তি হইয়া গগনপথে অগ্রসর হইতেছিলেন। শ্যাম তৃণপত্রে রৌদ্রকর পড়িয়া অসংখ্য উজ্জ্বল হীরক-চূর্ণবৎ প্রতীয়মান হইতেছিল। তরুশিরে সেই দীপ্ত রশ্মি পড়িয়া ঝলসিত হইয়া উঠিয়াছিল।

লীলার কক্ষে প্রবেশ করিয়াই সরোজ লক্ষ্য করিল তাহার পালঙ্কের একপার্শ্বে বসিয়া শৈলেন্দ্র স্থিরনেত্রে তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিয়াছে। তাহার অবশ করখানি শৈলেন্দ্রের হস্তে নিবদ্ধ। অমিতা তাহার নিকট রোগিণী গত রাত্রে কিরূপ নিদ্রা গিয়াছিল, কত পর্য্যন্ত গাত্রের উত্তাপ উঠিয়াছিল বিরক্তমুখে তাহাই বলিতেছিল। সরোজের পদ হইতে কেশ পর্য্যন্ত জ্বলিয়া উঠিল। দ্রুত অগ্রসর হইয়া চিকিৎসকের সম্মুখে দাঁড়াইয়া পরুষকণ্ঠে সে কহিল, অভদ্র, ছোটলোক, তুমি ডাক্তার! রোগী দেখতে এসেছ? একদৃষ্টে রোগীর মুখের দিকে চেয়ে থেকে তোমার চিকিৎসা হচ্ছে? এই কুভাব মনে নিয়ে তুমি ভদ্র লোকের বাড়ী এস! বদমাস, ভণ্ড, ষ্টুপিড রাসকেল শীঘ্র দূর হয়ে যাও নয় ত অপমান হবে। যাও বলছি; এখনও উঠলে না? সজোরে সরোজ শৈলেন্দ্রের কণ্ঠ পীড়ন করিল। প্রথমটা শৈলেন্দ্র হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছিল। তাহার পর ধীরে ধীরে উঠিয়া দ্বারের দিকে অগ্রসর হইল। পুনশ্চ তাহার পৃষ্ঠে একটা ধাক্কা দিয়া সরোজ বলিল, মনে রেখ এ দেশে যদি তোমায় দেখতে পাই, তা হলে আর তোমায় জীবন্ত রাখব না! তোমার এ গুণকাহিনী এখনি আমি সর্ব্বত্র প্রচার করে দিচ্ছি! দেখি তুমি কেমন করে লোকসমাজে আর বার হও, ভাল চাও তো এখান থেকে চলে যাও! নয় ত তোমার শাস্তি এখনও শেষ হয় নি জেন।

একবার সরোজের প্রতি চাহিয়া নীরবে শৈলেন্দ্র কক্ষ ত্যাগ করিল। অমিতা কহিল, দেখলে ছোড়দা দোষী কি না তাই একটা কথা বললে না। যাই হক দাদা কিন্তু তোমার উপর এজন্য রাগ করবেন ছোড়দা।

তাচ্ছিল্যভরে সরোজ কহিল, করুন আমি সে গ্রাহ্য করি না।

অপরাহ্নে নরেশচন্দ্রকে শকটে উঠাইয়া দিয়া বাটির ভিতর সরোজ প্রবেশ করিতেই বিস্মিত ভাবে ইন্দীবর প্রশ্ন করিল, নরেশবাবুকে ডাকা হ'ল কেন রে? শৈলেন তো বেশ চিকিৎসা করছে।

ভ্রূভঙ্গী করিয়া রুক্ষকণ্ঠে সরোজ উত্তর করিল, চিকিৎসা তো ভাল করছেন কিন্তু তার ব্যবহারটা লক্ষ্য করে দেখেছ কি? বিস্মিতভাবে ইন্দীবর কহিল, কেন কি করেছে সে? সরোজ কহিল,—কি

করেছে সে? ভণ্ড ছোটলোক! বর্ব্বর! ভদ্র মহিলার সম্মান সে বিনষ্ট করতে চায়, তাকে অন্তঃপুরে প্রবেশ অধিকার দিতে আছে? আজ গলা ধাক্কা দিয়ে তাকে দূর করেছি। এবার যেদিন দেখব তার ঘাড় গুঁড়ো করে দেব, ষ্টুপিড।

ইন্দীবর বিহ্বলনেত্রে ভ্রাতার উদ্দীপ্ত মুখের প্রতি নীরবে চাহিয়া রহিল। কতকটা সংযত হইয়া সরোজ প্রভাতের ঘটনা যথাযথভাবে বর্ণনা করিলে পর অতি ক্ষুব্ধভাবে ইন্দীবর বলিল, মানুষ চিনবার ক্ষমতা বোধ হয় তোর চেয়ে আমার বেশী আছে সরোজ, কাজ ভাল হয় নি। পরে হয়ত অনুতাপ করতে হবে। বিরক্তভাবে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে করিতে সরোজ বলিল, আচ্ছা হয় হবে। সে চলিয়া গেলে কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে বসিয়া থাকিবার পর ইন্দীবর গৃহ হইতে বাহির হইয়া রাজপথে আসিয়া পড়িল। শৈলেনের সহিত তাহার পূর্ব্বে পরিচয় কখন ছিল না। কিন্তু এই গম্ভীরপ্রকৃতি স্বল্পভাষী উদাসীনস্বভাব লোকটীকে দর্শনাবধি তাহার চিত্ত আকৃষ্ট করিয়াছিল। তাহারই গৃহে তাহার ভ্রাতা কর্ত্তৃক শৈলেন্দ্রের এই লাঞ্ছনাভোগের সংবাদে সে অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইয়া তাহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে তাহার বাটীর অভিমুখে যাত্রা করিল। সরোজের প্রতি সমস্ত চিত্ত তাহার বিরূপ হইয়া উঠিল। শৈলেন্দ্রের বাড়ী আসিয়া পূর্ব্ব অভ্যাস মত ইন্দীবর কড়া নাড়িয়া কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিল। দ্বার মুক্ত হইল না। পুনর্ব্বার সে সজোরে রুদ্ধ দ্বারে আঘাত করিল। ঝন ঝন শব্দে সে আঘাত প্রতিধ্বনিত হইয়া ফিরিয়া আসিল! সবিস্ময়ে ইন্দীবর দ্বারের প্রতি চাহিল, শিকলের উপর আবদ্ধ একটা বড় তালা ঝুলিতেছে! বিস্মিত ব্যথাতুরনয়নে বহুক্ষণ একাগ্রদৃষ্টিতে সেই দিকে চাহিয়া থাকিয়া, ব্যথিতহৃদয়ে সে বাড়ী ফিরিল। তাহার দৃঢ় ধারণা হইল অপমানিত লাঞ্ছিত হইয়া মর্ম্মাহত শৈলেন দেশত্যাগ করিয়াছে, আর ফিরিবে না। তাহার দেশত্যাগের মূল কারণ আপনাকে নিরূপিত করিয়া ইন্দীবর অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও অনুতপ্ত হইয়া উঠিল! শৈলেন্দ্রকে দোষী বলিয়া ভাবিতেও পারিল না।

এক মাস পরের কথা! লীলা সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়া পিত্রালয়ে গমন করিয়াছে। ইন্দীবরের অবকাশ তখনও শেষ হয় নাই, সে দেশেই অবস্থান করিতেছিল। কলেজ বন্ধ, সরোজও কলিকাতা গমন করে নাই। অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম। পল্লীগ্রামে তখন একটু বেশী পরিমাণেই শৈত্য উপলব্ধি হইতেছে। বাতাসের স্পর্শ দেহ ভেদ করিয়া অস্থি মজ্জায় কম্পন জাগাইয়া তুলে। কুহেলিকার আবরণে জ্যোৎস্নামযী রজনীও তখন স্তিমিত জ্যোতিহীন। প্রভাতের কিছু পরে দ্বিতলস্থ একখানা সজ্জিত গৃহে বসিয়া ইন্দীবর সরোজ এবং আরও কয়েক জন তরুণ নানাবিধ হাস্য গল্পে কক্ষ মুখরিত করিতেছিল। এই যুবকদল মধ্যস্থ একজন কলিকাতা-নিবাসী চিকিৎসক। ইন্দীবরের মাতুলপুত্র। পূজার ছুটী উপলক্ষে অমিয়কুমার পিতৃস্বসৃ গৃহে বেড়াইতে আসিয়াছিল। কয়েকটা অবান্তর বাক্যের পর সহসা অমিয় বলিল হ্যাঁরে ইন্দু তোদের এখানে যে শৈলেন বসু ডাক্তার ছিল তাকে তোরা জানতিস কেউ?

গৃহস্থিত সকলেই বলিল,—হাঁ হাঁ জানতুম বৈ কি। কেন?

তাকে দেশ ছাড়া করলে কে রে? বিস্মিত ভাবে ইন্দীবর কহিল,—তুমি একথা জানলে কি করে? ক্ষুব্ধ কাতরস্বরে অমিয় কহিল,—আমি জানব না? এ জগতে সে হতভাগার বন্ধু বলতে কেউ যদি থাকে তবে সে এক আমিই। কে তাকে

এই শাস্তি দিলে যদি জানতে পারতুম! তোরা কেউ জানিস? একবার তার সন্ধান পেলে আমি দেখে নিই তাকে।

সহসা সরোজ বলিল, তার কি অপরাধ? দোষীর শাস্তি দেওয়া কি অন্যায়?

দোষী কে? শৈলেন! তোরা জানিস না রে। এই চিঠিখানা পড়ে দেখ। তোদের ভুল ধারণা থাকবে না। আচ্ছা আমিই পড়ছি। পকেট হইতে একখানা পত্র বাহির করিয়া অমিয় পড়িতে লাগিল,—

ভাই অমিয়!

তোমার নিকট হয় ত এই আমার শেষ পত্র। আমি জন্মের মতই জন্মভূমি হইতে বিদায় লইয়া যাইতেছি। কোথায় যাইতেছি তাহা আমিও এ পর্য্যন্ত জানি না। সেই জন্য তোমাকেও জানাইতে পারিলাম না। কেন যাইতেছি তুমি জানিতে চাহিবে। তোমার নিকট কোন কথা কখন গোপন করি নাই, তাই তোমাকেই জানাইয়া যাইতেছি। জগতের চক্ষে আজ আমি দারুণ অপরাধে অপরাধী, লাঞ্ছিত, হেয়! আমার নির্দ্দোষীতায় আজ বিশ্ববাসী সন্দিহান হইবে। কিন্তু যাঁহার চক্ষে পৃথিবীর ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর ঘটনাটী পর্য্যন্ত নিয়ত সুপরিস্ফুট হইতেছে তিনিও কি আমায় অপরাধী বলিয়া গণ্য করিবেন? চির সুহৃদ আমার! তুমিও কি আমায় বিশ্বাস করিবে না? তথাপি তোমায় সকল বিবরণ জানাইয়া যাই। ইচ্ছা হয় অবিশ্বাস করিও। আমার ছোট বোন কল্যাণীর কথা তোমার মনে পড়ে কি? শৈশবে পিতৃমাতৃহীন এই ভগিনীটীকে বড় যত্নে বড় স্নেহে প্রতিপালন করিয়া বহু অনুসন্ধানে ধনীর গৃহে সুবিদ্বান পাত্রে তাহাকে সমর্পণ করিয়াছিলাম। আশা ছিল সে সুখী হইবে। কিন্তু কয়েকদিন পরেই আমার সে ভ্রম ধারণা দূরীকৃত হইল। বিবাহের অষ্টাহ পরে কল্যাণীকে আনিতে গিয়া যখন শুনিলাম পিতা মাতা বা অন্য কোন রমণী বিহীন গৃহে একাকী ভ্রাতার নিকট তাহারা আর বধূ পাঠাইবে না। সেই দিনই বুঝিলাম কল্যাণীর অদৃষ্ট-দেবতা তাহার প্রতিকূল। নিরাশহৃদয়ে ফিরিয়া আসিলাম। প্রায়ই আমি তাহাকে পত্র দিতাম, কদাচিৎ অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর আসিত। বুঝিলাম তাহার পত্র লেখাও সেখানে নিয়মের গণ্ডিতে আবদ্ধ। ক্রমশঃ তাহার পত্র আসা একেবারেই বন্ধ হইয়া গেল। অত্যন্ত ব্যাকুল ও উৎকণ্ঠিত হৃদয়ে নানারূপে তাহাদের সংবাদ লইবার চেষ্টা করিয়া ক্রমশঃ যাহা জানিতে পারিলাম তাহাতে বজ্রাহত হইয়া পড়িলাম। কল্যাণীর স্বামী অজিতকুমার চরিত্রহীন। ব্যথাহতবক্ষে দিবস অতিবাহিত করিতেছিলাম। সহসা একটা সংবাদ আসিয়া আমার সকল চিন্তার পরিসমাপ্তি করিয়া দিয়া গেল। কয়দিন পূর্ব্বে বিসূচিকা রোগে কল্যাণীর মৃত্যু হইয়াছে। ইহা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হইল না। একবার ভাবিলাম সন্ধান লই। সত্য সংবাদ বাহির করি। পরক্ষণেই নিরস্ত হইলাম। কি হইবে? কল্যাণীকে তো আর ফিরিয়া পাইব না। এই সময় এদেশে আমার প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে নরেশ আসিয়া দর্শন দিল। আমার ব্যবসায়ে দিন দিন অবনতি হইতে লাগিল। আমি তাহাতে প্রফুল্লই হইলাম। কয়েক দিন পূর্ব্বে একজন ভদ্রব্যক্তি তাহার ভাতৃ-বধূকে চিকিৎসা করিবার জন্য আমায় আহ্বান করিলেন। রোগীর কক্ষে প্রবেশ করিয়াই আমি চমকিয়া উঠিলাম। মানুষের সহিত অন্য মানুষের এত সাদৃশ্য থাকিতে পারে ইহা আমার পূর্ব্বে ধারণা ছিল না। এ যেন কল্যাণীর প্রতিচ্ছবি। অতৃপ্তভাবে তাহার প্রতি আমি চাহিয়া রহিলাম। স্নেহময়ী

অম্বুজাটীকে দর্শন করিবার যে আকুল আগ্রহ আমার বক্ষে নিরুদ্ধ ছিল অদ্য তাহা যেন পরিতৃপ্তি লাভ করিল! বিনীতভাবে গৃহস্বামীকে রোগিণীর চিকিৎসাভার আমার উপর অর্পণ করিতে বলিলাম। তিনি সম্মত হইলেন। প্রত্যহ বহুবার আসিয়া আমি তাহাকে দেখিয়া যাইতাম। কল্যাণীর বিয়োগ-বেদনা এত দিনে যেন উপশম হইয়া আসিল। এই রোগিণীর মধ্য দিয়া সর্ব্বান্তঃ-করণে আমি কল্যাণীর সত্ত্বা অনুভব করিলাম। একাগ্রচিত্তে আমি তাহার প্রতি চাহিয়া থাকিতাম। তাহার শ্লথ হস্ত কখনও আমার করমধ্যে ন্যস্ত করিতাম। স্থানকালপাত্র সমস্ত বিস্মিত হইয়া আমি ইহাকে ভগিনীরূপে গ্রহণ করিলাম। রোগি-ণীর স্বামী বাটী আসিলেন, আমাকে তাহার পার্শ্বে তাহার হস্ত হস্তে লইয়া বসিয়া থাকিতে দেখিয়া ক্রোধে জ্ঞান হারাইয়া কুৎসিত অপবাদ দিয়া আমায় বিতাড়িত করিলেন। ক্ষণমধ্যে সমস্ত দেশ আমার কলঙ্কে পূর্ণ হইল। সত্য! আমি রমণীর অসম্মান করিয়াছি। তাহার নারীমর্য্যাদায় আঘাত দিয়াছি। ইহার প্রায়শ্চিত্ত আমার আবশ্যক। তাই দেশত্যাগ করিয়া দূর অজানা দেশে যাত্রা করিলাম, আমার সমস্ত সম্পত্তি এখানকার দরিদ্রভাণ্ডারে দরিদ্রসেবায় নিয়োজিত করিতে দিয়া যাইতেছি। তবে বিদায় বন্ধু বিদায়! যদি পার মনে রাখিও।

হতভাগ্য শৈলেন।

পত্রপাঠ শেষ হইলে স্তব্ধভাবে সকলে বসিয়া রহিলেন! সহসা ব্যাকুলকণ্ঠে সরোজ বলিয়া উঠিল, এ কি করলুম দাদা! এ আমি কি করলুম? সজল গাঢ়স্বরে ইন্দীবর কহিল,—ভুল! মহা ভুল! যার বিনিময়ে একটা অমূল্য জীবন চিরতরে বিনষ্ট, হয়ে গেল! বিস্ময়জড়িত স্বরে অমিয় কহিল, কি শুনছি, তোমরাই এই নিষ্ঠুর ব্যাপারের নায়ক? এ কি সত্য? কেহ কথা কহিল না। ইন্দীবরের নয়নপ্রান্তে দুই বিন্দু অশ্রু শিশিরবিন্দুর মতই টল টল করিতেছিল।

উপন্যাস

কমলকুমারী

স্বর্গীয় শ্রীপূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

ঐ দিবস অপরাহ্নে ক্ষমা তাহার দৈনিক কার্য্য সমাপনান্তে কমলকুমারীর নিকট বসিল, ও পলাইবার সম্বন্ধে নানাপ্রকার প্রশ্ন করিতে লাগিল। কিন্তু তিনি ঐ সকল প্রশ্নের কোন উত্তর না করিয়া প্রকারান্তরে অন্য কথা তুলিলেন। ইতোমধ্যে বসন্তকুমারী চুলের দড়ি, সিন্দুরকৌটা ও চিরুণী হাতে করিয়া হাসি হাসি মুখে ঐ স্থানে উপস্থিত হইলেন। তাহার আনন্দভরা মুখ দেখিয়া কমলকুমারী হাত ধরিয়া কাছে বসাইলেন। বসন্তকুমারীর বয়ঃক্রম দ্বাবিংশতি বৎসর হইবে, দেখিতেও সুন্দরী বটে। গৃহস্থের বধূদের সচারাচর যেরূপ সুন্দরী বলিয়া লোকে প্রশংসা করে সেইরূপ সুন্দরী, অসামান্যতা কিছুই ছিল না। কমলকুমারী তাহাকে বসাইয়া বলিল,—"আজ যে গালভরা হাসি দেখছি? বুঝি—তিনি।" বসন্ত হাসিয়া লুটাইয়া পড়িয়া বলিল, "হ্যাঁ বৌদিদি! তিনি এসেছেন।" কমলকুমারী চিরদিনই দুঃখে কষ্টে লালিত পালিত, দুঃখ কষ্ট হইলে কখনও প্রকাশ করিতেন না, অথবা তাহার ছায়া মুখেও পড়িত না; তিনি যে বাটীতে অন্যের স্ত্রীপরিচয়ে বাস করিতেছেন আজ সেই বাড়ীতে তাঁহার স্বামী আসিয়াছেন ও কিছুদিন বাস করিবেন। কি ভয়ানক কথা—এই যে আশঙ্কা—তাঁহার মুখে কি ব্যবহারে কোনই ভাবান্তর প্রকাশ পাইল না, তিনিও হাসিয়া বলিলেন, "আজ ভাল ক'রে সাজগোজ কর।"

বসন্ত বলিল—"বৌদিদি! তোমার কাছে চুল বাঁধিতে আসিয়াছি।"

ক্ষমা। কেন? তোমার যিনি রোজ চুল বাঁধিয়া দেন তাহার কাছে যাও না, তোমার বৌদিদির পা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে উনি বসিবেন কেমন করিয়া।

বস। তারা বৌদিদির মত ভাল বাঁধিতে জানে না।

ক্ষমা। তোমার বৌদিদি ত কখনও নিজের চুল বাঁধেন না, ওঁর চুল দেখিছ ত এলোথেলো জড়ান থাকে।

বস। তা হ'ক, উনি আমার বোধ হয় খুব ভাল চুল বাঁধিতে জানেন।

কম। না, না, এস, এস, আমি চুল বাঁধিয়া দিব।

এই বলিয়া হাসিতে হাসিতে উঠিয়া, দেয়ালে ঠেস্ দিয়া বসিয়া বসন্তের চুল বাঁধিতে লাগিলেন, বামহস্তে বসন্তের মাথার চুলের গোছা ও দক্ষিণহস্তে চিরুণী ধরিয়া হাসি হাসি মুখে চুলের উপর চিরুণী টানিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহার হৃদয়ে যে কি একটা বিপ্লব উঠিল অন্যে তাহা কে বুঝিবে, তাহার অবস্থা স্ত্রীলোকেই বুঝিতে পারিবেন। চুল বাঁধার সহিত অনেক প্রকার গল্প চলিল। বসন্ত স্বামীর সহিত তাহার বাল্যকালের কথাবার্ত্তার কিছু কিছু পরিচয় দিতে লাগিল। এই কথাপ্রসঙ্গে তিনি তাহার দাদার (বামন দাসের) কথা তুলিলেন। বলিলেন,—"দেখ বৌদিদি! দাদার জেদ যে, তিনি আজ তোমার সঙ্গে দেখা করেন। আমি বলিলাম কখনই তা হ'তে পারে না, কেন না তুমি পা ভাঙ্গিয়া পড়িয়া আছ, এখন কি স্বামীর সঙ্গে দেখা করা উচিত। তিনি তবু জেদ করিতে লাগিলেন, আমি উহাতে রাগ করিয়া মাকে গিয়া জানাইলাম, তিনি দাদাকে ক্ষান্ত করিয়াছেন কিন্তু তুমি ভাই

শীঘ্র শীঘ্র সারিয়া উঠ, আর কত দিন পড়িয়া থাকিবে আর দাদাই বা কত দিন তোমাকে না দেখিয়া থাকিতে পারেন।"

কম। দুই এক দিনের মধ্যেই সারিয়া উঠিব।

বসন্তের চুল বাঁধা শেষ হইলে সে উঠিয়া গেল। চতুরা পরিচারিকা ক্ষমা এখন নির্জ্জন দেখিয়া বলিল,—"দিদি ঠাকরুণ! এখন উপায়, পলাইবার চেষ্টা কাল রাত্রে স্থির না করিয়া আজ রাত্রে করিলে ভাল হইত, কেন না যদি কোনও গতিকে তোমাকে দেখিতে পান তবে বসন্ত দিদিকে তোমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিবেন। তা হইলে কি হইবে?"

কমলকুমারী নীরবে রহিলেন, তিনি মনে মনে যাহা ভাবিতেছিলেন, ক্ষমা তাহা কি বুঝিবে?

তাঁহার স্বামীকে দেখিবার বাসনা বড় প্রবল হইল, কেন না তিনি স্বামীকে বড় ভালবাসিতেন। বাল্যকালে যেদিন নদীতীরে স্বামীকে প্রথম দেখিলেন সেইদিন এই ভালবাসার অঙ্কুর জন্মিল! পরে বর্দ্ধমানে তাঁহাকে দুইবার দেখিয়া সে ভালবাসা অপ্রতিহতবেগে তাঁহার হৃদয় প্লাবিত করিল, অন্য কোনরূপ মনোবৃত্তি বা ভাবের তিলার্দ্ধ স্থান ছিল না। তিনি স্বামীকে দিবারাত্র ভাবিতেন, তাহাকে দেখিবার জন্য অধৈর্য্য হইয়া বেড়াইতেন কিন্তু পাছে সেই স্বামীকর্ত্তৃক বর্জ্জিতা হ'ন, এই একটা আশঙ্কায় মধ্যে মধ্যে তাঁহার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিত। কমলকুমারীর ভালবাসা প্রতিদান আকাঙ্ক্ষা-রহিত, কেবল একটামাত্র আকাঙ্ক্ষা ছিল যে, তিনি স্বামীর নিকটে থাকেন ও তাঁহাকে দিবারাত্র দেখেন, যাহা হউক এখন তাঁহার স্বামীকে দেখিবার ইচ্ছা বড় প্রবল হইল। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে শয়নের সময় উপস্থিত হইল, ক্ষমা শয্যা রচনা করিতেছে, এমন সময় কে যেন বারেন্দার দ্বার আস্তে আস্তে করাঘাত করিতে লাগিল। ক্ষমা নিঃশব্দে যাইয়া দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কে গা?" অস্ফুটস্বরে বসন্তকুমারী বলিল, "ক্ষমা দ্বার খোল।"

ক্ষ। কেন গা?

বস। আমি একবার বৌদিদির সঙ্গে দেখা করিব।

ক্ষ। তিনি ঘুমাইয়াছেন।

বস। তাহা হউক, আমি উঠাইব!

ক্ষমা দ্বার খুলিয়া দেখিল বসন্তকুমারী আপাদমস্তক অলঙ্কারে সজ্জীভূতা হইয়া আড়ষ্ট হইয়া হাঁটিতেছেন। বসন্ত কমলকুমারীর ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিল,—"বৌদিদি কেমন হইয়াছে দেখ দেখি।" কমলকুমারী বুঝিল স্বামীসম্ভাষণে যাইবার জন্য বসন্তকুমারী প্রাণপণে সাজিয়াছেন। ক্ষমা নিকটে আলো আনিলে দেখিলেন পদযুগলে যত প্রকার রূপার গহনা সেকালে চলিতেছিল তাহা পরিয়াছেন, ঐ সকল রৌপ্যগহনা লোহার বেড়ি অপেক্ষা ভারি, সে জন্য বসন্তকুমারী এই গুরুভারে হাঁটিতে পারিতেছেন না, হাতে গলায় ও কটিদেশে সেকালে যত প্রকার স্বর্ণ অলঙ্কার ছিল তাহা পরিয়াছেন, কিছু বাকি রাখেন নাই। এই সকল অলঙ্কারের গুরুভারে বসন্ত আড়ষ্ট হইয়া দাঁড়াইলেন, তাঁহার যে সৌন্দর্য্যটুকু ছিল তাহা এই সজ্জাতে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল, হাত পা নাড়িতে পারিতেছেন না। ক্ষমা পরিচারিকা, মুখে কাপড় দিয়া পশ্চাতে দাঁড়াইয়া হাসিতেছিল। কমলকুমারী ভাল করিয়া তাহার সাজ নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন, "বেশ হয়েছে দিদি! যাও, এখন ঘরে যাও।" বসন্তকুমারী সন্তুষ্টা হইয়া গুরুভার অলঙ্কারে কষ্টে হাঁটিতে লাগিলেন, ক্ষমা যাইয়া বারেন্দার দ্বার বন্ধ করিয়া আসিয়া হাসিতে লাগিল, কমলকুমারী ধমক দিলেন।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

রাত্রি প্রভাত হইয়াছে, সূর্য্যোদয় হইল, পরিচারিকাগণ আপন আপন কার্য্যে নিযুক্ত হইল, কেহ ঘর ঝাঁট দিতে লাগিল, কেহ ঘর ধুইতে লাগিল, কেহ বা বাসন মাজিতে আরম্ভ করিল, কেহ রান্না ঘর ধুইয়া উনান ধরাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিল, কেহ বা গোয়ালে যাইয়া গরু বাহির করিয়া গোয়াল ঘর পরিষ্কার করিতে লাগিল, আর উচ্চপদস্থ পরিচারিকাগণ যাহারা উপরের কাজ করিত, তাহারা ঘরে ঘরে বিছানা তুলিয়া ঝাঁট দিতে আরম্ভ করিল। একটি ঘরে প্রবেশ করিয়া একটী পরিচারিকা ঝাঁটা হাতে করিয়া হাঁ করিয়া দাঁড়াইল। উহা বসন্তকুমারীর ঘর, বসন্ত এলোথেলো বেশে বিছানায় বসিয়া তাহার গহনাগুলি খুলিয়া দেখিতেছেন, পরে বিছানার বালিশ, তোষক, গদি পর্য্যন্ত তুলিয়া দেখিতেছেন, খাটের নীচে, খাঠের পার্শ্বে, এস্থানে ওস্থানে অন্বেষণ করিতেছেন যেন বহুমূল্যের ১ খানা অলঙ্কার হারাইয়াছেন, পরে পরিচারিকাকে দেখিয়া বলিলেন,—"হাঁ-লা মোহিনি! আমার গলার হার কি হল?"

এই কথায় মোহিনীর হাঁ-টা আরও বাড়িয়া উঠিল, চক্ষু দুটো আরও বড় হইল, সে বলিল, "দিদিমণি! সোনার হার?"

বস। হাঁ. সোনার নয় ত কি রূপোর! তুই ত আমার ঘর ঝাঁট দিস্, বিছানা করিস্, কি হইল বল?

মোহিনী। আমি সন্ধ্যা বেলা বিছানা করিয়া গিয়াছি, তখন ত তুমি গহনা পর নাই, তুমি গহনা পরিলে, আর ত আমি ঘরে আসি নাই।

বসন্ত বড় গোলে পড়িল, মা, বাবা শুনিলে কি বলিবে, বড় গালি দিবে—কি হইবে? আমরা বলি হইবে আর কি? তুমি যে হার গত রাত্রে গলায় পরিয়াছ তাহাই কণ্ঠে পরিয়া থাক, তাহাতেই স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম ও কর্ম্ম, সেই হার যেন তোমার কণ্ঠে চিরদিন থাকে।

বসন্ত বড় ব্যস্ত হইয়া তাহার হার খুঁজিতে লাগিলেন, খুঁজুন, আমরা কমলকুমারী কি করিতেছেন দেখিগে চল।

কমলকুমারী আজ বড় চঞ্চলা, স্বামীকে দেখিবার জন্য বড় অধীরা হইয়াছেন, কোনও প্রকারে ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে পারিতেছেন না। তাঁহার গতি বসন্ত-পবনচ্যুত পল্লবখণ্ডের ন্যায়. কিন্তু আজ তাঁহার গতি খরতর. কেবল এস্থানে ওস্থানে যাইতেছেন, কোনও স্থানে স্থির হইতে পারিতেছেন না। তাঁহার ঘরের পার্শ্বেই আর একটা ঘরে স্বামী বাস করিতেছেন, আর তিনি তাঁহাকে দেখিতে পাইতেছেন না. আক্ষেপের কি শেষ আছে? তাঁহার মহলে অন্তঃপুরের দিকে যে কয়েকটা জানালা আছে তাহার মধ্যে একবার কোনটাতে দাঁড়াইতেছেন; কৈ? দেখিতে পাইলেন না ত। আবার অন্যটাতে দাঁড়াইতেছেন, দেখিতে পাইলেন না। কমলকুমারীর আশা বড় অসঙ্গত, গৃহস্থের জামাতা কি তাঁহাকে দেখা দিবার জন্য অন্তঃপুরের এক স্থানে দাঁড়াইয়া থাকিবে?

অরবিন্দ এই সময়ে আম্রকাননে যেস্থানে ডাকাতদের গুপ্তচর লুকাইয়াছিল, সেইস্থানটী দেখিতে গিয়াছিলেন, ইতিমধ্যে ক্ষমা তাহার বারেন্দায় ঝাঁট দিতে দিতে একছড়া স্বর্ণহার কুড়াইয়া পাইয়া কমলকুমারীকে দেখাইল! তিনি উহা দেখিবামাত্র বলিলেন, "এ বসন্তের হার, কালরাত্রে আমাকে যখন সাজ দেখাইতে আসিয়াছিল, উহা তাহার গলা হইতে পড়িয়া গিয়াছে, যা যা শীঘ্র তাকে দিয়া আয়। আহা! সে কত খুঁজিতেছে।" ক্ষমা এই কথায় বসন্তের মহলে চলিয়া গেল। সেখানে একটু

বিলম্ব হইল। দ্বার ভেজান রহিল; কমলকুমারী অনন্যমনে স্বামীকে দেখিবার উদ্দেশে জানালার প্রতি চাহিয়া আছেন, ইতিমধ্যে অরবিন্দ আম্র-কানন পরিদর্শন করিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। একটি অপ্রশস্ত গলির শেষভাগে খিড়কির দ্বার, খুলিয়া প্রবেশ করিলেন, প্রবেশমাত্র যাঁহাকে দেখিলেন, প্রস্তরবৎ দ্বারের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া নিমেষ-শূন্য চক্ষে তাঁহাকে দেখিতে লাগিলেন। এই সময়ে কমলকুমারী দ্বারের দিকে একবার চাহিলেন, চাহিবা মাত্র একটি অস্ফুট চীৎকার করিয়া দুই হাতে জানালার দুইটী গরাদে ধরিয়া অরবিন্দকে দেখিতে লাগিলেন। যিনি তাঁহার পতি, যাঁহাকে দিবা-রাত্র চিন্তা করিয়া থাকেন, যাঁহাকে দেখিবার জন্য বড় কাতরা হইয়া-ছেন, তিনি তাঁহার সম্মুখে দাঁড়া-ইয়া, প্রাণ ভরিয়া দেখিতে লাগি-লেন, চক্ষের পলক পড়িতেছে না। ঊর্দ্ধমুখে তাঁহার প্রতি চাহিয়া রহিলেন, তজ্জন্য মাথার কাপড় কিঞ্চিৎ সরিয়া গেল, ইতি মধ্যে বসন্তকুমারী হার হাতে করিয়া দ্রুত ঐ বারান্দায় প্রবেশ করিয়া দেখি-লেন, কমলকুমারী অজ্ঞান হইয়া দ্বারের পার্শ্বে কি দেখিতেছেন, সেই দিকে চাহিয়া দেখিলেন তাঁহার স্বামী দাঁড়াইয়া; উভয়ে উভয়ের প্রতি চাহিয়া রহিয়াছে, ইহা দেখিয়া সরলপ্রকৃতি বসন্তকুমারী হাড়ে চটিয়া উঠিলেন, চীৎকার করিয়া বলিলেন,—"বৌদিদি! ও কি করিতেছ? চোক বোজ, ঘোমটা দাও, ও কি লজ্জা সরম ত্যাগ

যাঁহাকে দেখিবার জন্য বড় কাতর হইয়াছিলেন.. ...তাঁহাকে প্রাণ ভরিয়া দেখিতে লাগিলেন।

ঐ গলির দুই পার্শ্বে দুইটি দ্বার ছিল, পূর্ব্বেরটিতে বসন্তের মহলে যাইতে হয়, আর পশ্চিমেরটি কমল-কুমারীর মহলে প্রবেশের দ্বার। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে এই দ্বার ভেজান ছিল, অরবিন্দ ভ্রমক্রমে ঐ দ্বার

করিয়া কি দেখিতেছ? কেন রূপ কি কখন দেখ নাই—ছি! ও যে তোমার নন্দাই, নাও চোক বোজ, ঘোমটা দাও।" এই বলিয়া দক্ষিণ হস্ত দ্বারা তাহার চক্ষু চাপিলেন, ও

বাম হস্ত দিয়া ঘোমটা টানিয়া দিলেন। অরবিন্দ পলাইল। ক্ষমা বসন্তের পশ্চাতে ছিল, সে এই দৃশ্য দেখিয়া কাঁপিতে লাগিল। বসন্ত বলিল—"বৌদিদি! তুমি কি তোমার নন্দাইকে চেন না?"

কমলকুমারী অবস্থা বড় গুরুতর বুঝিয়া মিথ্যা কৈফিয়ত দিলেন, বলিলেন—"আমি মনে করিয়াছিলাম ঐ ব্যক্তি ডাকাত, তাই ভয়ে এই গরাদে ধরিয়া পাথর হইয়া দাঁড়াইয়া ছিলাম, চেঁচাইতে পারি নাই, পাছে সে গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলে, আর তুমি না আসিলে ভয়ে আমি তাহার পায়ে জড়াইয়া পড়িতাম।"

এই কৈফিয়ত অন্তস্ত্রীর সন্তোষজনক হইত না বটে কিন্তু সরলা বসন্তকুমারীর হইল। এইক্ষণে তাহার কমলকুমারীকে ছাড়িয়া স্বামীর প্রতি রাগ জন্মিল। বলিলেন—"আর মিনসেরই বা কি স্বভাব, পরের স্ত্রীর পানে চেয়ে থাকে।" স্বামীকে মিন্‌সে বলিয়া উল্লেখ করাতে আমাদের মনে হয় স্বামীর প্রতি তাহার ভক্তি শ্রদ্ধা জন্মায় নাই।

যাহা হউক, যখন আহারের পর অরবিন্দ বসন্তের ঘরে গেলেন তখন বসন্ত তাহাকে বলিল, "তোমার কি রকম স্বভাব—তোমার শ্যালাজের প্রতি অমন করে চাহিয়াছিলে কেন?

অর। উনি তোমার ভাজ? বামনদাসের স্ত্রী?

বস। হ্যাঁ, তা কি জান না?

অর। কেমন করিয়া জানিব? কখন ত দেখি নি, উনি কবে আসিয়াছেন?

বসন্তের একটা শিক্ষা ছিল যে, পিত্রালয়ের সুখ্যাতি ভিন্ন কোন কথা স্বামীকে কি শ্বশুর বাড়ীতে বলিতে নাই, এই শিক্ষাবশতঃ ভাই ভাজের এমন একটা সুখ্যাতির কথা বলিলেন—যাহাতে কমলকুমারীর স্বামী-গৃহদ্বারে কাঁটা পড়িল। অরবিন্দের প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন, "প্রায় তিন চার মাস আসিয়াছেন, দাদা দেশে দেশে বেড়াইতেছিলেন, এখন সুন্দরী বৌদিদিকে পাইয়া বলিতেছেন,—আর কখনও বাটী ছাড়িয়া যাইবেন না। বৌদিদিকে তিনি বড় ভালবাসেন আর বৌদিদিও তাঁহাকে তেমনি ভালবাসেন, দুজনে একদণ্ডের জন্য ছাড়াছাড়ি নাই, তুমি যে তাহাকে অজ্ঞান হইয়া দেখিতেছিলে সে কথা বৌদিদি দাদাকে নিশ্চয় বলিয়া দিবেন।" অরবিন্দ নিরুত্তর হইয়া রহিলেন। তিনি ভাবিতেছিলেন এই সুন্দরী আমাকে আকর্ষণ করিতেছে কেন? এই কি রূপের মোহ? এই ভাবিতে ভাবিতে জিতেন্দ্রিয় অরবিন্দ চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। বসন্ত আবার বলিয়া উঠিল—"দেখ, বৌদিদি বলিতেছিলেন তোমাকে ডাকাত মনে করিয়া ভয়ে পাথর হইয়া ছিলেন, চীৎকার করেন নাই, পাছে তুমি গলা টিপিয়া মারিয়া ফেল। আমি না যাইলে তিনি তোমার পা জড়াইয়া পড়িতেন!" অরবিন্দ বুঝিলেন উহা মিথ্যা কথা কিন্তু কেন?—মিথ্যা কথা কেন?

একবিংশ পরিচ্ছেদ

শিশুরা যেমন আকাশে চাঁদ দেখিয়া হাত বাড়াইয়া আয় চাঁদ আয় চাঁদ বলিয়া ডাকে, কমলকুমারীও তেমনি বর্দ্ধমানে স্বামীকে দেখিয়া মনে মনে তাহাকে ডাকিতেন, এইরূপ ডাকিতে ডাকিতে তিনি ক্ষণেকের জন্য হাত বাড়াইয়া চাঁদ পাইয়াছিলেন, যখন তাঁহার চাঁদকে নয়ন ভরিয়া দেখিতেছিলেন তখন তাঁহার মনে একটা কথার উদয় হইল যে, এই তাঁহার সময়, ঐ বারান্দার দ্বার বন্ধ করিয়া স্বামীর পায়ে লুটাইয়া পড়িয়া যদি তাঁহার সকল দুঃখের পরিচয় দেন, তাহা হইলে স্বামী

তাঁহাকে কোনও মতে ত্যাগ করিতে পারিবেন না, কেন না তাঁহার চরিত্রের প্রমাণ ঐ বাটীতে হাতে হাতে আছে, ভবদেব ঘোষাল, বামনদাস, বসন্ত, ক্ষমা প্রমাণ করিবে, কিন্তু তাহা ঘটিল না, বিধাতা বাদ সাধিল। বিধাতা কেন সপত্নী আসিয়া বাদ সাধিল। সপত্নী তাহার কাজ করিল ঠিক—ঐ সময় বসন্ত আসিয়া দাঁড়াইল, সকল আশাভরসা বিলুপ্ত হইল, কমলকুমারী সেই স্থানে প্রস্তরবৎ বসিয়া রহিলেন, অনেকক্ষণের পর ক্ষমা বলিল—"দিদি ঠাকরুণ! কি হবে?" কমলকুমারী ঈষৎ হাসিলেন, সে হাসি গভীর দুঃখের হাসি, অনির্ব্বচনীয় নৈরাশ্যের হাসি। ঐরূপ হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "যাহা হইবার তাহা হইয়াছে আমার অদৃষ্টে যাহা লেখা ছিল, তাহা ঘটিল।" ক্ষমা ইতর লোকের মেয়ে কিন্তু তাহার মুখ হইতে জ্ঞানী লোকের ন্যায় একটা কথা নির্গত হইল, "দিদি ঠাকরুণ! তোমার কি কোনও চেষ্টা নাই, যাহা ঘটিবার তাহা ঘটিবে বলিয়া নিশ্চিন্ত থাকিবে।" কমলকুমারী আবার সেই হাসি হাসিলেন, কোনও উত্তর করিলেন না।

বামনদাস বাবুর মেজাজ বড় খারাপ, সর্ব্বদাই রাগিতেছেন, পরিচারিকা ক্ষমা ও ভগিনী বসন্তের প্রতি তাঁহার রাগের মাত্রাটা বড় বেশী, ক্ষমাকে তাড়াইবেন এই স্থির করিয়াছেন, কিন্তু ভগিনী বসন্তকে কি করিবেন? সে পিতা মাতার বড় আদরের মেয়ে, তাহাকে ধমক পর্য্যন্ত দিতে পারিতেছেন না, কিন্তু একটা ভরসা যে অরবিন্দ আসিয়াছে সে যদি তাহাকে লইয়া যায়, কিন্তু এ বিষয় অরবিন্দের নিকট উত্থাপন করিতে সাহস পাইতেছেন না, কেন না অরবিন্দের নিকট ঘেঁসিতে পারিতেন না। অরবিন্দ দিল্লি দরবারের একজন রাজপুরুষ, তাঁহার চালচলন বড় ভারি, বামন দাস তাঁহার বিশহাত অন্তরে থাকিতেন, এইরূপ অবস্থাতে তিনি কমলকুমারীর দ্বারে দ্বারে ঘুড়িয়া বেড়াইতেন, কখন গলির দ্বারে, কখন বা সিঁড়ির দ্বারে দাঁড়াইতেন, সময় সময় সাহস করিয়া দ্বার ঠেলিতেন, ক্ষমা দ্বার ঠেলার শব্দ শুনিয়াও শুনিত না, কেবল হাসিত, কমলকুমারী ঐ শব্দ শুনিয়া ভ্রূকুঞ্চিত করিতেন, এইরূপ অবস্থাতে সরলা বুদ্ধিহীনা বসন্তকুমারী, অরবিন্দের সহিত কমলকুমারীর সাক্ষাতের কথাটা তাহাকে শুনাইল। আর কমলকুমারী অরবিন্দকে ডাকাত ভাবিয়া ভয়ে অজ্ঞান হইয়া দেখিতেছিল এবং তাহার মাথার কাপড় যে খোলা ছিল এ ঘটনাটিও শুনাইতে ভুলিল না। বামনদাস এই ঘটনা শুনিবামাত্র "কি" বলিয়া চীৎকার করিলেন। যেন গম্‌গমে আগুনে ফুৎকার দিলে ঐ আগুন দপ্‌ করিয়া জ্বলিয়া উঠে, সেইরূপ বামন দাসেরও হইল। বসন্ত দেখিল দাদা বড় রাগিয়াছেন, ভয়ে সে স্থান হইতে পলাইল, আর ভর্ৎসনার ভয়ে ঐ কথা কাহাকেও বলিল না। এতক্ষণে সে বুঝিয়াছিল যে, সে কথাটা বলা ভাল হয় নাই।

বামনদাস প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায় মূর্ত্তি ধরিয়া আপনার মহলে আসিলেন। প্রতিজ্ঞা করিলেন, যে প্রকারে হউক তাহার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করিবেন। এইরূপে স্থির করিয়া কমলকুমারীর সিঁড়ির দ্বারে করাঘাত করিতে লাগিলেন, দুই তিনবার করাঘাতে দ্বারের শিকল খুলিয়া গেল, কিন্তু প্রত্যুৎপন্নমতি কমলকুমারী শিকল খোলার শব্দ শুনিবামাত্র প্রদীপের আলো নির্ব্বাণ করিলেন। তাহার মহল অন্ধকার হইল, কেহ কাহাকে দেখিতে পাইল না। বাহিরে বারান্দায় আসিয়া ক্ষমাকে পশ্চাৎ করিয়া দাঁড়াইয়া তিনি অতি কঠিন স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কে আপনি? এত রাে

দ্বার ভাঙ্গিয়া স্ত্রীলোকের মহলে আসিয়াছেন কেন ?"

বাঁ। আমি তোমার স্বামী বামনদাস।

কম। আমার স্বামীর অন্য নাম, বামনদাস নহে।

বা। তবে তোমার স্বামী কে ?

কম। হিন্দুর মেয়েদের স্বামীর নাম মুখে আনিতে নাই।

বা। তুমি কি দুর্লভরাম চক্রবর্ত্তীর কন্যা জয়াবতী নও ?

কম। না, জয়াবতীর সম্বন্ধে ভগিনী হই।

বা। আমার স্ত্রী জয়াবতী কোথায় ?

কম। এখানে নাই।

বা। কোথায় আছেন ?

কম। খুঁজিয়া নিন।

বা। আপনি এখানে কবে আসিয়াছেন, আমি ত তাহা জানি না।

এই সময় ক্ষমা বলিল, "আপনার স্ত্রী জয়াবতীকে জিজ্ঞাসা করিবেন।" পরে কমলকুমারী বলিল, "অন্ধকার ঘরে স্ত্রীলোকের সহিত কথাবার্ত্তা কহা কি আপনার ন্যায় ভদ্রলোকের উচিত ? যান, ঘরে যান।" এই কথায় বামনদাস আবার জিজ্ঞাসা করিল, "আমার স্ত্রী কোথায় ?" কমলকুমারী বলিল "আপনি খুঁজিয়া নিন।" বামনদাস খুঁজিতে গেলেন, ক্ষমা চুপি চুপি বলিল, "সে যমের বাড়ী গিয়েছে, যাও সেইখানে শিগ্গির শিগ্গির যাও, সেইখানে খোঁজ গে।" কমলকুমারী তাহাকে ধমক দিয়া বলিল, "ওর অপরাধ কি, ওকে গালি দাও কেন।" ক্ষমা বলিল "দিদি ঠাকরুণ! ও মিন্‌সে আমাকে দেখিলে তাড়া করিয়া মারিতে আসে।"

ইতিমধ্যে কমলকুমারী সিঁড়ির দ্বারের শিকল টানিয়া দিয়া তাহার ভিতরে একটা মোটা ও শক্ত কাঠি লাগাইলেন, যাহাতে শিকল আর না খুলিয়া যায়। তৎপরে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "আর বিলম্বে কাজ নাই।" তখন ক্ষমা চকমকী ঠুকিয়া প্রদীপ জালিয়া ও পূর্ব্ব সঙ্কেত মতে জানালা খুলিয়া আলো ধরিল ও তৎক্ষণাৎ উহা নিভাইয়া দিল। কিঞ্চিৎ বিলম্বে উভয়ে দেখিল কে এক ব্যক্তি সাঙ্কেতিক গাছের নিকটস্থ প্রাচীর হইতে নামিতেছে। কমলকুমারী তখন ক্ষমাকে কহিল, "যাও, খিড়কীর দ্বারের নিকট দাঁড়াওগে দ্বারে টোকা মারিলে, নাম জিজ্ঞাসা করিয়া দ্বার খুলিয়া রূপচাঁদকে আমার নিকট লইয়া আসিবে।" ক্ষমা চলিয়া গেল ও কিঞ্চিৎ পরে রূপচাঁদ কমলকুমারীর সম্মুখে উপস্থিত হইল। অনেক দিনের পর উহাকে দেখিয়া কমলকুমারীর চক্ষে জল আসিল, রূপচাঁদ তাহার পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "মা! তুমি এত কষ্ট পাইতেছ, আমাকে জানাও নাই কেন ? আমি যে তোমার বাড়ীর আসে পাশে ঘুরিয়া বেড়াই।" ইহার পর কমলকুমারী রূপচাঁদকে যাহা যাহা করিতে হইবে তৎসম্বন্ধে উপদেশ দিলেন, ও একটা পুঁটুলি তাহার হস্তে দিয়া বলিলেন—"এই পুঁটুলিতে আমার মামার সঞ্চিত ধন আছে, উহা আমাকে তিনি দিয়া গিয়াছেন, উহা তোমার হাতে দিলাম তুমি উহা রাখ।" রূপচাঁদ বলিল, "আমার জীবন দিয়া তোমাকে ও ঐ পুঁটুলীটি রক্ষা করিব। এখন একটা কথা জিজ্ঞাসা করি তুমি কখন পলাইবে ? কেমন করিয়া পলাইবে ? সদর খিড়কিতে পাহারা বসিয়াছে ?"

কমলকুমারী বলিল, "আমি এখনই পলাইব, তুমি এই পুঁটুলি লইয়া পাল্কীর নিকট অপেক্ষা কর গে।" পরে হাসিয়া বলিলেন,—"রূপচাঁদ! সেকালে তুমি ডাকাতের চীৎকার করিয়া আমাদিগকে ভয় দেখাইতে মনে আছে ?"

রূপচাঁদ হাসিয়া বলিল,—"কেন ?"

কমলকুমারী বলিলেন,—"একবার এই বাগানে যাইয়া সেই চীৎকার করিয়া পলাইয়া যাও, এরূপ চীৎকার করিবে যেন সকলে বুঝিতে পারে যে, অনেক ডাকাত খিড়কীর বাগানে আসিয়াছে।"

রূপচাঁদ হাসিল ও পুঁটুলীটি কোমরে বাঁধিয়া চলিয়া গেল। ক্ষমা খিড়কীর দ্বার বন্ধ করিয়া কমলকুমারীর নিকটে দাঁড়াইল।

ইতিমধ্যে খিড়কীর বাগানে একটা ভয়ঙ্কর হুঙ্কার শব্দ হইল, যেন বহুসংখ্যক ডাকাত বাগানে প্রবেশ করিয়া হুঙ্কার করিতেছে। এই হুঙ্কারে ক্ষমা চীৎকার করিয়া কমলকুমারীকে জড়াইয়া ধরিল কিন্তু তিনি যখন বলিলেন, "ও যে রূপচাঁদের হুঙ্কার" তখন ক্ষমা হাসিয়া উঠিল। এদিকে ঐ ভীষণ হুঙ্কারে পৌরজনেরা দ্বার জানালা খুলিয়া পলাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল, "ওরে কি হল রে—ডাকাত পড়েছে রে—কি হবে রে—ওমা কি হবে—কোথা যাব" —স্ত্রীলোকেরা এইরূপ আর্ত্তনাদ করিয়া পলাইবার চেষ্টা করিতেছে। কমলকুমারী স্থির হইয়া জানালার নিকট দাঁড়াইয়া রূপচাঁদের গতি নিরীক্ষণ করিতেছেন, বড় অন্ধকার, কিছুই দেখা যায় না, তথাচ দেখিলেন, রূপচাঁদ প্রাচীরে উঠিয়াছে, পরে যখন সে প্রাচীর পার হইয়া উহার অপর দিকে নামিতে লাগিল, তখন ক্ষমার হাত ধরিয়া গলির দ্বারের নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন, দ্বারের একস্থানে ছিদ্র দ্বারা দেখিলেন, স্ত্রীলোকেরা বসন্তের নবাবিষ্কৃত লুকাইবার স্থান—গোয়াল বাড়ীতে পলাইতেছে, প্রথমে ভবদেব ঘোষাল, পরে দুই জন স্ত্রীলোক বসন্তকে ধরিয়া লইয়া যাইতেছে, তাহার পশ্চাতেই গৃহিণী ও অন্যান্য স্ত্রীলোক, তাহাদের পশ্চাতে বামনদাস যাইতেছে।

বসন্ত সর্ব্বালঙ্কারে ভূষিতা, স্বামীর ঘরে নিদ্রিতা ছিলেন, সেই অবস্থাতে ঝুমুর ঝুমুর শব্দে কাঁপিতে কাঁপিতে যাইতেছেন। বামনদাস পশ্চাৎ হইতে জিজ্ঞাসা করিল,—"বসন্ত তোর বৌদিদি কোথায় ?" উত্তর পাইলেন না, এইরূপ আর একবার জিজ্ঞাসা করিলেন, উত্তর নাই, পরে যখন অতি কঠিন স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন বসন্ত কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—"জা-নি-না।"

বামনদাস বলিল,—"দূর্—হ পোড়ামুখী।" এই সময় কে একজন বলিল তিনি আমাদের আগে গিয়া গোয়ালবাড়ীতে লুকাইয়াছেন। বামনদাস নিশ্চিন্ত হইলেন। ইতিমধ্যে গলির ভিতর মশাল জ্বালিয়া দ্বাররক্ষকেরা সশস্ত্রে আসিতে লাগিল, তাহার মধ্যে ১০ জন ভাড়াটিয়া লাঠিয়াল ছিল, সর্ব্বাগ্রে অরবিন্দ—মল্লবেশে বাম হস্তে ঢাল—দক্ষিণ হস্তে একটা বর্ষা লইয়া বাগানের ভিতর যাইতে লাগিলেন, তাহাকে দেখিয়া কমলকুমারী বড় কুণ্ঠিতা হইলেন, মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, তিনি কি পাপিষ্ঠা, একটা মিথ্যা হুজুগ তুলিয়া স্বামীকে এত কষ্ট দিতেছেন! কিন্তু কি করেন এই ভিন্ন বাটী হইতে পলাইবার, আর অন্য উপায় ছিল না। পরে প্রহরীগণ বাগানে প্রবেশ করিলে, কমলকুমারী ক্ষমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "চাকরেরা কোথায়? তাহারাও কি বাগানে গিয়াছে ?" উত্তরে ক্ষমা বলিল, "হ্যাঁ তাহারাও লাঠি হাতে করিয়া প্রহরীদের সঙ্গে গিয়াছে।" তখন কমলকুমারী দ্বার খুলিয়া গলির মধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিল, "বাগানের দ্বার বন্ধ কর, প্রহরীরা যেন কেহ বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিতে না পারে।" তৎপরে উভয়ে দ্রুতপদে সদর বাটীতে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, জনমানব নাই, চারিদিক অন্ধকার, সদর দরজা বন্ধ। ক্ষমা নিঃশব্দে উহা খুলিল, দুইজন নিঃশব্দে বাহির হইয়া

সদর রাস্তায় আসিলেন ও দ্রুতপদে যে স্থানে পাল্কী রাখিবার কথা ছিল সেই স্থানে পৌছিলেন।

কমলকুমারী পাল্কীতে উঠিলেন, রূপচাঁদ পুঁটুলিটি উহার ভিতর রাখিয়া পাল্কীর দ্বার বন্ধ করিলে, বাহকেরা পাল্কী উঠাইল। অল্পক্ষণ পরে রূপচাঁদের আদেশ মতে একস্থানে পাল্কী থামিল, তৎপরে বাহকগণের বিদায় দিয়া তাহারা তিনজনে দ্রুতপদে কিছু দূরে যাইয়া একটী নিভৃত গলির মধ্যে প্রবেশ করিল। প্রায় পাঁচ ছয়টি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র একতালা বাড়ী পার হইয়া এইরূপ একটি বাটীর একটা জানালাতে ক্ষমা করাঘাত করিল। ঐ শব্দে ভিতর হইতে একজন স্ত্রীলোক বলিল, "তোমরা আসিয়াছ গা?" ক্ষমা চুপি চুপি বলিল, "হ্যাঁ গো!" তৎপর সেই স্ত্রীলোক আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিল, কমলকুমারী ও ক্ষমা ভিতরে প্রবেশ করিল, রূপচাঁদ তাহার বাসস্থানে চলিয়া গেল কিন্তু ঘুমাইল না, আর একখানা পাল্কীর বন্দোবস্ত করিতে গেল।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

বাড়ীওয়ালী দ্বার বন্ধ করিল, তাহার বিধবা কন্যা কমলকুমারী ও ক্ষমাকে নির্দ্দিষ্ট কক্ষে লইয়া যাইয়া আলো জ্বালিল। মাতা ও কন্যা কমলকুমারীকে নিমেষশূন্য চক্ষে দেখিতে লাগিল। কিছুক্ষণ এইরূপ দেখিয়া উহারা বুঝিতে পারিল যে, কমলকুমারী বড় ইহাতে লজ্জিতা বা বিরক্তা হইয়াছেন। কেন না তিনি মাথার কাপড় টানিয়া একেবারে মুখাবরণ করিলেন। গৃহিণী বড় অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "মা! আহারাদি হইয়াছে ত?" ক্ষমা বলিল, "হাঁ হইয়াছে।" পরে জিজ্ঞাসা করিল, "বিছানা সঙ্গে নাই বুঝি?"

ক্ষমা। না, কাল সে সব আসিবে।

গৃ। আজিকার জন্য আমি বিছানা দিতেছি, আমার গদী তোষক নাই, কেবল মাদুর আছে।

এই কথা শুনিবামাত্র তাহার কন্যা দুইটা মাদুর ও একটা বালিশ আনিয়া, যেটি সরু কাঠীর মাদুর উহা তক্তাপোষে বিছাইয়া দিয়া তাহার উপর বালিশটি রাখিল, আর একটা মাদুর ক্ষমার হাতে দিয়া মাতা ও কন্যা চলিয়া গেল। ক্ষমা দ্বার বন্ধ করিল। দুইজনে শয়নের উদ্যোগ করিল। ক্ষমা জিজ্ঞাসা করিল "দিদিঠাকরুণ! তোমার পিসীর বাড়ীতে না গিয়া এ ভাড়াটে বাড়ীতে এলে কেন?"

কমল। এত রাত্রে পিসীর বাড়ী গেলে পিসে ও পিসীকে অনেক কথা বুঝাইতে হইত। হয় ত তাঁহাদের মনে নানা প্রকার সন্দেহ হইত। তাঁহারা ছেলেবেলায় আমাকে দেখিয়াছেন, তাহার পর ত আর দেখেন নাই।

ক্ষমা। ঠিক করেছ, তবে পিসীর বাড়ীতে কখন যাইবে?

কমল। সূর্য্যোদয় হইলে যাইব, যাইবার আগে তুমি বাড়ীওয়ালীকে উঠাইয়া এই ঘরের একমাসে ভাড়া ৫৲ পাঁচ টাকা দিয়া আসিবে।

ক্ষমা। ও মা! একরাত্রি বাস করিয়া এক মাসের ভাড়া দেবে, সে কি কথা!

কমল। আমি যা বলি তুমি তাই কর।

ক্ষমা। আচ্ছা তাই করিব। আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—বাটীতে ডাকাত পড়ার হাঙ্গামা করিয়া, রূপচাঁদকে ডাকাত সাজাইয়া একটা হুজুগ তুলিয়া পলাইয়া আসিলে কেন?

কমল। তোমার ও বসন্তের জন্য। তোমরা দুই জনে ডাকাতের হুজুগ তুলিলে, সদর খিড়কীতে পাহাড়া বসিল, এখন পলাই কেমন করিয়া? তাই রূপচাঁদকে ডাকাত সাজাইলাম। খিড়কীর দিকে

ডাকাত পড়িয়াছে ভাবিয়া প্রহরীরা সদর মহল ছাড়িয়া খিড়কীতে আসিল। তাই আমরা পলাইতে পারিলাম।

ক্ষমা। আমি তখন এত কথা বুঝিতে পারি নাই, যাহা হউক বেশ করিয়াছ।

এইরূপ কথোপকথনের পর ক্ষমা ঘুমাইয়া পড়িল। কমলকুমারীর নিদ্রা আসিল না। প্রভাত হইল, তিনি ক্ষমাকে উঠাইয়া বলিলেন, "যাও ভাড়া দেওগে, বলিয়া আসিও আমরা চলিলাম।" ক্ষমা বলিল,—"যদি জিজ্ঞাসা করে—কেন এক রাত্র থাকিয়া চলিয়া যাইতেছ, তখন কি বলিব।"

কমল। তোমার যাহা ইচ্ছা হয় তাই বলিও।

ক্ষমা। আচ্ছা।

ক্ষমা যাইয়া গৃহিণীর ঘরের দ্বারে করাঘাত করিল। গৃহিণী ও তাহার কন্যা বাহিরে আসিল। গৃহিণীর হাতে ক্ষমা পাঁচটি টাকা দিয়া বলিল, "এই আপনার ঘরের ভাড়া নিন—আমরা চলিলাম।" গৃহিণী ও তাহার কন্যা চমকিয়া উঠিল। গৃহিণী বলিল—"কেন গা! চলিলে কেন?"

ক্ষমা। ঐ ঘরে বাস করা বড় সুবিধা হইল না।

গৃ। কেন, কেন গা?

ক্ষমা। সে কথায় কাজ নাই মা!

গৃ। কেন কি হইয়াছে?

ক্ষমা। সে শুনে কাজ নাই মা! সে শুনে কাজ নাই।

গৃহিণীর কন্যা বলিল—"ঘরে বুঝি বড় মশা, তোমাদের মশারি না থাকে আমরা একটা দেবো।"

ক্ষমা। না দিদি সে সব নয়।

গৃ। তবে কি?

ক্ষমা। মা! সমস্ত রাত আমরা ঘুমাইতে পাই নাই।

গৃ। কেন গা? কেন ঘুমাও নাই গা?

ক্ষমা। মা! এক রাত্রের জন্য বাস করিয়া একটা কথা বলিয়া যাইব, তোমরা মায়ে ঝিয়ে চিরকাল আমাকে গালি দিবে।

গৃ। না বাছা আমরা সে লোক নই, আমরা কোনও কথা শুনিতে চাই না।

ক্ষমা। আমরা এখন চল্লুম।

গৃ। দাঁড়াও, এক রাত্র বাস ক'রে এক মাসের ভাড়া দেও কেন?

ক্ষমা। আমার দিদিঠাকরুণ উহা দিতে বলিলেন।

গৃ। আমি লইব না।

এই কথা শুনিবা মাত্র ক্ষমা পলাইয়া গেল। গৃহিণী ও তাহার কন্যা অতিশয় বিস্মিতা ও ক্রুদ্ধা হইয়া সেইস্থানে দাঁড়াইয়া রহিল। গৃহিণীর কন্যা বলিল,—'মা! ওরা কে?'

গৃ। কিছুই জানি না।

কন্যা। মা ঐ মেয়েটির কি আশ্চর্য্য রূপ? এমন রূপ ত কখনও দেখি নাই।

গৃ। না, আমিও কখন দেখি নাই।

কন্যা। বোধ হয় কোনও ধনবানের কন্যা কি বধূ পলাইয়া যাইতেছে।

গৃহিণী কোনও উত্তর করিলেন না।

ক্ষমা ও কমলকুমারী দুইজনে খিড়কীর দ্বার খুলিয়া বাহিরে আসিলেন। দেখিলেন কিঞ্চিৎ দূরে রূপচাঁদ একখানা পাল্কীর নিকট দাঁড়াইয়া আছে। কমলকুমারী পাল্কীতে উঠিয়া পিসীর বাড়ীতে চলিলেন। (ক্রমশঃ)

গল্প

ভুলের ব্যথা

শ্রীমতী নির্ম্মলা দেবী

পাটনা মহকুমার ভারপ্রাপ্ত হাকিম পলাশ চৌধুরী সহরের বাহিরে মনোমত বাঙলোটী সরকার হইতে পাইয়া তাঁহার বহু দিনের সাধ পূরাইতে চেষ্টিত হইলেন বটে কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা শীঘ্র ঘটিয়া উঠিল না। নূতন কার্য্যভার প্রাপ্ত হাকিমের পক্ষে ছুটীর আশা দুরাশা; তাহার উপর আবার শ্যালক-প্রবর স্বরীতচন্দ্র পত্রোত্তরে জানাইয়া দিলেন যে, বড়দিনের ছুটীর পূর্ব্বে ভগিনী আরাধনাকে পৌঁছাইয়া দিতে তিনি পারিবেন না। সুতরাং পলাশকে গৃহলক্ষ্মীর জন্য এখনও ছয় সাত মাস ধৈর্য্য ধরিয়া থাকিতে হইবে। পলাশ এই ভাবিয়া আশাভঙ্গের দীর্ঘশ্বাস ছাড়িলেন।

তার পর অনেক দিন কাটিয়া গেল—শেষে একদিন পত্নী আরাধনা স্বামীর বাঙলোয় পদার্পণ করিলেন। দীর্ঘ বিরহের পর মিলন আসিল। অবাধ আনন্দে কপোত-কপোতী সম কখনও বাঙলোর ঢাকা বারান্দায়, কখনও মোটর-ভ্রমণে কখনও ভিতরের দালানে ইজিচেয়ারে পাশাপাশি বসিয়া, কখনও সতরঞ্চ বিছাইয়া জানালার ধারে মুখোমুখী বসিয়া জোৎস্নায় চাঁদের খেলা দেখিয়া সুখস্বপ্নের ভিতর দিয়া মাস দুই কেমন করিয়া কাটিয়া গেল, বিভোর দম্পতি তাহা জানিতেও পারিল না।

বেহারের দারুণ শীত কিছু কমিয়া আসিল, বসন্তের আভাসে নবীন হৃদয় দুটী পুলকে চঞ্চল হইয়া উঠিল, দুইজন পরস্পরকে এক মুহূর্ত্তও ছাড়িতে না চাহিলেও পলাশকে কার্য্যগতিকে নানা স্থানে ঘুরিতে হইত। স্বামী যতক্ষণ বাহিরে থাকিতেন আরাধনার কিছুই ভাল লাগিত না। প্রথম প্রথম সে ম্রিয়মাণ হইয়া স্বামীর আগমনাশায় উন্মুখ-চিত্ত হইয়া ঘর-বাহির করিতে থাকিত। যতক্ষণ না পরিচিত হর্ণ বাজাইয়া গাড়ীখানি ফটকের মধ্যে প্রবেশ করিত ততক্ষণ তাহার আর স্বস্তি থাকিত না। ক্রমশঃ সহিয়া গেল, স্বামীর অনুপস্থিতি কালে মন শান্ত করিতে আরাধনা গৃহিণীর কর্ত্তব্য কাজ-কর্ম্মাদিতে মনঃসংযোগ করিল, ও অবসর কালে বাঙলো-সংলগ্ন পশ্চাতের বাগানে খিড়কী দিয়া উপস্থিত হইত।

হিন্দুস্থানী দাই মনিয়ার মার সঙ্গে কথাবার্ত্তায় তেমন সুবিধা করিতে না পারিয়া স্বামীর জন্য অন্তরে বাহিরে ছটফট করিতে করিতে বাগানটীতে আসিয়া এদিক ওদিক ঘুরিয়া আরাধনা কতক শান্তি পাইত। বাঙলোর পিছনে বাগানের শেষ সীমানা রেলিংয়ে ঘেরা। আরাধনা প্রায়ই উদ্যানের শেষাংশে নির্জ্জন দেখিয়া ভ্রমণ করিতে ভালবাসিত। সেদিনও সে বেড়াইতে বেড়াইতে রেলিং ধরিয়া বাগানের ওধারে শ্যামল প্রান্তরের দিকে চাহিতেই দেখিল, ঐ অদূরে কাহার কুটীর, আরও দূরে নীচু জমির ওধারে, সবুজ ঘাসের উপর রূপালী সরু খালের জল চক্ চক্ করিতেছে। বর্ষার সঞ্চিত জলও হইতে পারে, তবে সে জল এ বসন্তকাল পর্য্যন্ত থাকিত কি? ঐ যে খালের ওধারে দুতিন খানি খাপরার চাল দেখা যায়, দুই তিনটী আম লীচুর গাছ, চারিদিকে ধূ ধূ খোলা মাঠের মধ্যে ঐ ক্ষুদ্র বসতিটুকু আরাধনার কৌতুহল বৃদ্ধি করিল। ঐ না, এই যে তাল বেল বৃক্ষের আড়াল দিয়া দেখা যাইতেছে, একটী টীনের চালের নীচে দুই তিনটী হৃষ্টপুষ্ট গাভী, পরম আরামে বিচালী চিবাইতেছে।—তাই ত এ কয়দিন ত দেখি নাই!

আজ পলাশ মফঃস্বলে, তাঁহাকে কার্য্যানুরোধে সেইখানেই কাটাইতে হইবে, আরাধনার কিছুই ভাল লাগিতেছে না। আজ তাহার যত্নরচিত কবরী শিথিল; প্রসাধন, সজ্জা মিথ্যা মনে হইতে ছিল। তাই সমস্ত দুপুরটা বিরক্ত-তিক্ত-চিত্তে শয্যায় পড়িয়া পড়িয়া তাহার ভাল লাগে নাই। শান্তির আশায় অপরাহ্নে উদ্যানের এই নির্জ্জন অংশে দাঁড়াইয়াছিল। সন্ধ্যা হয় হয় দেখিয়া মিশিরজী আসিয়া দাঁড়াইল। বিরক্তভাবে তাহার দিকে চাহিয়া আরাধনা বলিল,—"ঠাকুর আজ আমি কিছু খাবো না।"

মিশিরজী সবিনয়ে জানাইল,—"রসুই ক্যা বাস্তে মাইজি।"

বাধা দিয়া আরাধনা চাবির গোছাটা অঞ্চল-মুক্ত করিয়া ছুড়িয়া ফেলিল। বিস্মিত মিশির কথা কহিবার পূর্ব্বেই, আরাধনা বলিয়া উঠিল,—"মহারাজ তোমাদের জন্যে যা হয় করো, আজ আমার খেতে ইচ্ছে নেই।'

"ক্যা মাইজী দু চারটো পুরী?"

"না, না, আমার শরীরটা আজ ভাল নেই।"

মনিয়ার মা ঘরের মেঝেয় পা ছড়াইয়া বুঝাইতে প্রবৃত্ত হইল,—কেয়া মাইজী বাবু ত সোবেরমে জরুর আয়ে গা। আরাধনা দুর্ব্বোধ্য হিন্দী কথার অর্থ কতক বুঝিলেও সে ভাষা এখনও আয়ত্ত করিতে পারে নাই, কাজেই তাহার বকবকানি অর্দ্ধেক না বুঝিয়াই শুনিবার ধৈর্য্য হারাইয়া একেবারে রেলিংয়ের উপর ঝুঁকিয়া পড়িল। সেখানে দাঁড়াইতেই আজ লক্ষ্য করিল,—ঐ কুটীর হইতে একটী রমণী এই দিকেই আসিতেছে। সে কৌতূহলী হইয়া নিম্নে চাহিয়া রহিল। এক উজ্জ্বল শ্যামাঙ্গী সুশ্রী তরুণী থানকতক পিতল কাঁসার বাসন লইয়া নিকটেই স্বল্পজল খালের ধারে আসিয়া বসিয়া ক্ষিপ্রহস্তে মাজিতে আরম্ভ করিল। তাহাকে দেখিলে নেহাৎ নীচ জাতীয়া মনে হয় না। তাই ত বাঙালী বলিয়াই মনে হইতেছে। সরু কালপাড় সাড়ী, হাতে দুই গাছি সরু সোনার রুলি, চেহারায় অপূর্ব্ব কমনীয়তা। আরাধনা কিছুক্ষণ চাহিয়া ধীরে জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁ ভাই ঐ বুঝি তোমাদের বাড়ী? তোমরা ত বাঙালী দেখছি?" চম্‌কিয়া মেয়েটী মুখ ফিরাইয়া পরক্ষণেই উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার সুন্দর মুখের আয়ত লোচনের বিশাল চাহনি—আরাধনা মুগ্ধ হইল। চক্ষু দুটী পরম সুন্দর, আবেশে ঢল ঢল, কিন্তু! ওকি দেখিতে দেখিতে সেই উজ্জ্বল চক্ষে কি ঘৃণাপূর্ণ চাহনি দেখা দিল। যেন তাহাতে ক্রোধ, ঘৃণা, অবিশ্বাস, মূর্ত্তিমানরূপে প্রকট হইতে লাগিল। আরাধনা গভীর বিস্ময়ে কি যেন অপরাধে থতমত খাইয়া চুপ করিয়া অবাঙ্‌মুখে দাঁড়াই। রহিল, কিন্তু সে নিমেষমাত্র—নিমেষ মাত্র জ্বলন্তচক্ষে চাহিয়া সে মাথার কাপড় ঈষৎ টানিয়া দিয়া কসিয়া ত্বরিতহস্তে বসনগুলি প্রক্ষালন করিয়া দৃঢ়পদে কুটীরাভিমুখে চলিয়া গেল, একবারও ফিরিয়া চাহিল না।

আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য! কে এ তরুণী? বিস্মিত আরাধনা সে স্থান ত্যাগ করিল। উদ্যান আর তাহার ভাল লাগিল না, একেবারে শয়নগৃহে উপস্থিত হইয়া শিথিলভাবে বিছানায় এলাইয়া পড়িল। একটা বিস্ময়, একটা কৌতূহল, তাহাকে যেন আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। সে শুইয়া শুইয়া ভাবিতে লাগিল, এ পাশ ও পাশ করিয়া বিদ্রোহী মেয়েটার কথা ভুলিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু যতই চেষ্টা করে, ততই তাহার সুগঠিত দেহলতা, বঙ্কিম ভ্রূযুগলের অপূর্ব্ব গঠন, সর্ব্বাপেক্ষা তাহার অদ্ভুত দৃষ্টি মনে পড়ে। সে কিছুতেই স্থির হইতে পারিল

না। কে এই তরুণী? কেন? কেন তাহার এ ক্রূর দৃষ্টি? তাহার স্মৃতির তলদেশ অন্বেষণ করিয়া ইঁহার মূর্ত্তি মনে করিতে চেষ্টা করিল।—না, না, কস্মিনকালেও যাহাকে চক্ষে দেখি নাই তাহার অমন ঘৃণার পাত্রী আমি হইলাম কিসে? ভাবিয়া বিরক্ত হইয়া তাহাকে ভুলিবার চেষ্টা করিল, তাহার শিক্ষিত মনকে নানা যুক্তিতর্ক দিয়া প্রবোধ দিতে চেষ্টা করিল,—হউক না কেন সে সেই, তাহার কি? তাহারই বা এত মাথা ব্যথা কেন? দূর হউক ওদিকে আর না যাইলেই হইবে? কিন্তু ঘুরিয়া ফিরিয়া ঐ কথাই ভূতের মত তাহাকে পাইয়া বসিল। অধৈর্য্য হইয়া ধড়ফড করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া ডাকিল—'মনিয়াব মা।'

মনিয়ার মা তখন হলের একপার্শ্বে মলিন চাদরে আগাগোড়া চাপা দিয়া আরামে নিদ্রাসুখ অনুভব করিতেছিল। মনিবের আহ্বানে চক্ষু কচলাইতে কচলাইতে উঠিয়া আসিয়া বলিল, "কেয়া মাইজী?"

উৎসুকচিত্তে আধা হিন্দী, আধা বাঙ্গালায় আরাধনা বাগানের পশ্চাতের প্রতিবাসীর পরিচয় লইবার চেষ্টা করিল।

মনিয়ার মা তাহার স্বভাবমত নানা ভূমিকা করিয়া অনর্গল যাহা বকিয়া গেল, তাহার মর্ম্ম তাহার দেশ ভাগলপুর জেলায়। কি করিয়া তাহার ভ্রাতার সহিত এ দেশে নোকরী করিতে আসিয়াছে, মাইজীর মত সেও পাটনা মুলুকে নূতন আসিয়াছে, মাত্র চারিমাস পূর্ব্বে, আসিয়া এই হাকিম বাবুর বাটীতেই লাগিয়াছে। উহাদের বড় চেনে না। তবে লোকমুখে শুনিয়াছে, ঐ মেয়ের নাম চন্দনা। উহারা খারাপ লোক, উহাদের সঙ্গে মাইজী যেন কথা না কন। মেয়েটীর কবে সাদী হইয়াছিল কি না জানা যায় না। আদমী ত নাই-ই, উপরন্তু মেয়েটি অন্তঃসত্ত্বা, শুনিয়াছি, কোনও বড় লোক বাবুর নিকট ছিল ইত্যাদি।

ওঃ তাহাকে দেখিয়া অন্তঃসত্ত্বা মনে হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাকে দেখিলে ত সাধারণ বারনারী বলিয়া বোধ হয় না। তাহাদের ভিতরে অত তেজস্বিতা দেখা যায় কি? আচ্ছা তাই যেন হইল। আমার উপর ক্রোধের হেতু কি? দূর হউক ছাই মিথ্যা ভাবিয়া মরিই বা কেন? একি আজ সমস্ত রাত্রিই কি ঐ কথা ভাবিব? উন্মনা আরাধনা কোন কার্য্যেই নিবিষ্ট হইতে পারিল না। কেবল এক রকম নূতন অস্বস্তি ভোগ করিতে লাগিল। জোর করিয়া চিন্তার গতি ফিরাইতে চেষ্টা করিল। তাহার প্রিয়ের কথা মনের ভিতর আনিয়া ফেলিল। তিনি, —তিনি আসিলে বাঁচিয়া যাই, এ অবাস্তব মিথ্যা চিন্তার হাত এড়াই। অ: আজই ভোরে কি তিনি গিয়াছেন,—না, না যেন, কত দিন! এখনও পূর্ণ একদিন, সেই কাল বৈকালে আসিবার কথা—আঃ এ কাঁটা ফোটার যন্ত্রণা যেন ভোগ করিতে পারিতেছি না। ওগো এসো। ওগো আমার সর্ব্বস্ব—আমার পথহারা অন্ধকারের আলো, তুমি এসো।

২

আরাধ্যা—আরাধ্যা—স্বামী তাহার বহু আপত্তি সত্ত্বেও ঐ নামেই প্রায় ডাকিতেন। স্মিতমুখে আরাধনা বারান্দায় বাহির হইয়া দাঁড়াইতেই পলাশ সর্ব্বসমক্ষে ব্যাকুল বাহু বাড়াইয়া পত্নীর উভয় হস্ত চাপিয়া সাগ্রহে মুখপানে চাহিল। লজ্জিত তরুণী তাড়াতাড়ি হাত ছাড়াইয়া আগে আগে হল ঘরে গিয়া দাঁড়াইল। হাসিমুখে এসো বলিয়া চেয়ারখানি দেখাইতেই সাহেবী পোষাকেই ধুপ্ করিয়া পলাশ বসিয়া পড়িল! তাহার পর দুই হাতে পত্নীকে টানিতেই সে লজ্জিত হইয়া মৃদুস্বরে বলিয়া উঠিল, "কি যে কর! ঠাকুর, চাকর, দাই সবাই রয়েচে!"

পলাশ পত্নীর হাত দুটী ছাড়িয়া দিয়া বলিল,—"তোমায় রোগা দেখচি কেন আরা ?" "কি যে বল ! মোটে ত কাল সকালে গেলে ? আর আজ-কেই রোগা হয়ে গেলাম !" ইতিমধ্যে ঝি, চাকর আসিয়া দাঁড়াইল। আরাধনা ক্ষিপ্র-পদে বাহির হইয়া মনিয়ার মাকে ডাকিয়া বাবুর মুখ ধুইবার জল, সাবান, তোয়ালে ইত্যাদি বার্থরুমে ঠিক আছে কি না দেখিতে বলিল। তারপর জলখাবারের জন্য রান্নাঘরের দিকে চলিল। রাত্রির জন্য রন্ধনের ব্যবস্থা করিয়া স্বামীর জন্য স্বহস্তে প্রস্তুত কচুরী, মোহনপুরী, পানতুয়া প্রভৃতি সযত্নে সাজাইয়া হলঘরে উপস্থিত হইয়া টেবিলের উপর রাখিল। হাত-মুখ ধুইয়া পলাশ সেখানে আসিয়া দাঁড়াইতেই আরাধনা তাহাকে বলিল,—"আগে একটু জলযোগ কর, তার পর কোথায় গিয়েছিলে সেখানকার কথা শুনব।"

পলাশ বলিল,—"আরা, এত ক'রে সেবা করলে, কিন্তু আসল কাজই যে এখনো বাকী ! কি বলো দেখি ?"

লজ্জাজড়িত মৃদুকণ্ঠে সে বলিল,—"কি ?" "আঃ তোমার গান ! একবার তোমার সুধাকণ্ঠে গান শুনিয়ে দাও !"

আরাধনা প্রথমে মৃদু আপত্তি করিল কিন্তু নিষ্কৃতি না পাইয়া তাহাকে গান গাহিতে হইল। সে স্বামী-সৌভাগ্যের গর্ব্বে উচ্ছ্বসিত হইয়া গাহিল—"নীল আকাশের অসীম ছেয়ে ছড়িয়ে গেছে চাঁদের আলো।" তখনও শীতের আমেজ বেশ আছে, তবু সম্মুখের জানালা মুক্ত থাকায় ত্রয়োদশীর স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না তাহার মুখে আসিয়া পড়িতেছে। মুগ্ধ পলাশ তন্ময় হইয়া দয়িতার ক্ষীণ দেহলতার অপরূপ সৌন্দর্য্য ও তাহার চম্পক অঙ্গুলীর লীলায়িত গতি দেখিতেছিল। তাহার সুগৌর তনু বেষ্টিয়া জাফ্‌রাণ রঙের সাড়ী ও হাফ্‌হাতা জ্যাকেট, হীরকখচিত কর্ণাভরণ অল্প অল্প দোলা পাইয়া ঝিক্ মিক্ করিতেছে। মুখের উপর জ্যোৎস্না পড়িয়া এক স্বপ্নময় সৌন্দর্য্য সৃষ্টি

পলাশ একদৃষ্টিতে সেই মুখপানে চাহিয়া রহিয়াছে।

দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ী ।

করিয়াছে। পলাশ একদৃষ্টিতে সেই মুখপানে চাহিয়া রহিয়াছে। গানটী শেষ হইতেই আরাধনা চেয়ারে ক্ষীণ তনু এলাইয়া দিল। পলাশ বলিল,—"দেখ, সরস্বতীর হাতে বিদেশী বাজনা কেমন খাপছাড়া দেখায়।"

মাথা দুলাইয়া আবদারের স্বরে আরাধনা বলিল,—"না, বীণ্ বাজাতে এখন আমি আর পারি না।" অবশেষে পলাশের অনুরোধের আতিশয্যে তাহার হার হইল। তাহাকে বীণ বাজাইয়া আবার গাহিতে হইল।—"ওগো আজি মম গৃহে মিলনোৎসব রাতি।"

কিন্তু মনিয়ার মা আসিয়া যখন বলিল,—মহারাজ রান্না করে বসে রয়েছে তখন মিলনোৎসব বাধ্য হইয়াই শেষ হইল।

পরদিন যতক্ষণ না স্বামী বাটীর বাহির হইল, আরাধনা আনন্দের প্রাচুর্য্যে তাহার নূতন অস্বস্তির কথা ভুলিয়াই ছিল। স্বামী কাছারীতে চলিয়া যাইবার পর খাওয়া-দাওয়া শেষ করিয়া আরাধনা একখানি বই খুলিয়া শয্যায় অঙ্গ ঢালিয়া দিল। কিন্তু দুএক পাতা পড়িবার পর সেদিনকার সেই বিদ্রোহী মেয়েটার কথা মনে পড়িয়া গেল। কিছুতেই তাহার স্মৃতির হাত এড়াইতে না পারিয়া আরাধনা নিদ্রার চেষ্টা করিল। কিন্তু ঘুম হইল না। খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিবার পর ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখিল, চারিটা বাজে। তখন সে ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া পড়িল। তার পর গা ধুইয়া কাপড়-চোপড় বদলাইয়া কিসের আকর্ষণে আরাধনা বাগানের উপস্থিত হইল এবং সেই পশ্চাতের রেলিংয়ের ধারে পৌছিতেই দেখিতে পাইল একটী স্থূলা অর্দ্ধবয়স্কা রমণী গরুর দড়ি ধরিয়া এদিকে আসিতেছে। না, এ ত সে মেয়েটী নয়? বয়স্কা রমণী অগ্রসর হইয়া রেলিংয়ের ধারেই একটী খোঁটায় গরুর দড়িটা বাঁধিতে উদ্যত হইল। হঠাৎ উপর দিকে তাহার দৃষ্টি পতিত হইতেই সে থম্‌কিয়া দাঁড়াইল। আরাধনা দেখিল, রমণীর মুখখানিতে পূর্ব্বদৃষ্টা তরুণীর সাদৃশ্য; পরণে আধ ময়লা থান, তবে বয়স্থা স্থূলদেহা বলিয়া মুখখানি ভারী দেখাইতেছে। আরাধনা সেদিনকার ঘটনা স্মরণ করিয়া কথা কহিবার জন্য ব্যস্ত হইল না। কিন্তু রমণীর মুখে ক্রোধ বা ঘৃণার চিহ্ন দেখা গেল না; বরঞ্চ তাহার আয়ত লোচনে সরলতা মাখানো। সে ক্ষণেক আরাধনার দিকে বিস্ময়ে চাহিয়া দড়ি হাতেই রেলিংয়ের ধার ঘেঁসিয়া উচু জমির উপর উঠিয়া সভয়ে কুটীরের দিকে চাহিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"আপনি হাকিম বাবুর কে?" আরাধনা মৃদু হাস্যে চুপ করিয়াই রহিল।" "ওঃ পরিবার বুঝি?" এবার ঘাড় কাত করিয়া সে সায় দিল।

রমণী আরও নিকটে আসিয়া কণ্ঠস্বর নামাইয়া বলিয়া উঠিল—"এই কয়েদ হয়ে থাকা আর কি মা! যে মেয়ে—যেন সেপাই।"

এবার আরাধনা থাকিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন? তোমার মেয়ে কোথায়?"

হাত বাড়াইয়া কুটীরের দিকে তাকাইয়া বলিল, —"ঐ হোতা! তা কথা কহার কি যো আছে মা! এখুনি জান্‌তে পারলে কুরুক্ষেত্তর বাধিয়ে তুলবে! এই আমায় কি বাড়া থেকে বেরুতেই দেয়! কথা না কয়ে যেন হাঁপিয়ে পেট ফুলে মরি। এই ঘর নিকুচ্চে দেখে এসেছি, গরু বাঁধবার নাম ক'রে মা, তবে বার হয়েছি! যাই আবার।"

কিন্তু যাই বলিয়াও কোন উত্তর না পাইয়া আবার সে বলিয়াই চলিল, "তা বাঙালী বাড়ী দুধ দিতে যেতাম, তবু দু' দণ্ড কথা ক'য়ে সুখ ছিল। পোড়া মেয়ে তাও ছাড়িয়ে দিলে। এখন ঐ দু'ঘর

মাড়োয়ারীর বাড়ী দুধ যোগাতে হয়।" আরাধনা মৃদুস্বরে বলিল, "কেন ?"

"ওঃ মা সে অনেক কথা। আমার দুঃখের কাহিনী তা তোমায় ওঃ আপুনাকে বলবোই বা কি! আপুনি ত হাকিম বাবুরই ইস্ত্রির।"

আরাধনা সবিস্ময়ে বলিয়া ফেলিল, "তাতে কি ?"

"ওমা, তা হলে মেয়ে কি রক্ষে রাখবে! মেয়ে আমার নেকাপড়া জানে কি না, তাতেই বুঝলে না মা তাকে ভয় করতে ত হয়।

শুনিয়া আরাধনার অত্যন্ত হাসি পাইল। মনে মনে ভাবিল, মেয়ে লেখাপড়া জানে কাজেই ভয়। ওঃ সেদিনকার সেই মেয়ের মা এই! তা ভয় করবার মেয়ে বটে!"

"চল্লাম মা আপুনি হাকিম বাবুকে কিছু বোলো না,—যা হবার গরীবেরই হয়েচে!—বড় লোক গরীবের কথা। তাতে আবার আপনার সঙ্গে দেখ করেছি, শুন্‌লে চটে যাবেন। চাই কি আমাদের এখান থেকে উঠিয়েও দিতে পারেন। ঐ বুঝি চম্পনা ডাকছে, যাই। (সভয়ে) ঐ—আস্‌বে না কি!"

আরাধনা তখন বিস্ময়ে যেন হতবুদ্ধি হইল! শেষের কথাগুলি তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল কি না সন্দেহ। শুধু পুত্তলিকার মত সে চাহিয়াই রহিল। অবশেষে রমণী উঁচু জমি হইতে নিম্নে অবতরণ করিতেই তাহার চমক হইল। হঠাৎ সে ব্যাকুল হইয়া ঝুঁকিয়া বলিয়া উঠিল, "তুমি আমাদের বাড়া একবার আসবে ?"

যাইতে উদ্যতা রমণী কি ভাবিয়া বলিল, "বাড়ী, তা আচ্ছা! ঐ চম্পনাকে লুকিয়ে যাব। যখন দুধ দিতে ও বাড়ী যাব সেই সময় যাব।" এই বলিয়া খোঁটায় গাভীটী বাঁধিতে লাগিল।

আরাধনার মনে গভীর সন্দেহের সঞ্চার হইল। সে ভাবিতে লাগিল,—রমণী কি বলিয়া গেল। হাকিম বাবুকে বোলো না, আমার সহিত রমণীর সাক্ষাতের সঙ্গে স্বামীরই বা সম্পর্ক কি ? এ রমণী কি বলিতে চায় ? হায়! হায়! সেই বিদ্রোহী তরুণী আর তাহার প্রগলভা মাতাকে ডাকিতে গেলাম কেন ? অচ্ছা আমার স্বামী সম্বন্ধে কি কথা বলিতে যায় ? বারবার সভয়ে তাহার কন্যার নামই বা উচ্চারণ করিল কেন ? মনিয়ার মা বলে, উহারা খারাপ লোক। তবে এত ক্রোধই বা কেন ? আবার তরুণীর ঘৃণাপূর্ণ দৃষ্টি মনে পড়িতেই তাহার সংশয় বৃদ্ধি হইল—ওঃ আমার দেবতার মত স্বামী, তাঁহার উপর সন্দেহ! না, না এ অসম্ভব! আচ্ছা তাঁকে জিজ্ঞাসা করিলে হয় না ? সব গোলই ত মিটিয়া যায়। ছিঃ ছিঃ কি বলিব ? হ্যাঁ গা তুমি ঐ মেয়েটিকে চেন, না, না, তাহা পারিব না, তাহার পূর্ব্বে মরণ ভালো।

স্বামীর প্রতি গভীর সন্দেহে তাহার মানসিক অশান্তি বৃদ্ধি পাইল। একই ভাবে বসিয়া বসিয়া কখনও অবিশ্বাস, কখনও সংশয় তাহার হৃদয় পূর্ণ করিল। সে শিথিলভাবে শয্যায় শয়ন করিল।

মনিয়ার মা আসিয়া জানাইল,—বাবু আসিয়াছেন, মোটরের হর্ণ আজ তাহার কর্ণে প্রবেশ করে নাই। কিন্তু অভ্যাসবশতঃ ধড়মড় করিয়া উঠিয়াই কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। পলাশ গৃহে প্রবেশ করিয়াই আরাধনার শুষ্ক মুখ দেখিয়া বলিল,—"আরাধ্যা! তোমার শরীর আজ কি ভাল নেই ?"

আরাধনা মৃদুস্বরে বলিল, "না ভালই আছি।"

"না—না—তোমার মুখখানি শুকনো, চোখ ছলছল করচে, এখনো চুলবাঁধা সারা হয় নি।" এই কথা বলিতে বলিতে স্ত্রীর বাহু ধরিয়া পলাশ

আদরের স্বরে বলিলেন,—"কি হয়েছে তোমার আরা।"

বড় দুঃখের সময় প্রিয়জনের সহানুভূতি পাইলে তাহা যেন শতগুণ বর্দ্ধিত হইয়া অশ্রু-সাগর উথলিয়া উঠিতে চায়। পলাশ দেখিল—পত্নীর ডাগর আঁখি অশ্রুভারে টলটল করিতেছে। দেখিতে দেখিতে মুক্তাবিন্দুর ন্যায় তাহা ঝরিয়া পড়িল। বিস্মিত পলাশ ভাবিয়া পাইল না, ইহার মধ্যে হইল কি! এই ত বেলা এগারটার সময় প্রফুল্লমুখী পত্নীকে হাস্যময়ী দেখিয়া গিয়াছে। তবে কি কোন দুঃসংবাদ আছে? অনেক জিজ্ঞাসায়ও কোন সমাচার পাইল না, তখন পত্নীকে বাহুবন্ধনে বাঁধিয়া সান্ত্বনা করিয়া সে পুনঃ পুনঃ আকুল আগ্রহে জানিতে চাহিল,—কি হইয়াছে?

ওগো সে কি বলিবে? কি তাহার বলিবার আছে? একথা যাহাকে বলিবে, সেই হয় ত হাসিবে! তাহার অপার দুঃখ—সংশয়ের জ্বালা কাহাকে জানাইয়া বক্ষঃভার লঘু করিবে? স্বামীর সোহাগ কি তবে ছলনা? না, না, একথা মনে হইতেই মনকে শত ধিক্কার তিরস্কারে শান্ত করিতে চেষ্টা করিল। আমার হইল কি, কর্ম্মক্লান্ত শ্রান্ত স্বামী এই যে নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কথা বিস্মৃত হইয়া আমারই জন্য ব্যাকুল, কিন্তু আমি করিতেছি কি? ছি! ছি! ইতর রমণীতে ও আমাতে তফাৎ কি? জোর করিয়া মনকে দৃঢ় করিয়া সে স্বামীসেবার জন্য অপ্রস্তুত ভাব গোপন করিতে ব্যস্ত হইয়া বাহিরে চলিল। পলাশ তবু ছাড়ে না। তখন আরাধনা জানাইল—হঠাৎ মনটা কেমন খারাপ হইয়াছিল,—পলাশ তাহাতেও সন্তুষ্ট হইতে পারিল না।

কিন্তু তখনকার মত নানাকর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিয়া সেই অস্বস্তিকর চিন্তা ভুলিতে চেষ্টা করিলেও তাহাতে কৃতকার্য্য হইল না; তাহার অন্তর সর্ব্বক্ষণ ঐ এক কথায় যেন দগ্ধ হইতে লাগিল। আহারে, প্রসাধনে তাহার যেন রুচি ছিল না। রাত্রে নাম-মাত্র আহার সারিয়া আরাধনা ইচ্ছা করিয়া ভাণ্ডার-গৃহে বিলম্ব করিল। পলাশ ডাকিতেই ধীরপদে আসিয়া স্বামীকে বলিল, "তুমি ততক্ষণ শোও, আমার ওধারে একটু কাজ আছে।" বিস্মিত পলাশের এতক্ষণে একটু অভিমানও হইল। সে কিছু না বলিয়া পত্নীর ব্যথাকাতর ম্লান মুখপানে ক্ষণেক চাহিয়া গম্ভীরভাবে শয়নগৃহে প্রবেশ করিল। আরাধনা হল ঘরের একপার্শ্বে জানালার নিকট রক্ষিত ইজিচেয়ারখানিতে অবসন্নভাবে শুইয়া পড়িয়া ঐ কথারই আলোচনায় মগ্ন হইয়া কখন অজ্ঞাতসারে নিদ্রিত হইয়া পড়িল। কতক্ষণ এই ভাবে ছিল, সে বুঝিতে পারে নাই, হঠাৎ ঠাণ্ডা বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে কড় কড় রবে মেঘগর্জ্জনের শব্দে তাহার ঘুম ভাঙিয়া গেল। অসময়ে মেঘ, তখনও তন্দ্রামগ্ন আরাধনা চক্ষু চাহিয়া বিস্মিতভাবে দেখিল,—তাই ত সে কোথায়? সম্মুখের মুক্ত জানালা দিয়া বিদ্যুতের লক্ লক্ শিখা দেখা যাইতেছে। বাহিরে তখন ঘোর অন্ধকার। প্রকৃতির বিচিত্র লীলা। এই ত দুই ঘণ্টা পূর্ব্বেও ফাল্গুনের মিঠা বাতাস বহিতেছিল ও চতুর্দ্দশীর জ্যোৎস্না চতুর্দ্দিকে হাসিতেছিল। ইহারই মধ্যে প্রকৃতি ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি ধরিয়াছে। ঘোর মেঘ গর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টির চটপট্ ধ্বনি আরম্ভ হইল; উঠি উঠি করিয়াও অলস, অবশ-দেহ উঠিতে চাহে না। সে চক্ষু মুদিয়াই আপনার অবস্থার কথা ভাবিতে ভাবিতে তন্ময় হইয়া রহিল। ঐ ত প্রকৃতিরাণীর ন্যায় সেও মাত্র তিন চারিদিন পূর্ব্বেও কোন দুঃখের বার্ত্তা না জানিয়া ফুল্লমুখী ও স্বামীসোহাগে আত্মহারা ছিল। আর আজ?,

আজ তাহার হৃদয় ঐ প্রকৃতির ন্যায় দুঃখের মসীবর্ণে অন্ধকার। আধ তন্দ্রা, আধ জাগরণে অভিভূত হইয়া সে পড়িয়াই রহিল। কখন যে বৃষ্টির ঝাপটা তাহার লুণ্ঠিত অঞ্চল ভিজাইয়া দিয়া গেল, তাহা সে জানিতেও পারিল না। টেবিলের উপর আলো খুব কমাইয়া রাখা হইয়াছে। হঠাৎ তাহার মুখের উপর কাহার নিঃশ্বাস অনুভব করিতেই তাহার তন্দ্রা ছুটিয়া গেল। কে সে? পলাশ—অভিমানে শয্যায় পড়িয়া নানা চিন্তার মধ্যেও সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। ঘুম ভাঙিয়া পত্নীকে পার্শ্বে না দেখিয়া চিন্তিত হইয়া সে ধড়মড় করিয়া উঠিয়াই হলে প্রবেশ করিল। এখানে মৃদু-আলোকে চেয়ারের উপর পত্নীকে দেখিয়া বিস্ময়ের মধ্যেও আশ্বস্ত হইল। তাহার দীর্ঘ কেশপাশ আজ অবেণীবদ্ধাবস্থায় খুলিয়া মুখের দুই পার্শ্বে পড়িয়াছে। দেহে একটীমাত্র সেমিজের উপর কাল ফিতা পাড় সাড়ী এলো-মেলো অবিন্যস্ত-ভাবে ভূমিতে লুটাইতেছে। বৃষ্টির জলে অর্দ্ধেক ভিজিয়া গিয়াছে। পলাশ পত্নীর মুখের উপর ঝুঁকিয়া দেখিল, তাহার ব্যথাকাতর ম্লানমুখে চিন্তার ছায়া! দীর্ঘ কৃষ্ণপক্ষ্মজালে অশ্রু যেন টল্‌মল্ করিতেছে। শুভ্র, সুন্দর ক্ষীণ বাহুলতা একটি চেয়ারের হাতার উপর, অপরটি অবশ ভাবে ঝুলিয়া পড়িয়াছে। আশ্চর্য্য! পলাশ দুইহস্তে পত্নীর বাহুমূল সাপ্টাইয়া ধরিয়া লঘুভার বালিকার ন্যায় স্কন্ধের উপর উঠাইয়া লইল। ভীতা আরাধনা স্বামীর কণ্ঠবেষ্টনে চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল। তাহাকে শয্যায় রাখিয়া অপর গৃহ হইতে নিজের সরু ঢাকাই পাড় ধুতি একখানি আনিয়া পত্নীকে আদ্র্র বস্ত্র ছাড়িয়া ফেলিতে অনুরোধ করিল। সে বলিল—"আরা—আরাধনা, আরাধ্যা, বল তোমার কি হ'য়েছে? রাণী আমার, তুমি কখনও মা, বাবাকে ছেড়ে এতদূরে আসো নি, তাই কি মন কেমন ক'রছে? বল—বল। তা যদি বল্‌তে, আমি তার বন্দোবস্ত ক'রতাম! আমার চক্ষের সম্মুখে তুমি এত কষ্ট পাবে—তা আমার সহ্য হবে না। বল—বল সর্ব্বস্ব আমার, বল। তাই কি? বল্‌বে না আরা?"

হায়! কি সে বলিবে? তাহার বলিবার কথা কি আছে? তাহার দুঃখ-সংশয়ের জ্বালা বলিয়া এখনই বক্ষভার লঘু করিবার ইচ্ছাও হইল। কিন্তু না—না—তাহা সে পারিবে না। সে স্বামীর প্রশ্নে শুধু দুই বাহু দ্বারা তাহার কণ্ঠ-বেষ্টন করিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

৪

পরদিনও আরাধনাকে উন্মনা দেখিয়া পলাশ কিছু বলিতে সাহস করিল না। সদা হাস্যময়ী আরাধনা, কয়দিনের অনাহারে, দুশ্চিন্তায়, অনিদ্রায় যেন আধখানা হইয়া গিয়াছিল। পত্নীর ভাব দেখিয়া পলাশ একদিকে যেমন চিন্তিত হইল, আবার দুঃখিতও হইল। তাহার অন্তরেও অভিমানের কৃষ্ণ মেঘ সঞ্চারিত হইল এবং সদা-প্রফুল্ল আননে বিষাদের ছায়া পড়িল। স্বামীর আহারকালে আরাধনা উপস্থিত ছিল বটে, কিন্তু পলাশ দেখিল—সে অন্যমনস্ক। অভ্যাসমত স্বামীকে খাইতেও অনুরোধ করিল। পলাশও অন্য দিনের মত হাসি-গল্পে মুখর হইয়া আহার সমাধা করিতে পারিল না বুঝিয়া, আরাধনা মনকে যুক্তিতর্ক দ্বারা দৃঢ় করিতে চেষ্টা করিল বটে, কিন্তু তবুও—তবুও—এমন কি আহারের পর পান দিতে আসিয়া হাসিয়া স্বামীকে কি বলিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহার ছদ্মবেশ পলাশের অগোচর রহিল না।

কিছু না বলিয়া সে গম্ভীর ভাবে আফিসের পোষাকে সজ্জিত হইল। পত্নীর চিন্তাক্লিষ্ট মুখ দেখিয়া দুঃখে অভিমানে সে নীরবেই গৃহের বাহির হইল। সেইদিন নিত্যপ্রফুল্ল ক্ষমাশীল হাকিমের গম্ভীর বদনে অকারণ ক্রোধ দেখিয়া এজলাস্ শুদ্ধ চমকিত হইয়া উঠিল। এমন কি গোপনে ইঙ্গিত দ্বারা চোখ ঠারিয়া—কেহ বা সুযোগমত মুখ ফুটিয়া বলিয়া ফেলিল—এতদিনে হাকিমি মেজাজ বার হ'য়েচে। তাই বলি এত ভালো—হুঁ হুঁ!

এদিকে মনিয়ার মার পীড়াপীড়িতে আরাধনা নামমাত্র আহারে বসিয়াই উঠিয়া পড়িয়া অবসন্ন ভাবে শয্যায় আশ্রয় লইল। কি করিবে, সে? না, না সকল কথা শুনা চাই। না শুনিয়াই এমন করি কেন? এমন স্বামী আমার—তিনি কি সত্যই—না, না—মিথ্যা, মিথ্যা! অতি বড় শত্রুও তাঁহার চরিত্রে কখনও দোষ দেখে নাই—আর আমি? পথের লোকের কথা শুনিয়া অতি হীনমনাঃ আমি এমন স্নেহময়, উদার প্রেমপ্রবণ, ক্ষমাশীল স্বামীকে অবিশ্বাস করিতেছি! আচ্ছা সেই রমণীই বা একথা বলিল কেন? ভগবান্ ওঃ আর সহ্য হয় না! সে ত আসিবে বলিয়াছিল। আসিবে না? হয় ত তাহার কন্যা আসিতে দিবে না। নানা চিন্তার মধ্যেও সে ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখিল, তাই ত চারিটা বাজে। সে আজ আসিবে না; হয় ত স্বামী আসিয়া পড়িবেন। হঠাৎ সে চকিত কর্ণে শুনিল, মনিয়ার মা কাহার সহিত কথা কহিতেছে। সে নয় ত? আরাধনা ধড়মড় করিরা উঠিয়া পড়িল। রান্না-ঘরের দালানে সেই রমণীই না? রমণীর হস্তে একটা ক্ষুদ্র পিতলের কলসী, মুখে ছোট ঘটী, মনিয়ার মা ততক্ষণ তাহাকে বুঝাইতেছিল,—মাইজীর তবিয়ৎ আচ্ছা নেহি, কেয়া কাম বাতাও, আভি মাজী নিদ যাতা ইত্যাদি। আরাধনা তাহার নিকটে গিয়া ইঙ্গিতে তাহাকে দালানের ভিতর বসিতে বলিল। মনিয়ার মা অভ্যাসমত পা ছড়াইয়া নিকটে বসিয়া ভূমিকা করিয়া বাক্যের সূচনা করিতেই আরাধনা তাহাকে ভাণ্ডার পরিষ্কারের আদেশ করিল। তবু উঠিতে ইচ্ছা ছিল না, আরাধনা তিরস্কারের স্বরে বলিয়া উঠিল —"যাও, বাবু আসবার সময় হয়েচে।" অগত্যা ক্ষুণ্ণমনে সে উঠিয়া পড়িল। আরাধনা নিজেও ভূমিতে বসিয়া ভাবিতে লাগিল, কি সে বলিবে, কি করিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবে? সে স্বামীর উপর অবিশ্বাস করিয়া একজন অজানা অশিক্ষিতা নারীর নিকট তাঁহার চরিত্রের গোপন রহস্য জানিবার জন্য ব্যস্ত হইবে, ৭।৮ দিন পূর্ব্বে তাহা স্বপনেও ভাবিতে পারে নাই। মানব যাহা কল্পনাতেও মনে আনিতে অক্ষম, বাস্তব জীবনে তাহাও ঘটিয়া উঠে। অভিমানিনী আরাধনা নিজের মনের গতি দেখিয়া নিজেই বিস্মিত হইল। ভাবিল এ কি করিতেছে সে! কিন্তু না শুনিয়াও সে স্থির হইতে পারিবে না। না—না—তাহাকে সব শুনিতেই হইবে। হউক যাহা তাহার অদৃষ্টে—বার বার পোঁচাইয়া জবাই হওয়ার চেয়ে একেবারে বলিদান ভালো। আর সে সহ্য করিতে পারে না। চিরসুখী সে কখনও দুঃখের আঘাত সহে নাই। ধনী পিতার সোহাগের দুলালী,—আবার শ্বশুরালয়ের আদরের—অতি আদরের বধূ—পয়মন্ত বলিয়া আত্মীয়-স্বজনের নিকট পরিচিতা, আদৃতা। স্বামীর নিকট তাহাকে কখনও একটী মিষ্ট তিরস্কারও সহ্য করিতে হয় নাই। তাই তাহার এ দুঃখবোধ যেমন নূতন, তেমনই তীব্র! তাহার জীবনে এই প্রথম দুঃখ অনুভবের আঘাতে সে তাই একেবারেই অধৈর্য্য হইয়া পড়িয়াছিল; এ কষ্ট সহ্য করা সে অসম্ভব মনে করিতেছিল। তাহার আলোকময় জীবনে

প্রথম অন্ধকারের ছায়া পড়িল। যে মলয় বায়ু তাহার জীবনে প্রবাহিত ছিল তাহা একেবারে উদ্দাম ঝঞ্ঝার আকার ধারণ করিতেছে। স্বামীর প্রতি অবিশ্বাস, তাহা সহ্য করিতে অভ্যস্ত সে ত নহে, কাজেই বজ্রের আকারে উহা তাহার কোমল বক্ষে বাজিয়াছে। সে তাহার মনকে নানা যুক্তি তর্কে প্রবোধ দিয়াও শাস্ত করিতে পারিতেছিল না। সে যেন তাহার সর্ব্বস্ব হারাইবার আশঙ্কায় ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। সে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বেই রমণী পূর্ব্বকথা তুলিয়া তত্তক্ষণে নিজের দুঃখ-কাহিনী আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল। বাঙ্গলায় শান্তি-পুরে তাহার বাটী, সেখানকার জমিদারপুত্র যখন হাকিমের পদ পান, তখন তাহার স্বামী হাকিমের খানসামা নিযুক্ত হয়। তাঁহারই অনুরোধে তাঁহার সহিত পাটনায় আসে। কি করিয়া ম্যালেরিয়ায় জীর্ণ অবস্থায় মনিবের পরামর্শে সেও স্বামীর নিকট চলিয়া আসে, তাহারই কাহিনী সে বলিয়া যাইতে লাগিল। থামের আড়াল দিয়া সূর্য্যাস্তের পড়ন্ত রৌদ্র আরাধনার মুখে আসিয়া পড়িলেও সে অভি-ভূত চিত্রার্পিতের ন্যায় বসিয়াই রহিল। কন্যার কথা উঠিতেই চকিত হইয়া উঠিল। আমরা মা গোয়ালা, আমাদের জাতের ব্যবস্থা মত সাত বছরে পড়তেই আমার মেয়ে চন্দনার বিয়ে দিলাম। কিন্তু আমার পোড়া কপাল, দু'বছর পিলে ও জ্বরে ভুগে জামাই মারা গেল। ন'বছরের বিধবা মেয়ে নিয়ে এদেশে এলাম। দেশে যেতে এখনও ইচ্ছে করে, তা কেউ আপনার লোক ত নেই মা, আর মেয়েও যেতে রাজী নয়। তার পর সদাশয় মনিবের বাড়ীতে সেও থাকিত। গৃহস্থালীর কাজ কর্ম্ম দেখিত, আর তাঁহার পুত্র-কন্যার সাথে চন্দনাও বিদ্যাশিক্ষা করিত। সেই হাকিম বাবুরই দয়ায় বাগানের পিছনে এই জমি কেনা, তার পর এদেশেই ঘর গৃহস্থালী পাতা হইল। স্বামী আর দেশে ফিরিতে চাহিলেন না।

পরে সজলনয়নে স্বামীর মৃত্যুকাহিনী বর্ণনা করিয়া—কি ক'রিয়া এই হাকিম বাবুর বাটী দুধের জোগান দিতে আসিয়া চন্দনার সহিত তাঁহার দেখা হইল—তা সে বলিল। তিনি একদিন আমাকে বলিলেন—তোমার মেয়ের যখন এত লেখাপড়ায় ঝোঁক, পড়িতে দিও, আমি পড়াবো। আর তোমার মেয়ের আবার বিয়ে দাও।" তা কেমন করে হয় মা? বাবু বলিলেন, বিদ্যেসাগরী মত না কি আছে,—সেই মতে তোমার ছোট মেয়ের আবার বিয়ে হতে পারে।' আগে ভালো করে লেখাপড়া শিখুক্। আমার আর কে আছে? সোমত্ত মেয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করে দেখলাম। তা বিয়েতে তারও মন আছে বুঝতে পারলাম। তিন কুলে কেউ নেই, দেশেও আর যাওয়া হয় না, আমার ঐ একমাত্র মেয়ে, সে যদি সুখী হয়, তাই হোক না, আমার আর কি? জাতে ঠেলতে এ বিদেশে কেউ আস্‌বে না। হাকিম বাবু লেখা-পড়ার ভার নিলেন। আমিও মেয়েকে সঙ্গে ক'রে, রোজ এসে বাড়ীতে মেয়ে মানুষ নেই, ঘর-গৃহ-স্থলীর কাজকর্ম্ম করে দিয়ে যেতাম, যাবার সময় মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ী ফিরতাম। দিন কতক বাদে হাকিম বাবু আমায় ডেকে বল্‌লেন, আমিই তোমার মেয়েকে বিয়ে ক'র্‌বো। আমি ত অবাক! এত সুখ কি আমার কপালে সই'বে? তা তিনি বল্‌লেন, আমার ত বিয়ে হয় নি—ছুটী নিয়ে কল্‌কাতা যাবো, সেইখেনেই বিয়ে হবে। কি আর বলবো মা, বিয়ে হবে শুনে মেয়েকেও আর অত আঁটা আঁটী করলাম না।—হায়! হায়! এমনি করে পাচ ছ'মাস হয়ে গেল, মেয়ে ত সকাল সন্ধ্যো বাবুর কাছে থাকে, বিয়ের নাম শুনি না—

আবার একদিন সাহস করে বল্‌লাম, তা বাবা বিয়েটা—বাবু যেন বিরক্ত হয়ে বল্‌লেন, যাও সে হবে'খন। কি জানি মা—তখনও মনে সন্দেহ হয় নি। দিন কতক যেতেই, ওঃ মা মেয়ের অবস্থা দেখে কেমন সন্দ হলো! মেয়ের আমার সন্তান-সম্ভাবনা! আমি কপাল চাপড়ে সন্ধ্যাবেলা বাবুর কাছে কেঁদে পড়লাম। বাবু ধমকে আমায় অপমান করে বাড়ীর বার করে দিলেন। আমি রাগে দুঃখে বাড়ী গিয়ে চন্দনাকে গালাগালি দিয়ে সব কথা বল্‌লাম। আশ্চয্যি! মেয়ে শুনে চোখে মুখে আগুন জ্বেলে বল্‌লে—আজই রাত্রে আমি যাবো। কি আর বল্‌বো মা? আমার পোড়া কপাল পুড়ে গেল!

আরাধনা স্তব্ধ হইয়া বসিয়া এতক্ষণ শুনিতেছিল। তাহার বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া তপ্তশ্বাস বাহির হইয়া আসিল। চক্ষে তাহার অস্বাভাবিক দীপ্তি!—"তার পর?" তার পর আর কি! মা? রাত্রে ঐ তোমাদের চাপরাসী আমার চন্দনাকে গলা ধরে বার করে দেয়। মেয়ে আমার সারারাত গুমরে গুমরে কাটা ছাগলের মত ছট্‌ফট্ করে। মেয়ে একটু শান্ত হলেই আরও একটা কথা শুনতে পেলাম। রাগে দুঃখের ঝোঁকেই বলে ফেল্‌লে যে, বাবুর সঙ্গে তার দেখা হয়েছিল, তিনি বলেছিলেন, যদি চন্দনা তার গর্ভ নষ্ট করতে রাজী হয়, বাবু তাকে বিয়ে না করে রাখতে পারেন! তাই শুনে চন্দনা তাঁকে যাচ্ছে তাই করে গালাগালি দিয়ে ও পাপ কাজে অসম্মতি জানায়। তাই বাবু চাপরাসী দিয়ে গলা-ধাক্কা দেন।"

চক্ষের জল মুছিয়া রমণী উঠিয়া কহিল,—"যাই মা—কি আর বল্‌বো, আমি সেই অবধি এ বাড়ী ঢুকিনি; হাকিমবাবু শুন্‌লে আস্ত রাখবেন না। আপনার ঝি-চাকরদের বারণ করে দিও মা, চন্দনাও শুনতে পেলে আমায় যে কি বলবে, কি করবে জানিনে। তবু আপনাকে জানিয়ে বুকের পাষাণ যেন হাল্‌কা মনে হচ্ছে। সতীলক্ষ্মী আপনি,—বাবুকে কিছু বল্‌লে আপনার মনে কষ্ট হবে। ভগবান আছেন, তিনিই এর বিচার কর্‌বেন।" শুনিয়া আরাধনা শিহরিয়া উঠিল। কখন সে চলিয়া গেল, সে বুঝি জানিতেও পারিল না—সঙ্গে সঙ্গে তাহার সুখ-শান্তিও লইয়া গেল। এই তার স্বামী—এত প্রতারক দুষ্ক্রিয়াসক্ত ভণ্ড! এই স্বামিগর্ব্বে সে আত্মহারা হইয়া স্বর্গ রচনা করিত। ওঃ—না—না—স্বামী দেবতা, হিন্দুর মেয়ে আমি না? সকলাবস্থাতেই তিনি প্রণম্য কিন্তু—কিন্তু বক্ষভেদ করিয়া কণ্ঠনালী চাপিয়া কি অব্যক্ত বেদনা উঠিতে চায়? ওগো কি করিয়া তুমি ভুলাইয়াছিলে? তাহার অনাহারক্লিষ্ট ম্লান শুষ্কমুখ, অবেণীবদ্ধ কেশকলাপ, আলুথালু বেশ দেখিয়া কত কালের রোগীর ন্যায় মনে হইতেছিল। তাহার স্নায়ুমণ্ডল অবসন্ন—হঠাৎ চকিতে সে উঠিয়া দাঁড়াইল—ঐ মোটরের হর্ণ না? স্বামী ত আসিয়াছেন, না—না—ওগো না এখন সে তাঁহার সম্মুখে যাইবে না, যাইতে পারিবে না, তাহার বিশ্বাসপ্রবণ হৃদয় যে ভাঙ্গিয়াছে! এ মুখ তাহাকে সে দেখাইতে পারিবে না। ঐ যে হল ঘরের পার্শ্ব দিয়া স্বামীর মূর্ত্তি দেখা গেল। কোথা যাই? একি পা টলে কেন? দাবানলদগ্ধ হরিণীর ন্যায় সে ছট্‌ফট্ করিতে করিতে দুই হস্তে দৃঢ়রূপে বক্ষদেশ চাপিয়া দ্রুতপদে বাগানের দিকে চলিল, ওঃ ভগবান এ আমি সহ্য করিতে পারিব না! বাগানের শেষাংশে বকুলবৃক্ষতলে প্রস্তরবদ্ধ বেদীর উপর অবসন্নভাবে বসিয়া সে হাঁপাইতে লাগিল; পরে বৃক্ষে হেলান দিয়া উদাসভাবে রেলিংয়ের ওপারে,

চাহিয়া রহিল। হঠাৎ অপর পারে চন্দনার তেজোময়ী মূর্ত্তি দেখা যাইতেই সে মাথা তুলিয়া তাহার পানে চাহিয়া রহিল। তরুণী তখন গাভীর দড়ি খোঁটা হইতে খুলিতে ব্যস্ত। তাহার দিকে চাহিতে চাহিতে তাহার জ্বলন্ত-অগ্নি দ্বিগুণ তেজে জ্বলিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে কয়দিনের অনাহার, অনিদ্রা ও স্নায়বিক উত্তেজনায় অবসন্ন দেহ সংজ্ঞাহীন হইয়া প্রস্তরে পতিত হইল।

৮

পলাশ স্ত্রীর জন্য অপেক্ষা করিয়াও তাহাকে নিকটে কোথাও দেখিতে না পাইয়া এ ঘর ও ঘর অন্বেষণ করিল। পরে মনিয়ার মাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া উত্তরে জানিল যে, মাজী দুপুর-ভোর ঐ দুধবালীর সহিত বাতচিত করিয়া এই রসুইকা ওধার বোঠকে আভি বাগিচামে হোবে। মাজীর তবিয়ৎ আচ্ছা নেহি, আজ তিন চার রোজ কুচ নেই খানা, পিনা ইত্যাদি। অবশেষে জানাইল মাইজীকে ঝাড় ফুঁক করণে চাহি, ওহি দেওতা কা—পলাশ তাহাকে বাধা দিয়া বাগান দেখিতে হুকুম দিল। পলাশ উৎকণ্ঠিতচিত্তে আরাধনার জন্য বসিয়া রহিল। পরক্ষণেই মনিয়ার মার ক্রন্দনে চমকিয়া উঠিয়া বাহিরে আসিতে আসিতে জিজ্ঞাসা করিল, কি হইয়াছে। উত্তরে কিছু বুঝিতে না পারিয়া একরূপ ছুটিয়াই বাগানের দিকে চলিল। মনিয়ার মা বকুলতলায় শায়িত আরাধনাকে দেখাইয়া হাঁউমাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। তাহাকে ধমক্ দিয়া পলাশ শঙ্কাব্যাকুল হৃদয়ে পত্নীর একখানি হাত তুলিয়া পরীক্ষা করিল। আছে—আছে, এই না ধমনীতে ক্ষীণ রক্তপ্রবাহ চলাচল করিতেছে? নাসিকার নিকট হাত রাখিয়া নানারূপে পরীক্ষা করিয়া বুঝিল—আরাধনা মূর্চ্ছিতা। মনিয়ার মা তখনও ভয়ে ভয়ে ধীরে ধীরে ঝাড়-ফুঁকের জন্য বাবুকে কাতর অনুরোধ করিতেছে। চুপ! জল আনো—বলিয়া পলাশ অতি যত্নে পত্নীর লুণ্ঠিত মস্তক ক্রোড়ে তুলিয়া বসিল। ডাকা-ডাকিতে, চাকর, দাসী, আরদালী, ঠাকুর, জল, পাখা ইত্যাদিতে সে স্থান পূর্ণ হইল। পলাশ ম্লানমুখে পত্নীর বিষণ্ণ কাতর মুখখানির প্রতি চাহিয়া রহিল। তার পর মনে পড়িল ডাক্তারের কথা। যাও, যাও, ডাক্তার আনো। আরাধনা একবার চোখ মেলিতেই উৎকর্ণ পলাশ একদৃষ্টিতে তাহার উপর চোখ রাখিল। পত্নীপ্রাণ পলাশের বৃহৎ আঁখিতারা সজল। এতক্ষণে পত্নীকে চেতনা পাইতে দেখিয়া আশ্বস্ত-হৃদয়ে তাহার মুখের উপর ঝুঁকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আরা, কেমন আছ?

আরাধনার জ্ঞানের সঞ্চার হইলেও অবসন্ন ভাবে চুপ করিয়া পড়িয়াই রহিল। পলাশ তখন ব্যস্তভাবে বলিল—এই কোন গিয়া ডাক্তর বাবুকা ওয়াস্তে? বাঙ্গালী চাপরাসী জানাইল—হাঁ ঐ আরদালী গিয়াছে বলিয়া—সে এধার ওধার চাহিয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিল, এই, তুমি, ওখান থেকে কি দেখচো? যাও। তাহার কথায় পলাশ সেই দিকে চাহিয়া একটী অর্দ্ধ-বয়স্কা রমণীকে বেড়ার রেলিঙের পাশ হইতে সরিয়া যাইতে দেখিল। কে ও? আরাধনা চুপ করিয়া সবই বুঝিতেছিল। সেও জানিবার জন্য ব্যস্ত হইল কে? স্বামী নিশ্চয়ই জানেন। এও এক নূতন ছলনা। চাপরাসী গণেশ উত্তরে জানাইল, হুজুর ও মাগীরা বদ্‌মাস, আপনার আগে যে হাকিমবাবু ছিলেন, তিনি ওকে আর ওর মেয়েকে বাড়ী থেকে বের করে দিয়েছিলেন।

চমকিত আরাধনা উৎকর্ণ হইয়া চোখ মেলিল। সে কি শুনিতেছে? ইহা কি সত্য? ওগো আরাধনার দেবতা—ওগো ভগবান সত্যই তুমি আছ? গণেশ চারপাসী তাহার কর্ণে এ কি অমৃত সিঞ্চন করিল। ইহা যে তাহার পক্ষে মৃতসঞ্জীবনী সুধা। পলাশ গণেশকে বলিতেছিল,—যাক্ আমাদের ও কোনও ক্ষতি ত করে নাই। উহাকে কড়া কথা বলিবার প্রয়োজন কি? আরাধনা মুহূর্ত্তে চেতনা পাইয়া উঠিয়া বসিতে চেষ্টা করিল, ও মুখ ফিরাইয়া রেলিঙের ওধারে চাহিয়া দেখিল।

পলাশ স্নেহ-মমতা-মাখা মধুর স্বরে বলিল,—আরাধ্যা উঠো না; ডাক্তার বাবু আসছেন।

"না—না—আমি বেশ আছি। ওগো আমার কথা বিশ্বাস করো, বেশ আছি।"

আরদালী আসিয়া জানাইল, ডাক্তার বাবু আসিয়াছেন।

"বোলাও।"

পলাশের হাত ধরিয়া আরাধনা অনুনয় করিল, না, না ডাক্তার সে দেখাইবে না—"তুমি যাও ভদ্র লোক এসেছেন, বাহিরে গিয়ে অসুখ ভাল হওয়ার সংবাদ দিয়ে এসো।" পলাশ ইতস্ততঃ করিয়া বলিল,—"না আরা তুমি বড় দুর্ব্বল, আর বড় ছেলে মানুষ।" কিন্তু পত্নীর কথা উপেক্ষা করিতে পারিল না। সে বারবার জানাইল সে ভাল আছে, কিছুতেই ডাক্তার দেখাইবে না।

কিন্তু তোমায় রেখে কি করে যাবো?

যাও গো যাও, কোন ভয় নেই।

পলাশ অনিচ্ছায় উঠিল।

আরাধনা মৃদুস্বরে বলিল, দেখ, অডিকলোনের শিশিটা নিয়ে তুমি কিন্তু বাগানে এসে আমায় সঙ্গে করে নিয়ে না গেলে আমি যাব না।

আচ্ছা, আচ্ছা বলিয়া পলাশ পত্নীর মুখপানে চাহিয়া দেখিল,—রাহুগ্রস্ত চন্দ্র মুক্তাবস্থায় যেমন আরও উজ্জ্বলরূপে লোকের চক্ষে দেখা দেয় তেমনই পত্নীর ক্ষণপূর্ব্বের ম্লান বদন এখন অনুরাগ, উৎসাহে যেন দীপ্তিময় হইয়া উঠিয়াছে। মনিয়ার মাকে তাহার নিকট বসিতে বলিয়া, বার বার তাহাকে উঠিতে নিষেধ করিয়া, পলাশ ডাক্তার বাবুর অভ্যর্থনায় চলিল। আরাধনা কিন্তু স্বামী আজ্ঞা পালন করিতে পারিল না। মনিয়ার মার আপত্তি সত্বেও সে উঠিয়া কৌতূহলে রেলিঙের ধারে ঝুঁকিয়া দাঁড়াইল।

রমণী তখন ম্লানমুখে গোময়গুলি কুড়াইয়া এক স্থানে জমা করিতেছিল। আরাধনাকে দেখিয়া ভয়ে জিজ্ঞাসা করিল—"কি হয়েছিল মা আপনার? আমি নির্লজ্জ মা, তবু আপনাকে দেখে কি মায়া হয়েছে মা—এই ত কতক্ষণই বা আপনার কাছ থেকে এয়েচি, এর মধ্যে কি হোল তাই দেখছিলাম। আমারই দোষ, তা আপনার কাছে কে বসেছিলেন? উনি বুঝি আপনার ভাই?"

"না—না"—সন্দেহ-মুক্তির আনন্দে পুলকের উচ্চ কণ্ঠেই আরাধনা বলিয়া ফেলিল—"সে কি, তুমি বাবুকে চেন না? যে বাবু"—

বাধা দিয়া রমণী বলিয়া উঠিল,—"ইনি কি হাকিম বাবু?"

"হাঁ গো—যাঁর স্ত্রী আমি।"

"ওঃ মা, ইনি? ইনি ত তিনি নয়,—ইনি কবে এলেন? ওঃ মা আমি জানি তিনিই আছেন। কি করেই বা জানবো মা? মানুষের সঙ্গে ত এক রকম আমাদের মুখ দেখাদেখি নেই। থাকি এই বাগানের পেছনে; চন্দনার জ্বালায় কারু সঙ্গে কথাও কইবার যো নেই। দুধ দিতে বার হই, তাও ঐ গাড়োয়ালীর বাড়ী।"

পলাশের সঙ্গে সঙ্গে আর সকলে চলিয়া যাইলেও চা কর রিতুয়া তখনও মনিয়ার মার সহিত গল্পে ব্যস্ত ছিল।

সে এদেশের লোক হইলেও বাঙালী বাড়ী কাজ করিয়া বাঙলা বুঝিত ও নিজেও যথাসাধ্য বাঙলা বুলি আওড়াইতে চেষ্টা পাইত। সে রমণীর কথার কতকাংশ শুনিতে পাইয়া আগাইয়া আসিয়া বলিয়া উঠিল—"তুমি কুন বাবুর কথা বলছে, ওহি সুরিন বাবু না? ঐ বাবু ত ছ'সাত মাহিনা চলে গেল। ওহি বাবু জবরদস্ত হাকিম হুঁ, জানে ত বুড়ী মা?

রমণী অপ্রতিভ ভাবে জানাইল—"না তা আমি জানি না, আমার মেয়েও জানে না?" তার পর সে বলিল,—"মেয়ে ত বাবা এধারে আর আসে না, আমিও আসি না। তবে মাকে আমার বাগানে দেখে থাকতে পারি নি, তাই—আহা! ইনি বুঝি তিনি নন। সতী সাবিত্রী মা আমার—না জেনে কত কথা বলেচি গো! এই চন্দ্র চন্দনার কাছে, বলি গিয়ে যা অভাগী অন্নপূন্নো মার পায়ের ধুলো নিয়ে আয়; তুই যা ভেবে গোমরা মুখে থাকিস, তা নয় লো তা নয়। সে মুখপোড়া হাকিম এ নয়। আহা সোনার চাঁদ হাকিম, বেঁচে থাক। আমার মাথার চুলের পেরমাই পান, আহা বাবার আমার মুখখানি বা কেমন, যেন নদের গোরা।"

আরাধনা পুলকে কম্পিত হইতেছিল। আনন্দের উত্তেজনায় তাহার বুক তোলপাড় করিতে লাগিল। তাহার মনের গ্লানি কাটিয়া গেল। সংশয়মুক্তির পুলকে তাহার চক্ষে আনন্দাশ্রু ঝরিয়া স্বামীর উপর তাহার প্রেম, ভক্তি, অনুরাগ শত গুণে বর্দ্ধিত হইল। সন্ধ্যায় আত্মবিস্মৃতভাবে সকলের সমক্ষেই আনন্দের আতিশয্যে স্বামীর পদদ্বয় দুই হাতে চাপিয়া ধরিয়া বালিকার ন্যায় কাঁদিয়া ফেলিল। নিরপরাধ পলাশ অপরাধীর মত অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

উপন্যাস

রায় মশাই

শ্রীক্ষেত্রমোহন ঘোষ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

গুণ্ডারা গাঁ ছাড়া হইয়া চলিয়া যাইবার পর প্রসন্ন রায় এবং জাহ্নবী অনেকটা নিশ্চিন্ত হইল—তাহারা বুঝিল মাথার উপর যে বজ্রগর্ভ মেঘমালা ঘনান্ধকারে দিঙ্মুখমণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিয়া জমাট বাঁধিতেছিল, আপাততঃ তাহা সরিয়া গেল। জাহ্নবী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া, উর্দ্ধনেত্রে যুক্তকরে ডাকিল,—"মধুসূদন! বিপদহারী তুমি! তোমায় যেন কোন দিন বিস্মৃত না হই!"

প্রসন্ন তথাপি সতর্ক রহিল। অমাবস্যার কালরাত্রি অতিবাহিত হইল। জাহ্নবীর মুখে আবার হাসি ফুটিল। সুখে দুঃখে তাহাদের যেমন দিন যাইতেছিল—আবার তেমনি করিয়া তাহারা জীবনযাত্রার পথে অগ্রসর হইল। জাহ্নবী নদী হইতে জল আনিয়া এবং প্রসন্ন ছমির সেখের সহায়তায় ভিন্ন গ্রাম হইতে হাট-বাজার করিয়া গ্রামের এক প্রান্তে তাহাদের জীর্ণ কুটীরে কালাতিপাত করিতে লাগিল।

যে দিন প্রকাশ দত্ত নেশার ঝোঁকে তাহার অন্তরের গুপ্ত কথা বন্ধুমহলে প্রকাশ করিয়া ফেলিল, তাহার পরে ত্রিরাত্র অতিবাহিত হইবার পূর্ব্বেই সে কথাটা গ্রামের আপামর-সাধারণের কর্ণগোচর হইল। প্রকাশ বার বার সে কথা প্রকাশ করিতে নিষেধ করিলেও, অপরাপর গুপ্তকথার ন্যায় নানাভাবে পল্লবিত এবং রূপান্তরিত হইয়া চতুর্দ্দিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। লোকের বৈঠকখানায় পুরুষ-মহলে, স্নানের ঘাটে মহিলা-মজলিসে, মাঠে ঘাটে গোঠে যেখানেই দুই চারিজন চাষাভূষা সমবেত হইয়াছে, সেইখানেই ঐ কথা লইয়া আলোচনা হইয়াছে। কেহ বিশ্বাস করিয়াছে, কেহ হাসিয়াছে; কেহ মাতালের খেয়াল বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছে। মোটের উপর ফল এই দাঁড়াইয়াছে, তাহার পর হইতে, পথে ঘাটে প্রসন্নকে দেখিলেই লোকে সভয়ে তাহার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিত, সে আসিতেছে, দেখিলেই পল্লীরমণীরা বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিত, অবিশ্বাসীর দল অবাক্মুখে সকৌতুকে তাহার দিকে চাহিয়া থাকিত। যাহারা ঐ কথা লইয়া উপহাস করিয়া অবজ্ঞা প্রকাশ করিত, তাহারাও কিন্তু প্রকাশ্যভাবে তাহাকে কোনরূপ উত্যক্ত করিতে বা তাহার বিরাগভাজন হইতে সাহস করিত না।

আরও ছয় মাস কালসমুদ্রে মিশাইয়া গেল। গ্রামের সহিত সর্ব্ববিষয়ে একপ্রকার সংস্রবশূন্য হইয়াও, গ্রাম্য সমাজের বাহিরে অবস্থান করিয়াও নির্ব্বিবাদে প্রসন্নর দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল। বন্ধুবান্ধবের উৎসাহ পাইয়াও প্রকাশ দত্ত আর যখন তাহাকে কোন উৎপীড়ন করিতে সাহস করিল না, তখন গ্রাম্য মাতব্বরের দল মনে মনে একটা মহা অস্বস্তি অনুভব করিতে লাগিল। এত বড় একটা অনাচার করিয়া, সমাজের বুকের উপর জগদ্দল পাথরের মত প্রসন্ন রায় বসিয়া থাকিবে—ইহা যেন উঁহাদের চক্ষুঃশূল হইয়া দাঁড়াইল। হিন্দুধর্ম্মের এত বড় গ্লানি—তাঁহাদের এতখানি লাঞ্ছনা অপমান তাঁহারা কেমন করিয়া সহ্য করিবেন। প্রতি মুহূর্ত্তেই ধর্ম্মনাশের ভয়ে শিহরিয়া উঠিতে লাগিলেন অথচ ইহার কোন প্রতিবিধান করিবার তাঁহাদের সাহস ছিল না। দিন দিন আরও একটা বিষয় তাঁহাদের অসহ্য হইয়া উঠিতে লাগিল। গ্রামের,

দরিদ্র এবং নিম্নশ্রেণীর অধিবাসীরা ক্রমশই প্রসন্ন রায়ের পক্ষপাতী হইয়া উঠিল—তাহাকে দেখিলে লোকে যাচিয়া কথা কহে—সসম্মানে তাহাকে পথ ছাড়িয়া দেয়—এখন আর সে খোঁড়া প্রসন্ন, লোকের অবজ্ঞার পাত্র নয়—এখন সে রায় মহাশয়—সাধারণের ভয় এবং ভক্তির পাত্র।

প্রসন্নর যে সামান্য জমিজমা ছিল, তাহার আয় হইতেই কোনরূপে তাহার সংসার চলিতে লাগিল। তাহার কোনরূপ বাবুগিরি বা বিলাসিতা ছিল না, মোটা ভাত, মোটা কাপড়ে সন্তুষ্ট থাকিয়া, সংসার-সাগরে তাহার জীবনতরি ভাসাইয়া দিল। আর জাহ্নবী এত দুঃখকষ্টের মধ্যেও এই মহদন্তঃকরণ বালকের আশ্রয় লাভ করিয়া, তাহাকে পুত্ররূপে পাইয়া আপনাকে ধন্য মনে করিতে লাগিল। প্রসন্ন যখন তাহাকে মা বলিয়া ডাকিত. তাহার হৃদয় মন আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠিত, সংসারের অত্যাচার, অবিচার, সহস্র লাঞ্ছনা সব ভুলিয়া যাইত। তাহার ক্ষত বিক্ষত ক্ষুদ্র হৃদয় প্লাবিত করিয়া স্নেহের মন্দাকিনী ধারা বহিয়া যাইত—তাহার চোখে মুখে গণ্ডে এক অপূর্ব্ব স্বর্গীয় মাধুরী ফুটিয়া উঠিত। শৈশবে মাতৃহারা বালক সে মূর্ত্তি দেখিয়া ভাবিত তাহার মত সুখী কে? কিসের অভাব তাহার!

জমির উৎপন্ন ফসলে কোনরূপে তাহাদের অন্নবস্ত্রের সংস্থান হইত। প্রসন্নকে বাজার হাট বড় একটা করিতে হইত না। পাশের নিকটবর্ত্তী গ্রামগুলা দিয়া একদিন ঘুরিয়া আসিতে পারিলে যে শাক-সব্জী পাওয়া যাইত, তাহাতে তাহাদের এক সপ্তাহ চলিয়া যাইত। তদ্ভিন্ন ছমিরের বাড়ীতে যখন যে ফসল উৎপন্ন হইত, তাহার এ খোঁড়া ভাইটীকে না দিয়া সে খাইত না। এই ভাবে তাহাদের দিন চলিতে লাগিল।

শাকান্ন খাইয়া প্রসন্নর দিনাতিবাহিত হইতেছে, ইহাও যেন গ্রামের কতকগুলা লোকের সহ্য হইতেছিল না, ব্যক্তিগতভাবে সে কাহারও কোন অনিষ্ট করে নাই— তাহার অপরাধের মধ্যে সে জাহ্নবীকে আশ্রয় দিয়াছে, এত বড় একটা দুষ্কর্ম্ম করিয়া আজও সে গ্রামে বাস করিতেছে, এই কথাটা যখনই তাহাদের মনে পড়ে, তখনই তাহারা একটা মহা অস্বস্তি অনুভব করিয়া ছট ফট করিতে থাকে। এতদিন প্রকাশ দত্ত তাহাকে বিবিধ প্রকারে নির্য্যাতন করিতেছিল—ঐ সকল ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তি নির্ব্বাক হইয়া তাহা দেখিতেছিল এবং প্রকারান্তরে তাহার পোষকতা করিয়া পরমানন্দ উপভোগ করিতেছিল। এক্ষণে প্রকাশ দত্ত যে কারণে হউক সরিয়া যাওয়াতে তাহাদের বিষম গাত্রদাহ উপস্থিত হইল এবং কোন্ পন্থা অবলম্বন করিলে তাহাকে গ্রাম হইতে বিতাড়িত করিতে পারা যায়, তাহা নির্ণয় করিবার জন্য শলাপরামর্শ করিতে লাগিল।

এদিকে যতই দিন যাইতে লাগিল, গ্রামের মধ্যে প্রসন্নর প্রতিপত্তি যেন ধীরে ধীরে বাড়িতেছিল। গ্রামের অশিক্ষিত ছোট লোকগুলা প্রসন্নকে দেখিলেই রায় মশায় বলিয়া খাতির করে—তাহার খোঁড়া পায়ের ধূলা লইয়া মাথায় দেয়—তাহার মুখের একটা কথায় তাহারা ওঠে বসে। এ সকল কি বরদাস্ত হয়!

তাহার প্রতি লোকের এত ভক্তি কেন? তাহার এমন কি গুণ আছে? না আছে তাহার বিদ্যা-বুদ্ধি, না আছে তাহার সহায়-সম্পত্তি—তথাপি ঐ দীনদরিদ্র, বিকলাঙ্গ, সমাজচ্যুত লোকটাকে সকলে এত ভয় করে কেন? তাহাকে সন্তুষ্ট করিতে পারিলে কৃতার্থ হয় কেন? ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতে যাইয়া তাহারা দেখিল, প্রকাশ দত্তই যত অনিষ্টের মূল—যদি ঐ সেরূপ রট না না

করিত, লোকগুলা ভয় পাইয়া এমনভাবে তাহার পদানত হইয়া পড়িত না। তাহাদের এই অন্ধ বিশ্বাসের মূলোৎপাটন করিতেই হইবে, নচেৎ দুদিন পরে মানসম্ভ্রম লইয়া গ্রামে বাস করা দায় হইবে।

এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া তাহারা লোক লাগাইয়া প্রকাশ দত্তকে ক্রমাগত উৎসাহিত করিতে লাগিল—জাহ্নবীর প্রতি তাহার সুপ্ত লালসা আবার যাহাতে জাগ্রৎ হইয়া উঠে, তাহার উপায় দেখিতে প্রবৃত্ত হইল।

নায়েব দিবাকর সরকার জমিদারী সংক্রান্ত একটা মামলায় এতদিন বড় ব্যস্ত ছিল, প্রায়ই তাহাকে জেলার সদরে থাকিতে হইতে এতদিনের পর ঐ মামলার নিষ্পত্তি হওয়ায় দিবাকর আবার নিশ্চিন্ত হইয়া মৌগাছায় ফিরিয়া আসিল। কুচক্রীর দল নায়েব মহাশয়ের শরণাপন্ন হইল। সকল কথা শুনিয়া দিবাকর তাহাদিগকে আশ্বাস দিয়া বিদায় দিল।

এদিকে কালের পলিমাটী পড়িয়া, প্রকাশের বুকের মধ্যে যে গভীর ক্ষত হইয়াছিল, তাহা অনেকটা পুরিয়া আসিয়াছিল। জাহ্নবীকে সে কোন দিনই ভুলিতে পারে নাই—আর ভুলিতে পারে নাই সেই রাত্রির তাহার দুর্দ্দশা এবং লাঞ্ছনার কথা। প্রতিনিয়তই উহা তাহার হৃদয়ে জাগিতেছিল—কেবল ভয়ে উহার কোন প্রতিবিধান করিতে পারে নাই। বন্ধুবান্ধবের উৎসাহে এবং গ্রাম্য মণ্ডলদের প্ররোচনাতেও সে নাচিয়া উঠে নাই, আজ দিবাকরকে দেখিয়া তাহার সেই লুপ্ত সাহস যেন আবার ফিরিয়া আসিল। তাহার সহিত বহুক্ষণ ধরিয়া এ বিষয়ে আলোচনা হইল।

জলদগ্নারের মধ্যে একটা মাটীর ঢেলা থাকিলে সেটা যেমন তাতিয়া লাল হইয়া উঠে কিন্তু অনলকুণ্ড হইতে তাহাকে অপসারিত করিবামাত্র তাহার সে তেজঃ-দীপ্তি যেমন অন্তর্হিত হয়, দিবাকরের প্রস্থানের পর প্রকাশ দত্তের অবস্থাও ঠিক সেইরূপ হইল। তাহার হৃদয়ের প্রদীপ্ত বহ্নিতে কে যেন জল ঢালিয়া দিল—তাহার অন্তরে যে টুকু সাহস এবং বৈরনির্য্যাতন-স্পৃহার সঞ্চার হইয়াছিল কে যেন তাহার গলা টিপিয়া ধরিল। লুপ্তপ্রায় সেই দিনের সেই ভয়াবহ স্মৃতি বিদ্যুদগ্নির মত তাহার নেত্রপ্রান্তে দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিবামাত্র সে সভয়ে কাঁপিয়া উঠিল। দীপালোকিত রুদ্ধদ্বার কক্ষে পত্নীর পার্শ্বে শয়ন করিয়াও সে রাত্রিতে সে নিদ্রাসুখ উপভোগ করিতে পারিল না।

পরদিন প্রভাত হইবামাত্র প্রকাশ তাহাদের বাটীর সম্মুখস্থ পথে একাকী পদচারণা করিতে করিতে ঐ সকল কথাই চিন্তা করিতেছিল। ঠিক সেই সময়ে প্রসন্ন তাহার ময়লা উত্তরীয়খান স্কন্ধে ফেলিয়া, তাহার লাঠির উপর ভর দিয়া ঐ পথে গ্রামান্তরে কোন কার্য্যে যাইতেছিল। নির্জ্জন পল্লিপথ। একটা পত্রবহুল বৃক্ষতলে উভয়ের সাক্ষাৎ হইল। মুহূর্ত্তের জন্য পরস্পরের মুখের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া উভয়েই দণ্ডায়মান হইল। তাহার পর প্রসন্ন আপন গন্তব্য পথে চলিয়া গেল।

প্রকাশ প্রস্তরমূর্ত্তির মত নিশ্চল হইয়া সেই স্থানেই দণ্ডায়মান রহিল। বজ্রাগ্নিস্পর্শে মহা মহীরুহের যেমন অবস্থা হয়,—তাহার শাখা পল্লব, সজীবতা, শ্যামল সম্পদ মুহূর্ত্তে যেমন পুড়িয়া ছাই হইয়া যায়—কেবল দগ্ধ কাটামোখানা লইয়া সে দাঁড়াইয়া থাকে, প্রকাশের অবস্থাও ঠিক সেইরূপ হইল। দিবাকরের কথায়—তাহার উৎসাহে, তাহার মনে যে সাহস, উদ্যম এবং প্রফুল্লতা গজাইয়া উঠিয়াছিল, এই এক নিমিষে সে সকল ধুইয়া মুছিয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া উবিয়া গেল। সেই কাল নিশী-,

খিনীর সেই ভয়াবহ কাহিনী স্মরণ করিয়া তাহার অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিল। যতক্ষণ তাহাকে দেখা গেল, কাষ্ঠপুত্তলিকার মত নিশ্চলভাবে দণ্ডায়মান হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার পর ধীরে ধীরে সে স্থান ত্যাগ করিয়া তাহার বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল।

ইহার পর দিবাকর কিম্বা গ্রাম্য মণ্ডলেরা শত চেষ্টা করিয়াও তাহাকে প্রকাশ্যভাবে প্রসন্ন বা জাহ্নবীর প্রতি কোনরূপ অত্যাচার করিতে প্রোৎসাহিত করিতে পারে নাই। সে স্পষ্টই বলিয়া দিয়াছিল, তোমরা পার চেষ্টা কর, আমি আর উহার মধ্যে থাকিব না।

প্রকাশ রঙ্গমঞ্চ হইতে সরিয়া গেল দেখিয়া, হরি চক্রবর্ত্তী, কমলা কান্ত, রাখাল, শিরোমণি মহাশয় এবং হরি বিশ্বাস প্রভৃতি গ্রামের মাতব্বরেরা, দিবাকরের সহিত মিলিত হইয়া হিন্দু ধর্ম্মের পুনরুদ্ধারে বদ্ধপরিকর হইলেন। এতদিন যাঁহারা নেপথ্যে ছিলেন, এইবার তাঁহারা মুখোস খুলিয়া রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইলেন। হিন্দুধর্ম্মের প্রতি তাঁহাদের মমত্ববোধ যতটা থাক আর না থাক, প্রসন্ন তাঁহাদিগকে উপেক্ষা করিয়া জাহ্নবীকে আশ্রয় দেওয়ায় তাঁহারা নিজেদের মহা অপমানিত মনে করিয়াছিলেন, এত দিনেও সেই অপমানের বহ্নিদাহ তাঁহারা বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। এইবার তাঁহারা জমিদারের নায়েবকে পুরোভাগে রাখিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

প্রকাশ দত্তের কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিলেও, প্রকাশ্যভাবে প্রসন্নর শত্রুতা করিতে কাহারও সাহস হইতেছিল না। তাহারা মুখে যত সাহস দেখাক, অন্তরে তাহাকে একটু ভয় করিত। কি জানি যদি তাহাদের উপরও সেইরূপ কোন অত্যাচার হয়। তাহার পর গ্রামের নিম্নশ্রেণীর যে সকল লোক, তাহারা সকলেই প্রসন্নর পক্ষপাতী হইয়া উঠিয়াছিল, এতদ্ভিন্ন প্রকাশ্যে তাহার উপর কোন অত্যাচার হইলে, সিদ্ধেশ্বর রায় কখনই বরদাস্ত করিবে না—ইহা তাহারা ভালরূপই জানিয়াছিল। এই সকল কারণে তাহাদের সঙ্কল্প সিদ্ধির বিলম্ব ঘটিতে লাগিল, তাহারা সুযোগের অপেক্ষায় রহিল।

এদিকে উপর্য্যুপরি দুই বৎসর সুবৃষ্টি না হওয়ায় সকল সংসারেই অল্পাধিক অন্নকষ্ট দেখা দিল। লোকে টাকা দিয়াও খাদ্যশস্য সংগ্রহ করিতে পারিতেছিল না। দরিদ্রের গৃহে হাহাকার পড়িয়া গেল। গ্রামে যাহাদের ধান্য মজুত ছিল, তাহারা আরও অধিক লাভের আশায় ধান্য বিক্রয় বা "বাড়ি" দেওয়া বন্ধ করিয়া দিল।

হরি বিশ্বাসের বহু টাকার ধান্য মজুত ছিল। লোকে টাকা লইয়া তাহার নিকট হাটাহাটি করিতে লাগিল—নিরন্ন দরিদ্র ইতরসম্প্রদায় ধান্য "বাড়ী" পাইবার প্রত্যাশায় নিরন্তর তাহার তোষামোদ করিতে লাগিল—ধানের দর আরও বাড়িলে মোটা টাকা লাভের আশায় হরি বিশ্বাস তাহাদের কাতর প্রার্থনায় কর্ণপাত না করিয়া নির্ম্মম হইয়া বসিয়া রহিল।

এই সকল হতভাগ্যের হাহাকারে প্রসন্ন বিচলিত হইয়া উঠিল। তাহাদের অভাব মোচন করিবার তাহার সামর্থ্য কোথায়? কয়েক জনের কষ্ট দেখিতে না পারিয়া একদিন প্রসন্ন কাঁদিয়া ফেলিল। একদিন সে পথে হরি বিশ্বাসকে দেখিতে পাইয়া কহিল,—"দাদা এই ক'টা লোক না খেতে পেয়ে মরে যাচ্ছে, এদের কিছু ধান ধার দাও—আমি তার জামিন থাকলাম। আসছে বছর ফসল হলে ওরা শোধ দেবে—আর যদি না দেয় আমি তোমায় দেড়া ধান দেব।"

হরি বিশ্বাস কুপিত হইয়া কহিল,—"ঠাকুর পাগলামো রাখ। তোমার নিজের কি করে চল্‌বে দেখ্‌গে, পরের ভাবনা তোমায় ভাবতে হবে না।"

অস্ত্র দুইখানা তাহার বক্ষস্থল ও কণ্ঠনালী লক্ষ্য করিয়া উদ্যত।

প্রসন্ন তথাপি বিস্তর অনুনয় করিল কিন্তু পাষাণ গলিল না। প্রসন্ন কহিল,—"দিলেই কিন্তু ভাল করতে। আহা হতভাগারা খেতে না পেয়ে শুকিয়ে মরবে।"

প্রসন্ন চলিয়া গেল। হরি বিশ্বাস ভাবিতে লাগিল, খোঁড়ার স্পর্দ্ধা ত কম নয়।

এই ঘটনার তিন চারি দিন পরে হরি বিশ্বাস রাত্রিতে আহারাদির পর তাহার দাওয়ায় শয়ন করিল। তাহার উঠানে দুইটা বড় বড় ধানের গোলা। দেশময় দুর্ভিক্ষ হওয়ায় প্রায় প্রতি রাত্রেই লোকের বাড়ী চুরি হইতেছিল। সেই জন্য সে একগাছি লাঠি পার্শ্বে করিয়া ঘরের দাওয়ায় শয়ন করিত। ঐ গোলায় বহু টাকার ধান্য মজুত—পাছে চুরি যায়, এই ভয়ে সে নিদ্রা যাইত না। রাত্রে পাঁচ ছয় বার উঠিয়া তামক খাইত এবং জাগিয়া বসিয়া থাকিত।

শুক্লপক্ষের রজনী। শুভ্র জ্যোৎস্নালোক তাহার গোলার উপর পড়িয়া হাসিতেছিল। সেই দিকে সতৃষ্ণনয়নে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে কখন তন্দ্রা-ঘোরে তাহার অক্ষিপল্লব নিমীলিত হইয়াছিল, সে কিছুই বুঝিতে পারে না। সহসা কিসের একটা শব্দে তাহার তন্দ্রা-বেশ ছুটিয়া যাইবামাত্র সে চমকিয়া উঠিল। চক্ষুরুন্মীলন করিবামাত্র যে দৃশ্য তাহার দৃষ্টিপথে পড়িল—তাহাতে তাহার শরীরের সমস্ত রক্ত জল হইয়া গেল। তাহার দুই পার্শ্বে দুই জন কে বসিয়া রহিয়াছে—তাহাদের হাতে দুইখানা শাণিত ছোরা চন্দ্রালোক-পাতে ঝক্ মক্ করিতেছে। অস্ত্র দুই খানা তাহার বক্ষস্থল ও কণ্ঠনালী লক্ষ্য করিয়া

উন্মত্ত। লোক দুইটার কি ভীষণ কদাকার মূর্ত্তি!

হরি বিশ্বাস ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। ভয়ে তাহার মুখ দিয়া একটী কথাও বাহির হইল না। বাঁশের লাঠি পাশেই পড়িয়া রহিল, তাহার দিকে হাত বাড়াইতে সাহসই হইল না।

সহসা উঠানে আসিয়া আর একজন দাঁড়াইল। সে লোকটা চতুর্দ্দিকে একবার দৃষ্টি সঞ্চালন করিয়া একটা ইঙ্গিত করিল। পর মুহূর্ত্তে তাহার বিস্তৃত প্রাঙ্গণ লোকে ভরিয়া গেল। তাহার পর যাহা ঘটিল, হরি বিশ্বাস তাহা আর চক্ষে দেখিতে পারিল না। তাহার বক্ষ শতধা বিদীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল কিন্তু মুখ দিয়া একটী কথাও বাহির হইল না।

লোকগুলো শুধু হাতে আসে নাই—কাহারও হাতে থলিয়া; কাহারও হাতে ঝুড়ি। মুহূর্ত্তে তাহারা ধানের গোলা ভাঙ্গিয়া, ধান্য লুণ্ঠন করিতে লাগিল। এক দল চলিয়া গেল, আর এক দল আসিল। অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে দুইটা গোলা নিঃশেষ করিয়া তাহারা প্রস্থান করিল। হরি বিশ্বাস ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল—লোকগুলা ক্ষুধার জ্বালায় তাহার বুকের রক্ত শুষিয়া লইয়া গেল। শেষে আর সে দেখিতে না পারিয়া সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িল।

তাহার স্ত্রী ঘরের মধ্যে থাকিয়া গবাক্ষপথে সকলই দেখিয়াছিল কিন্তু তাহারও চীৎকার করিতে সাহস হয় নাই। লুণ্ঠনকারীরা প্রস্থান করিলেও হরি বিশ্বাসের যখন কোন সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না, তখন তাহার স্ত্রী নিদ্রিত পুত্রকে জাগ্রৎ করিয়া বাহির হইল। চোখে মুখে জলের ঝাপ্টা দিয়া, মাথায় পাখার বাতাস করিতে করিতে বহুক্ষণের পর তাহার জ্ঞান হইল।

হরি বিশ্বাসের মুখ দিয়া প্রথম কথা বাহির হইল,—"গেছে তারা?"

তাহার স্ত্রী কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল,—"গেছে।"

তখনও তাহার রক্তহীন পাণ্ডুর মুখে আশঙ্কার চিহ্ন—কণ্ঠতালু শুষ্ক—বুক তখনও কাঁপিতেছিল। উঠানের দিকে বার বার সভয় দৃষ্টি সঞ্চালন করিতে করিতে সে উঠিয়া বসিয়া বুক চাপড়াইয়া কাঁদিতে লাগিল। তাহার পুত্র সান্ত্বনা করিয়া কহিল,—"চুপ কর বাবা! ধান আবার হবে, তোমায় যে খুন করে রেখে যায় নি, এই আমাদের জোর বরাত!"

কপালে করাঘাত করিয়া সে কহিল,—"ওরে সে যে ছিল ভাল! আমার দু গোলা ধান সব লুটে নিয়ে গেল! আমার বুক যে ফেটে যাচ্ছে! হায় এ কি হলো আমার!"

এত টাকার ধানের শোক সহ্য করিতে না পারিয়া হরি বিশ্বাস সমস্ত রাত্রি কাঁদিয়া অতিবাহিত করিল। প্রভাত হইবামাত্র বিশ্বাসবাড়ীর ডাকাতির সংবাদ গ্রামময় রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। দলে দলে লোক আসিয়া তাহার বাড়ী ভরিয়া গেল। তাহার অবস্থা দেখিয়া কাহারও চক্ষে জল আসিল, কেহ বা মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিল,—"বেশ হয়েছে!"

এই ঘটনা লইয়া দিন কতক গ্রামময় খুব আন্দোলন চলিল। গ্রামে পুলিশ আসিল, তদন্ত করিল কিন্তু চোর ধরা পড়িল না। এতগুলা ধান রাত্রির মধ্যে কোথায় উড়িয়া গেল, তাহার কোনই সন্ধান হইল না। গ্রামে আরও যাহাদের ধান্য মজুত ছিল—একটু সঙ্গতিপন্ন বলিয়া যাহাদের নাম ডাক ছিল, হরি বিশ্বাসের অবস্থা দেখিয়া ভয়ে তাহাদের প্রাণ উড়িয়া গেল। দুর্ভাবনায় দিবাভাগ এবং অনিদ্রা ও আশঙ্কায় রাত্রি অতিবাহিত হইতে লাগিল। প্রকাশ দত্ত বিজ্ঞের মত মাথা নাড়িয়া, বন্ধুবান্ধবদিগকে শুনাইয়া কহিল,—"দেখে নিও,

ঘোড়ার পেছনে যারা লেগেছে, তাদেরই ঐ দশা ঘটবে! হরি বিশ্বাস আজকাল বড় বাড়িয়েছিল—ঘোড়াকে জব্দ করবার জন্য দিনরাত ঘোঁট পাকিয়ে বেড়াত, ঠিক হয়েছে।"

কথাটা অনেকেরই মনে লাগিল। শিরোমণি মহাশয়, রাখাল চক্রবর্ত্তী প্রভৃতির দল, যাহারা টিকি নাড়িয়া হিন্দুয়ানি আর থাকিল না বলিয়া আক্ষেপ করিয়া বেড়াইত, এইবার চক্ষে অন্ধকার দেখিতে লাগিল। কথাটা যদি সত্য হয় এবং ইহার মূলে সত্যই যদি ঘোড়াটার কোন হাত থাকে, তাহা হইলে তাহাদের সর্ব্বনাশ যে এইবার অনিবার্য্য, তাহা তাহারা দিব্য চক্ষে দেখিতে পাইল। এইবার কাহার পালা—কে জানে? সকলেই কিন্তু ধন প্রাণ লইয়া মহা আতঙ্কিত হইয়া পড়িল।

যাহারা দিন কয়েক পূর্ব্বেও প্রসন্ন রায়ের জাতি গিয়াছে বলিয়া তাহাকে গালি পাড়িয়াছিল এবং সে গ্রামে বাস করিতেছে বলিয়া আপনাদিগকে অপমানিত এবং বিড়ম্বিত ভাবিয়া তাহাকে গ্রামছাড়া করিবার জন্য আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়াছিল, আজকাল তাহাদের মধ্যেই আবার অনেকে পথে ঘাটে প্রসন্নর সহিত সাক্ষাৎ হইলে, তাহার তোষামদ করিয়া আত্মীয়তা প্রকাশে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইল না। হরি চক্রবর্ত্তী একদিন তাহাকে ডাকিয়া কহিল,—"বাবা তোমার অবস্থা দেখে বড় কষ্ট হয়, যা হবার হয়ে গেছে, একটা প্রায়শ্চিত্ত করে ফেল, সব গোল মিটে যাবে।"

প্রসন্ন একটু হাসিল, কোন উত্তর করিল না। চক্রবর্ত্তী ঠাকুর পুনরায় কহিল,—"কি বল বাবা! তুমি এক-ঘরে হয়ে থাকবে সেটা কি ভাল। ছেলে মানুষ বুঝতে পার নাই—তুমি ত আমাদের পর নও। অটল দাদা আমাদের কত স্নেহ করতেন।"

প্রসন্ন কহিল,—"সে স্নেহের ঋণ ত আপনারা সুদে, আসলে শোধ দিচ্ছেন, তার জন্য অনুতাপ কেন? আর প্রায়শ্চিত্ত যদি কিছু করতে হয়, আপনারাই করবেন।"

হরি চক্রবর্ত্তীর বুকটা কাঁপিয়া উঠিল। মনে মনে কহিল,—"বেটা বলে কি!"

এই ঘটনার দুই দিন পরে পথে দৈবক্রমে হরি বিশ্বাসের সহিত প্রসন্নর সাক্ষাৎ হইল। হরি বিশ্বাস কহিল,—"ঠাকুর সে দিন তোমার কথা শুনলে আমার এ দশা হতো না। চোখের সামনে ধানগুলো সব লুটে পুটে নিয়ে গেল!"

প্রসন্ন কহিল,—"দাদা গরীবের কথা বাসি হলে চিরকালই মিষ্টি লাগে! যা'ক ধান ক'টার ওপর দিয়েই গেছে, তোমার বরাত জোর যে টাকা কড়িতে তারা হাত দেয় নাই।"

হরি বিশ্বাস কাঁপিয়া উঠিল। কি বলিতে যাইতেছিল কিন্তু সেই সময়ে কাঁদিতে কাঁদিতে বেষ্টা ডোম সেই স্থানে উপস্থিত হইল। তাহার গায়ে প্রহার চিহ্ন দেখিয়া ব্যথিতকণ্ঠে প্রসন্ন জিজ্ঞাসা করিল,—"কি হয়েছে বিষ্ণু দা, তুমি কাঁদছ কেন? তোমায় মারলে কে?"

সে চোখের জল মুছিয়া কহিল,—"নায়েব মশাই।"

প্রসন্ন। কেন?

বিষ্ণু। তোমার ঘর ছেয়েছি বলে।

প্রসন্ন। বটে! এতদূর!

তাহার চক্ষু হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে লাগিল। সে চোখের দিকে চাহিয়া হরি বিশ্বাস শিহরিয়া উঠিল। বিষ্ণু কহিল,—"শুধু তাই নয়, আবার পাঁচ টাকা জরিমানা করেছে। কোত্থেকে দোব রায় মশাই, আমার ঘরে যে একটা আধলা নেই!"

প্রসন্ন তাহার গায়ে হাত বুলাইয়া কহিল,—"কেন এ কি মগের মুলুক! এর কি কোন প্রতিকার নাই?"

বিষ্ণু। আমরা গরাব, কি ক'রব বল। হাতে পায়ে ধরে সাত দিন সময় নিয়েছি।

প্রসন্ন। আচ্ছা, এর মধ্যে যেমন করে পারি আমি তোমার টাকার যোগার করে দিচ্ছি।

বিষ্ণু। তুমি দেবে রায় মশাই?

প্রসন্ন। দোব বই কি দাদা—আমার জন্যই যে তোমার এই লাঞ্ছনা!

বিষ্ণু। তুমি গরীবের মা বাপ ঠাকুর! তোমার মত যদি সবার মন হ'তো!

এই ঘটনার পর ত্রিরাত্র অতিবাহিত হইল। চতুর্থ দিন প্রাতঃকালে সংবাদ পাইয়া দিবাকর তাহার পুকুরপাড়ে গিয়া দেখিল গত রাত্রে তাহার সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছে। গ্রামের উত্তর প্রান্তে তাহার একটা পুষ্করিণী ছিল—তাহাতে বহু টাকার মৎস্য মজুত ছিল। দিবাকর মনে মনে ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল, ঐ মৎস্যগুলি বিক্রয় করিয়া কন্যার বিবাহের ব্যয় নির্ব্বাহ করিবে। তাহার সে আশায় ছাই পড়িয়াছে—গত রাত্রে কাহারা মাছগুলি ছাঁকিয়া তুলিয়া লইয়া গিয়াছে। দিবাকর জমিদারের নায়েব—তাহার দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ, তাহার বিশ্বাস ছিল, কেহ তাহার জিনিসে হাত দিতে সাহস করিবে না, আজ তাহার সে গর্ব্ব পথের ধূলায় মিলাইয়া গেল।

দিবাকর সেইস্থানে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। যাহারা দুর্ব্বলের উপর অত্যাচার করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করে, তাহারা তখন ঐশ্বর্য্যগর্ব্বে ভুলিয়া যায়, তাহাদের উপর অনুরূপ অত্যাচার হইলে, তাহাদের অবস্থা কেমন হয়। নায়েবী পদে অবস্থিত হইয়া দিবাকর দরিদ্র প্রজার উপর উৎপীড়ন করিতে কোন দিন পশ্চাৎপদ হয় নাই, গরীবের চক্ষে দরবিগলিত তপ্ত অশ্রুধারা দেখিয়া কোন দিন তাহার হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হয় নাই, আজ তাহার দুঃখ দেখিয়াই বা লোকের চক্ষে জল আসিবে কেন? এই সংবাদ পাইয়া সেখানে যাহারা উপস্থিত হইয়াছিল, তাহারা প্রায় সকলেই মনে মনে একটা আনন্দানুভব করিতে লাগিল।

মাছের শোকে দিবাকর ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। এত বড় দুঃসাহসিক কার্য্যের যাহারা অনুষ্ঠাতা তাহাদিগকে ধরিবার জন্য দিন কতক চারিদিকে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইল কিন্তু কোনই ফল হইল না।

ইহার কয়েকদিন পরে, হাটের দিন প্রসন্ন মৌগাছার হাটে গিয়াছিল। দিবাকরও হাটে আসিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। প্রসন্ন তাহার সম্মুখে পড়িতেই দিবাকর জিজ্ঞাসা করিল,—"কি ঠাকুর হাটে কেন?"

প্রসন্ন কহিল,—"কেন আমার হাটে আসাও কি নিষেধ? হাটের জাত যাবে?"

দিবাকর পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল,—"তুমি আজ কাল এত টাকা পাচ্ছ কোথা? শুনলাম তুমি না কি বেষ্টা ডোমের জরিমানার টাকা দিতে চেয়েছ?"

প্রসন্ন উত্তর করিল,—"আমার জন্যই যখন তার এত লাঞ্ছনা তখন না দিয়ে কি করি। তা ছাড়া আজকাল আমার টাকার ভাবনা কি, চুরি-ডাকাতি করে বেড়াচ্ছি।"

দিবাকর। গুজব ত তাই। তা হলে আমার পুকুরের মাছও তুমি চুরি করেছ?

প্রসন্ন। আমি অত বোকা নই। শুধু মাছ নিয়ে চলে যেতাম না, তোমার টাকা-কড়ি আর গোলার ধান ক'টাও নিয়ে যেতাম।

দিবাকর। আমার সঙ্গে ঠাট্টা! তুই তা হলে চুরি করিস নি খোঁড়া?

প্রসন্ন। একটু সংযত হয়ে কথা কও। আমি গরীব, খোঁড়া হলেও ভদ্রসন্তান—বামুনের ছেলে, ভদ্রলোকের মত আমার সঙ্গে ব্যবহার কর।

সেখানে বহু লোক জমিয়া গেল। দিবাকর ক্রোধে জ্ঞান হারাইয়া চীৎকার করিয়া কহিল,—"তোর চোদ্দপুরুষে কেউ ভদ্র নয়! তুই ডাকাতের সর্দ্দার—চোর—বদমায়েস!"

প্রসন্নর চোখ মুখ লাল হইয়া উঠিল কিন্তু সংযত হইয়া কহিল,—"আমি বা আমার চোদ্দ পুরুষ ভদ্র হবে কেমন করে—কারণ তারা ত কেউ তোমার মত গরীবের বক্ত শুষে খায় নাই—বিনা দোষে প্রজার ঘর জালিয়ে দেয় নেই—আর লোকের ঝি বউ—"

বাধা দিয়া দিবাকর গর্জ্জিয়া কহিল,—"চুপ রও পাজি! ফের যদি কথা কইবি তোর ও পা'টাও খোঁড়া করে দেব, নগদি দিয়ে ধরে নিয়ে গিয়ে বুকে বাঁশ দিয়ে ডল্‌বো।"

প্রসন্নর চক্ষু দুইটা উল্কাপিণ্ডের মত জলিয়া উঠিল। সে কাঁপিতে কাঁপিতে কহিল,—"তা পার, তোমার অকার্য্য কিছুই নাই। তার পর তোমার গ্রামে, তোমার এলাকার মধ্যে এসেছি, এখন তুমি সব পার কিন্তু তার পর?"

দিবাকর পূর্ব্ববৎ চীৎকার করিয়া কহিল,—"কি শুনি তার পর? কি হবে আমার?"

প্রসন্ন তাহার লাঠি গাছটা মাটীর উপর ঠুকিয়া কহিল,—"কাল মৌগাছার লোক দেখবে তাদের নায়েবের মুণ্ডটা ঐ বাবলা গাছে ঝুলছে—আর ধরটা গো-ভাগাড়ে গড়াগড়ি যাচ্ছে।"

নায়েবের মুখখানা মুহূর্ত্তে কালিমাময় হইল—তাহার অজ্ঞাতে বুকটা কাঁপিয়া উঠিল। পীর-পুকুরের প্রকাশ দত্ত আর হরি বিশ্বাসের অবস্থাটা বিদ্যুৎদীপ্তির মতন তাহার চক্ষের সম্মুখে মুহূর্ত্তের মধ্যে ঝক্ মক্ করিয়া উঠিল। তাহার মুখ দিয়া সহসা কোন কথা বাহির হইল না। মুহূর্ত্ত পূর্ব্বের সে তর্জ্জন-গর্জ্জন—সে আস্ফালন সব যেন কোথায় মিশাইয়া গেল! জমিদারের প্রবলপ্রতাপ নায়েব অবাঙ্মুখে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। প্রসন্ন তাহার দিকে আর একটা বিদ্যুদ্বর্ষী কটাক্ষ হানিয়া ধীরে ধীরে হাট হইতে চলিয়া গেল।

তাহাকে প্রস্থান করিতে দেখিয়া নায়েবের যেন চমক ভাঙ্গিল। এতগুলো লোকের সমক্ষে ঐ খোঁড়াটা এই ভাবে তাহাকে শাসাইয়া যাওয়ায় তাহার আত্মসম্মানে বিষম আঘাত লাগিল। ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গের মত গর্জ্জিয়া কহিল,—"থাক, তোমার শ্রাদ্ধ করছি!"

হাটের জনতার মধ্যে দৌলতপুরের হারু সর্দ্দারও দাঁড়াইয়া ছিল, নায়েবের দুর্দ্দশা দেখিয়া তাহার অধরে এবং চোখের কোণে মুহূর্ত্তের জন্য একটুখানি কুটিল হাসি ফুটিয়া উঠিল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

এই দারুণ অন্নকষ্টের দিনে চারিদিকেই চুরি ডাকাতির সংখ্যা বাড়িয়া গিয়াছিল। ইহার মধ্যে নূতনত্ব কিছুই নাই। লোকের জঠরাগ্নি যখন জলিয়া উঠে—চক্ষের সম্মুখে এক মুষ্টি তণ্ডুল-কণার জন্য স্ত্রীপুত্র যখন হাহাকার করিতে থাকে, তখন স্বভাবতই মানুষের ধর্ম্মবুদ্ধি ক্ষীণ হইয়া পড়ে—বুভুক্ষু তখন আর পাপ-পুণ্যের বিচার করে না। পীরপুকুরে বা চতুষ্পার্শ্বর্ত্তী গ্রামসমূহে এই সময়ে কয়েকটা চুরি ডাকাতি হইয়াছিল—ইহা হয় ত সাধারণ নিয়মেই হইয়াছিল। কিন্তু প্রসন্ন রায়ের উপর যাহারা নির্য্যাতন করিয়াছিল, অথবা সেই
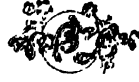
নির্য্যাতন-ব্যাপারে যাহাদের যোগাযোগ ছিল, তাহাদের দুই এক জনের বাড়ী ডাকাতি হওয়ায় অনেকে সিদ্ধান্ত করিয়া বসিয়াছিল, ইহার সহিত প্রসন্ন রায়ের সংস্রব আছে। এইরূপ জনরব রটিবার মূলে ছিল, প্রকাশ দত্তের সেই বিভীষিকাময় দুরবস্থার কথা। সে সময়ে যাহারা তাহার সে কথায় বিশ্বাস করে নাই, তাহাকে কতই বিদ্রূপ করিয়াছিল, তাহারাই এখন জোর গলায় সেই কথার সমর্থন করিতে লাগিল। সকলেই কাণাঘুষা করিতে লাগিল, প্রসন্ন রায় কোন ডাকাতদলের সর্দ্দার—তাহারই ইঙ্গিতে অথবা নেতৃত্বে এই সকল ডাকাতি হইতেছে। বিশেষতঃ হরি বিশ্বাস এবং নায়েব দিবাকর সরকারের ধান্য এবং মৎস্য লুণ্ঠিত হওয়ায় সেই ধারণা আরও লোকের মনে বদ্ধমূল হইল। কাকতালীয়বৎ এই ঘটনা সংঘটিত হইলেও সাধারণে ইহা অবিশ্বাস করিতে পারিল না।

ইহার মূলে কোন সত্য থাক আর নাই থাক, ইহা দ্বারা আপাতঃ দৃষ্টিতে প্রসন্নর অলাভ হয় নাই। সাধারণের নিকট তাহার প্রতিপত্তি খুব বাড়িয়া গেল। এখন আর কেহ তাহাকে অশ্রদ্ধা করে না বা কথায় কথায় চোখ রাঙ্গাইয়া তাহার আর একটা পা খোঁড়া করিয়া দিতে আসে না—বরং তাহার রক্ত চক্ষু দেখিলে, সকলেই শির নত করিয়া সরিয়া দাড়ায়। দরিদ্র—ঐ রায় মহাশয় আসিতেছেন বলিয়া সসম্ভ্রমে তাহার খোঁড়া পায়ের ধূলা লইয়া মাথায় দেয়, ধনী—তাহাকে দেখিলে আতঙ্কে কাঁপিয়া উঠে, তাহার প্রসাদ লাভের জন্য মিষ্ট কথায় তাহাকে সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা করে। শক্তির জয় সর্ব্বত্র। শক্তিমানের পদতলে চিরদিনই এমনই করিয়া লোকে শির নত করিয়া থাকে।

চোর ডাকাত বলিয়া প্রসন্নর দুর্নাম রটিলেও এবং লোকে ভয়ে তাহার চরণে ভক্তির অর্ঘ্য দিলেও, কেহ কোন দিন তাহার বাড়ীতে লুণ্ঠিত দ্রব্যের একটী কণাও দেখিতে পায় নাই, কিম্বা তাহার বৈষয়িক অবস্থার কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন সাধিত হয় নাই। এখনও তাহার সেই জীর্ণ পর্ণকুটীর—পরিধানে মলিন বসন—এখনও সে পূর্ব্বের ন্যায় একাহারী, নিরুপকরণ অন্নগ্রাস তৃপ্তির সহিত আহার করিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করে। সে যদি ডাকাতিই করে, লোকের ধন-ধান্য যদি লুটিয়াই লইয়া আসে, তবে সে সব যায় কোথায়? আর তাহার চারিদিকে মর্ম্মান্তিক দারিদ্রের এমন নিবিড় ছায়াই বা কেন? দুষ্ট লোকে বলে তাহার ঘরে মাটীর নীচে টাকার রাশি পোতা আছে—লোকের চক্ষে ধূলি দিবার জন্যই ঐরূপ ভাণ করিয়া বেড়ায়।

প্রকাশ্য হাটের মধ্যে প্রসন্ন রায় যখন তাল ঠুকিয়া জমিদারের নায়েবের সম্মুখে দাঁড়াইল তখন সে স্থানে ইতর-ভদ্র যাহারা উপস্থিত ছিল, ভয়ে বিস্ময়ে তাহারা অবাক হইয়া গিয়াছিল। তাহার পর প্রসন্ন যখন নায়েবের মুণ্ডটা বাবালাগাছে ঝুলাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিগ্বিজয়ী বীরের মত শির উচ করিয়া গর্ব্বভরে চলিয়া গেল, তখন তাহাদের আর বিস্ময়ের অবধি রহিল না। সকলেই মনে করিয়াছিল, এখনই হাটের মধ্যে একটা রক্তারক্তি কাণ্ড হইবে—নায়েবের হুকুমে তাহার লাঠিয়ালেরা তাহার হাড় কয়খানা গুঁড়া করিয়া দিবে কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে নায়েব মহাশয় যখন সারমেয়ের মত লাঙ্গুল গুটাইয়া রণে ভঙ্গ দিল, তখন তাহারা ঐ খোঁড়া মানুষটীকে বাহবা না দিয়া থাকিতে পারিল না।

সে দিন দিবাকরের মুখ হইতে একটী কথা বাহির হইলেই প্রসন্ন চূর্ণ হইয়া যাইত—তাহার রক্তাক্ত দেহ ঐ হাটের ধূলায় লুণ্ঠিত হইত কিন্তু সে দিন দিবাকরের মুখ হইতে একটী কথাও বাহির হয় নাই। তাহার প্রথম কারণ প্রসন্নর

অপরাজেয় মনোবল—সে দিবাকরের মত অত্যাচারী নায়েবের ভ্রূভঙ্গি দেখিয়া ভয় পায় নাই। লোকে অত্যাচারীর অত্যাচার নীরবে সহ্য করে, তাহার বিরুদ্ধে হস্তোত্তোলন করিতে সাহস করে না, তাই তাহারা অত্যাচারের উপর অত্যাচার করিয়া নিস্তার পায় কিন্তু যখনই প্রতিপক্ষ মুষ্টিবদ্ধ হইয়া রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করে, তখনই তাহারা দিবাকরের মত রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করে। জগতে চিরদিনই দৈহিক শক্তি মানসিক শক্তির পদতলে মস্তক নত করিতে বাধ্য হইয়াছে। দিবাকরের সে দিনের নীরবতার দ্বিতীয় কারণ, প্রসন্নর সেই সময়ের রুদ্রমূর্ত্তি এবং আস্ফালন। তাহার পশ্চাতে যদি কোন প্রবল শক্তি না থাকে, কি সাহসে সে তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া এত তেজ দম্ভ প্রকাশ করিতেছে? হয় ত ইহার বেশী বাড়াবাড়ি করিলে, তাহার বাড়ীতে ডাকাতি হওয়া কিছুই বিচিত্র নয়। যাহারা তাহার মাছ চুরি করিতে পারে, হরি বিশ্বাসের অত গুলা ধান্য লুটিয়া লইয়া যাইতে এবং প্রকাশ দত্তকে তাহার গৃহ হইতে শ্মশানে লইয়া সন্ন্যাসিনী করিতে পারে, তাহাদের পক্ষে তাহার মুণ্ডটা ছিঁড়িয়া বাবলাগাছে ঝুলাইয়া রাখা অসম্ভব নহে। এই সকল কথা বিদ্যুৎচমকের মত তাহার মনের মধ্যে উদিত হওয়ায়, তাহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল—কে যেন তাহার কণ্ঠ রোধ করিয়া ধরিল।

প্রসন্ন প্রস্থান করিল। হাটের সমবেত লোকগুলার সমক্ষে এই ভাবে অপমানিত হইয়া দিবাকর হাটে আর অধিকক্ষণ তিষ্ঠিতে পারিল না। লোকের কৌতূহলী দৃষ্টির অন্তরালে গিয়া সে যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। রোষে ক্ষোভে তাহার বুকটা পুড়িয়া ছাই হইতে লাগিল। নির্জ্জন কক্ষে বসিয়া এই বিষয় লইয়া মনে মনে যতই আন্দোলন করিতে লাগিল, ততই তাহার ভবিষ্যৎ ভাবিয়া সে আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিতে লাগিল। তাহার নায়েবী জীবনে এত বড় অপমান সে কখনই নীরবে বরদাস্ত করে নাই। তাহার মহালের মধ্যে এমন কোন প্রজা নাই, যে তাহার রক্ত চক্ষু দেখিয়া কাঁপিয়া উঠে না, আজ তাহাকে একটা পথের ভিখারী যদি এইরূপ লাঞ্ছিত করিয়া অক্ষতদেহে বাঁচিয়া থাকে, তবে তাহার বাঁচিয়া সুখ কোথায়?

দিবাকর ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। তাহার মত লোক যে নীরবে এ অপমান সহ্য করিবে না, অভিজ্ঞ যাহারা, তাহারা বুঝিয়াছিল। দেখা যাউক, কোন পথ ধরিয়া নায়েবের ক্রোধবহ্নি বহির্গত হয়। প্রসন্ন বায়ও যে এ কথা না জানিত তাহা নহে—তবে সে তাহার কার্য্যের জন্য কিছুমাত্র অনুতপ্ত বা ভীত হয় নাই। সেও সর্ব্বপ্রকার বিপদের জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিল।

পাঁচ সাত দিন নির্ব্বিবাদে অতিবাহিত হইল। গ্রামবাসীদের মধ্যে যাহারা প্রসন্নর পরিণাম ভাবিয়া উৎকণ্ঠিত হইয়াছিল, তাহারা অনেকটা নিশ্চিন্ত হইল কিন্তু পল্লীগ্রামের জমিদার, তাহার নায়েব গোমস্তা এবং আর এক শ্রেণীর জীবের সম্বন্ধে যাহাদের অভিজ্ঞতা আছে, তাহারা বুঝিয়াছিল, এ ব্যাপারের উপর এত সহজে যবনিকা পড়িবে না। লোককে কেমন করিয়া জব্দ করিতে হয়, এ বিদ্যাটা যাহাদের অস্থিমজ্জাগত, পরপীড়নে যাহাদের আনন্দ, লোকের সর্ব্বনাশ করিবার অবসর পাইলে যাহারা নাচিয়া উঠে, তাহারা যে এমন একটা অপমানের বহ্নিদাহ নীরবে সহ্য করিবে, ইহা কখনই সম্ভবপর নয়।

তাহাদের অনুমানই সত্য হইল। একদিন রাত্রিপ্রভাতে নির্ম্মেঘ নভোমণ্ডলে অশনির প্রলয় গর্জ্জন শুনিয়া পীরপুকুরের আবালবৃদ্ধনরনারী চম-

কিয়া উঠিল। সকলে সবিস্ময়ে এবং সত্রাসে দেখিল বহুসংখ্যক চৌকিদার, দফাদার এবং কনষ্টেবল সহ দারোগা গ্রামে প্রবেশ করিয়া প্রসন্ন রায়ের বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইতেছে। তাহার পশ্চাতে মৌগাছারা নায়েব দিবাকর সরকার, গোপীনাথপুরের অশ্বিনী হাজরা এবং সেই গ্রামের আরও কয়েকজন লোক। সহসা গ্রামের মধ্যে এই বিরাট পুলিশ-বাহিনীর অভিযানের কারণ কি কেহ বুঝিতে পারিল না কিন্তু নায়েব মহাশয়ের উপর যখন লোকের দৃষ্টি পড়িল এবং ঐ পুলিশ ফৌজ যখন প্রসন্ন রায়ের পর্ণ কুটীরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল, তখন সেই দিনের হাটের সেই কথা বিদ্যুৎ-চমকের মত তাহাদের মনে পড়ায় তাহারা শিহরিয়া উঠিল। আবার অনেকে ভাবিল, তাহাই যদি হয়, প্রসন্ন রায়কেই যদি গ্রেপ্তার করিবার আবশ্যক হইয়া থাকে, তবে এত পুলিশের সমাবেশ কেন? এ যে মশক মারিবার জন্য মেশিনগানের গোলা-বর্ষণ! যাহাকে ধরিয়া লইয়া যাইবার জন্য একজন চৌকিদারই যথেষ্ট, তাহাকে ধৃত করিবার জন্য এ কি বিরাট আয়োজন!

প্রসন্ন প্রাতঃকালে দরজা খুলিয়াই চমকিয়া উঠিল। সম্মুখেই দৌলতপুর থানার দারোগা ভবতারণ দত্ত—তাহার পশ্চাতে গ্রামের লোক কাতার দিয়া দাঁড়াইয়াছে—পুলিশ তাহার বাড়ীখানি বেষ্টন করিয়াছে। প্রসন্ন ইহার জন্য প্রস্তুত ছিল না, সুতরাং এই ব্যাপার দেখিয়া প্রথমটা থতমত খাইয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল, তাহার পর অদূরে দণ্ডায়মান দিবাকরের উপর দৃষ্টি পড়িবামাত্র এই আসন্ন বিপদেও তাহার অধরপ্রান্তে হাসির একটী ক্ষীণ রেখা ফুটিয়া উঠিল।

দারোগা অশ্বিনী হাজরার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"এই লোক কি?"

অশ্বিনী হাজরা অগ্রবর্ত্তী হইয়া কহিল,—"হাঁ হুজুর! এই সেই লোক।"

দারোগার শ্রীমুখ হইতে অমনি বাহির হইল;—"বাঁধ।"

সঙ্গে সঙ্গে দুই জন কনষ্টেবল আসিয়া প্রসন্নর হাত চাপিয়া ধরিল। অপর একজন একগাছা রশি বাহির করিয়া তাহার কোমরে বাঁধিল। প্রসন্ন জিজ্ঞাসা করিল,—"আমার অপরাধ?"

দারোগা কহিল,—"গুরুতর। ডাকাতির অপরাধে তোমায় গ্রেপ্তার করলাম। এই দেখ খানা-তল্লাসীর ওয়ারেণ্ট। চোরাই মাল কোথায় আছে বার করে দাও।"

প্রসন্ন ধীরস্বরে কহিল,—"আমি ডাকাতি করি, আপনি বিশ্বাস করেন দারোগা মশাই?"

দারোগা কহিল,—"তোমার বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ। তুমি শুধু ডাকাত নও—ডাকাতের সর্দার, আমার এলেকায় যতগুলো ডাকাতি হয়েছে, তার সঙ্গে তোমার যোগাযোগ আছে। আমি সংবাদ পেয়েছি তোমার বাড়ীতে বহু টাকার মাল লুকান আছে।"

প্রসন্ন একটু হাসিয়া কহিল—"উত্তম, অনুসন্ধান করে দেখুন।"

তখন দারোগা তাহার অনুচরগণের সহিত প্রসন্নর বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া, তাহার গৃহ লণ্ডভণ্ড করিয়া খানাতল্লাসী করিল কিন্তু সন্দেহজনক কোন দ্রব্যই পাওয়া গেল না। তখন একজন দফাদার কহিল,—"হুজুর! গহনা টাকাকড়ি ঘরের কোথাও পুঁতে রেখেছে।" দারোগা ঘরের মেজে খুঁড়িতে আদেশ দিল। প্রসন্ন কহিল,—"হুজুর! অনর্থক গরীবের ঘরখানা খুঁড়ে নষ্ট করবেন—প্রসন্ন রায় আর যাই হোক চোর ডাকাত নয়।"

দারোগা তাহাকে একটা ধমক দিয়া কহিল,—"তবে কোথায় আছে দেখিয়ে দাও।"

প্রত্যুত প্রসন্নর কোন কথাই গ্রাহ্য হইল না। তিন চারিজন চৌকিদার শাবল এবং কোদাল লইয়া প্রসন্নর গৃহ কোপাইতে আরম্ভ করিল। এই সময়ে সংবাদ পাইয়া সিদ্ধেশ্বর রায় তথায় উপস্থিত হইলেন এবং পুলিশের কার্য্য দেখিয়া বিস্ময় দমন করিতে না পারিয়া কহিলেন,—"দারোগা সাহেব এ সব কি? একটা অঙ্গহীন খোঁড়া দেশময় ডাকাতি করে বেড়ায় কি প্রমাণে বিশ্বাস করলেন?"

ভবতারণ হাসিয়া কহিল,—"খোঁড়ার কত গুণ এখনি জানতে পারবেন। তাকে ডাকাত বলে বহু লোক সনাক্ত না করলে আমি তার গায়ে হাত দিতাম না। আপনি এসেছেন ভালই হয়েছে, খানাতল্লাসীর সাক্ষীস্বরূপ উপস্থিত থাকুন।"

ঘরের মেঝে খুঁড়িয়া এক হাঁটু গর্ত্ত করিয়া ফেলিল কিন্তু তাহার মধ্য হইতে একটা আধলাও বাহির হইল না। সিদ্ধেশ্বর রায় উপস্থিত না হইলে কি হইত বলা যায় না কিন্তু তিনি কোন সন্দিগ্ধচরিত্রের লোককে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতে দিলেন না।

দারোগা তখন অশ্বিনী হাজরাকে ডাকিয়া কহিল,—"তোমার যে লোক প্রসন্ন রায়ের অনুসরণ করে এসেছিল, সে কোথা?"

অশ্বিনী হাজরা তাহাদের গ্রামের নিতাই চৌকিদার এবং প্রতিবেশী দুর্লভ মণ্ডলকে দেখাইয়া দিল। তাহারা দারোগার প্রশ্নে কহিল,—"আমরা হুজুর এই খোঁড়া ঠাকুরের পেছনে পেছনে এসে তার বাড়ী দেখে গিয়েছি।"

সিদ্ধেশ্বর রায় জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমরা সেই রাত্রে বামাল সমেত তাকে ধরলে না কেন?"

দুর্লভ মণ্ডল কহিল,—"সে কি আর একা ছিল মশাই—সঙ্গে পাঁচ ছ'জন লোক ছিল। তারা এই ঠাকুরকে বাড়ী পৌঁচে দিয়ে চলে গেল।"

সিদ্ধেশ্বর। তাদের চিনতে পার নাই?

দুর্লভ। না মশাই। একে অন্ধকার রাত, তাতে আমরা দূরে দূরে আসছিলাম।

সিদ্ধেশ্বর। তারা কোন বাড়ীতে গেল?

দুর্লভ। তারা এ গাঁয়ের নয়। আমরা নদীর ধার পর্য্যন্ত গিয়েছিলাম, আর যেতে আমাদের সাহস হলো না।

সিদ্ধেশ্বর। সে সব চোরাই মাল কোথায় গেল।

দুর্লভ। কেমন করে জানব, ঠাকুর কোথা লুকিয়ে রেখেছে।

এই সময়ে সেই দফাদার পুনরায় দারোগাকে কহিল,—"হুজুর! এ ঠাকুর ভারি ধড়িবাজ। ধরা পড়বার ভয়ে মালপত্র বোধ হয় বাড়ীর বাইরে কোথাও লুকিয়ে রাখে। আমি একদিন অনেক রাত্রে ঠাকুরকে ঐ পুকুর থেকে উঠতে দেখেছিলাম, তখন ত ঠাকুরের অত গুণাগুণ জানা ছিল না, কাজেই কোন সন্দেহ হয় নি। একবার জাল ফেলে দেখবো?"

দারোগা কহিল,—"দেখা উচিত। কারণ বামাল না পেলে মামলা টিকবে না।"

হরি বিশ্বাস পুকুরের ঘাটে কাঁটা দিয়া ইতিপূর্ব্বে প্রসন্নর ঘাটে নামিবার পথ বন্ধ করিয়া দিয়াছিল, তাহার পর তাহার বাড়ী ডাকাতি হইবার পর হইতে সে কাঁটাগুলি অপসারিত করিয়া লইয়াছিল এবং প্রসন্নকে ডাকিয়া তাহার পুকুরের জল ব্যবহার করিতে বলিয়াছিল। প্রসন্ন কিন্তু সেই অবধি সে পুকুরপাড়ে আর একদিনও যায় নাই।

দারোগার ইঙ্গিত পাইয়া দফাদার দুই তিন জন জালজীবীকে ডাকিয়া আনিল। তাহারা পুকুরের ধারে ধারে জাল ফেলিতে লাগিল। বহুক্ষণ ব্যর্থ প্রয়াসের পর অবশেষে একখানা জালে পিতলের একটা ছোট ঘটী উঠিল। তদ্দর্শনে পুলিশের উৎসাহ দশগুণ বাড়িয়া গেল। তাহারা মহোল্লাসে চীৎকার করিয়া উঠিল।

পুষ্করিণীতে অধিক জল ছিল না—বিশেষতঃ যে স্থান হইতে ঘটী উঠিল, তথাকার জল নিতান্ত অগভীর। দারোগা ভবতারণ কয়েক জন চৌকি-দারকে জলে নামিয়া অনুসন্ধান করিতে আদেশ করিল। অল্পক্ষণের মধ্যেই তাহারা জল হইতে একটা বড় পিত্তল কলস এবং আরও কয়েকটী দ্রব্য টানিয়া তুলিল। পিত্তল কলসের জল ঢালিয়া ফেলিবা মাত্র তাহার মধ্য হইতে নেকড়ায় বাঁধা কতকগুলি টাকা এবং এক ছড়া সোনার হার বাহির হইল। অশ্বিনী হাজরা কহিল,—"এ হার আমার মেয়েব—এ ঘড়াও আমার। আর সব জিনিস গেল কোথা ?"

দফাদার কহিল,—"সব বেরবে হাজরা মশায় সব বেরবে। সে সব অন্য ভাগে পড়েছে। এই বার মারের চোটে সব কবুল করবে।"

দারোগা প্রসন্নর দিকে বক্রদৃষ্টিতে চাহিয়া কহিল,—"বড় যে সাধুপনা করছিলে, এ সব কি ?"

প্রসন্ন কহিল,—"আমায় না জিজ্ঞেস করে, এখানে এমন লোক আছে, যাকে জিজ্ঞেস করলে সদুত্তর পাবেন।"

দফাদার ধমক দিয়া কহিল,—"থাম্ ধোঁড়া ! এইবার ভিরকুটি ভাঙ্গছি তোর। এইবার ভাল চাস ত বল আর সব জিনিস কোথা, আর তোর দলে কে কে আছে ?"

প্রসন্ন কোন উত্তর করিল না। দারোগা সিদ্ধেশ্বর রায়ের দিকে চাহিয়া কহিল,—"এইবার আপনার সন্দেহ ঘুচেছে ত ? ধোঁড়ার এইবার স্বরূপ পরিচয় পেয়েছেন ত ?"

সিদ্ধেশ্বর কহিলেন,—"দারোগা বাবু ! পুলিশের চাকরী করে আপনি চুল পাকিছেন, আপনাকে বেশী কথা আমি বলতে চাইনে, তবে এই মাত্র বলছি আমি এর এক তিলও বিশ্বাস করতে পারি না। প্রসন্ন আমার বাড়ীতেই মানুষ, আমি তাকে যতখানি জানি, ততটা জানবার আপনি সুযোগ পান নাই। সে যা হোক, আপনি আপনার কর্ত্তব্য পালন করুন, প্রসন্নকে অপরাধী বলে আপনার যখন বিশ্বাস হয়েছে, তখন তাকে চালান দিন।"

দারোগা। আপনি এখনও কি বল্‌তে চান সে নির্দ্দোষী ?

সিদ্ধেশ্বর। সহস্রবার ! আপনি দেখে নেবেন এ মামলা আদালতে টিকবে না।

দারোগা। বলেন কি আপনি ! এই সকল প্রমাণ সত্ত্বেও ?

সিদ্ধেশ্বর। কি প্রমাণ ? প্রসন্নর বাড়ীর নিকট পুকুর থেকে চোরাই মাল বার হয়েছে ? এর পূর্ব্বেও পুলিশ-চালানি এমন অনেক মামলা ফেঁসে গেছে। এ ত বাড়ীর বাইরে অপরের পুকুরে চোরাই মাল পেয়েছেন, এর পূর্ব্বেও তথাকথিত আসামীর ঘরের ভিতর হতে অনেক নিষিদ্ধ জিনিসও পুলিশ টেনে বার করেছিল। যা হোক্ ভবতারণ বাবু ! আমার শেষ অনুরোধ, আপনার হাতে ধরে মিনতি করছি, কবুল করাবার জন্য এই নিরীহ যুবকের উপর কোনরূপ পীড়ন করবেন না। ও যদি দোষী হয়, যা প্রমাণ পেয়েছেন, ওতেই ওর শাস্তি হবে।

দারোগা। না না, সে আশঙ্কা আপনার নাই। সে বিষয়ে আমি আপনাকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি"।

বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষু মুছিতে মুছিতে সিদ্ধেশ্বর চলিয়া গেলেন। এই নাটের গুরু যিনি, তিনি এ যাবৎ একটীও কথা কহেন নাই। এক পার্শ্বে নির্ব্বাক দর্শক-রূপে দণ্ডায়মান হইয়া তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে প্রত্যেক ঘটনাটী পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন। পুষ্করিণী হইতে লুণ্ঠিত মাল বাহির হইবামাত্র তাহার চোখে মুখে একটা পৈশাচিক আনন্দের দীপ্তি ফুটিয়া উঠিয়াছিল। সিদ্ধেশ্বর রায়ের মন্তব্য শুনিতে শুনিতে তাঁহার সে আনন্দজ্যোতিঃ কোথায় মিশাইয়া গেল—সে মুখে তাঁহার অজ্ঞাতে কে যেন এক পোঁচ কালি মাখাইয়া দিল।

অতঃপর পুলিশ এত বড় একটা ডাকাতির কিনারা করিয়া বিজয়োল্লাসে বুক ফুলাইয়া বামাল সহিত ডাকাত সর্দ্দার প্রসন্ন বাবুকে বাঁধিয়া লইয়া থানার অভিমুখে রওনা হইল। গ্রামের লোক এই কাণ্ড দেখিয়া ভয়ে বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া রহিল। যাহারা সরল প্রকৃতি, লোকচরিত্রে অনভিজ্ঞ, তাহারা খোঁড়া ঠাকুরের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া শিহরিয়া উঠিল। সুচতুর বুদ্ধিমান যাহারা এই ব্যাপারের অন্তরালে কোন লীলাময়ের লীলা প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে তাহার আভাস পাইয়া ইঙ্গিতপূর্ণ দৃষ্টিতে পরস্পরের দিকে চাহিল। মোট কথা প্রসন্নর এই আকস্মিক বিপদে কেহ উল্লাসে হাসিয়া উঠিল—কেহ অন্ততঃ কিছু দিনের জন্য আপদের শান্তি হইবে ভাবিয়া আশ্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিল—আবার কাহারও চক্ষে শতধারা ঝরিল।

আর জাহ্নবী? সে কোথায়? আহা সে অভাগিনী এই বিনা মেঘে বজ্রাঘাতে ছিন্নপক্ষ কপোতীর মত ধূলায় পড়িয়া লুণ্ঠিত হইতেছে। প্রথমে পুলিশ দেখিয়া ভয়ে সে প্রায় মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার পর দারোগার আদেশে প্রহরীরা যখন প্রসন্নকে বন্ধন করিল, তখন সে হাহাকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। একজন কনষ্টেবল তাহাকে একটা ধমক দেওয়ায়, সে সেই যে উঠানের এক পার্শ্বে গিয়া বসিয়া পড়িয়াছিল, আর সে সেখান হইতে উঠে নাই—উঠিতে পারে নাই। প্রসন্নর মুখের দিকে চাহিয়া তাহার বুক ফাটিয়া যাইতেছিল, অথচ মুখ ফুটিয়া একটী কথাও বলিতে তাহার সাহস হইতেছিল না। হায় ভগবান! এ কি করিলে? বিনা দোষে নির্দ্দোষীর শিরে তোমার এ ভীষণ বজ্র কেন নিক্ষেপ করিলে?

কাঁদিয়া কাঁদিয়া জাহ্নবী চক্ষু ফুলাইল। তাহার সেই অশ্রুপ্লাবিত মুখের দিকে চাহিয়া অনেকেরই চক্ষের জল রোধ করিয়া রাখা দায় হইয়া উঠিল কিন্তু সেখানে এমন দুই চারিজন লোকও ছিল, যাহারা মুখ টিপিয়া মনের আনন্দে হাসিতেছিল; অথচ অনাথা বিধবা—এই নিরাশ্রয়া, সর্ব্বস্বহারা অভাগিনী কখনো কোন দিন তাহাদের কোন অনিষ্ট করা ত দূরের কথা, তাহাদের অশুভ কামনাও করে নাই। হায়! এই সব লোক আবার জনসমাজে আপনাদিগকে শিক্ষিত ভদ্রসন্তান বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়া গর্ব্বানুভব করে!

অবশেষে পুলিশের লোক যখন প্রসন্নকে বাঁধিয়া টানিয়া লইয়া গেল, জাহ্নবী চক্ষে দশদিক অন্ধকার দেখিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। তথায় যে সকল নীচজাতীয়া দরিদ্ররমণীরা উপস্থিত ছিল, তাহারাও চোখের জল মুছিতে মুছিতে তাহাকে কতই সান্ত্বনা দিতে লাগিল। অভাগিনী উন্মাদিনীর মত ছুটিয়া বাহির হইতে যাইতেছিল, ঠিক সেই সময়ে ছমির আসিয়া তাহার পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইল। তাহার গণ্ড বহিয়া দরবিগলিত ধারা ছুটিতেছিল।

জাহ্নবী তাহাকে দেখিয়া সেই স্থানে পড়িয়া লুটাইয়া লুটাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

ছমির কহিল,—"কাঁদিস না মা! কেঁদে আর কি করবি! দাদা যাতে খালাস পায় আমি তার চেষ্টা দেখছি।"

জাহ্নবী কাঁদিয়া কহিল,—"কি হবে বাবা ছমির! কি করে আমি বাড়ীতে থাকবো—আমার বুক যে ফেটে যাচ্ছে বাবা।"

আশ্বাস দিয়া ছমির কহিল,—"ভয় কি মা! আমিও তোর ছেলে, দাদা যত দিন না ফিরে আসে আমি তোকে দেখবো! লাঠি হাতে করে এই দরজায় বসে থাকবো, কার সাধ্য তোমার অনিষ্ট করে! খোদাকে ডাক মা এ বিপদ থাকবে না। দেখে নিস দাদা আমার হাস্‌তে হাস্‌তে বাড়ী আসবে।"

সে দিন আর জাহ্নবী জলস্পর্শ করিল না। ছমির কত বুঝাইল, কত আশ্বাস দিল, তথাপি জাহ্নবীকে আহার করাইতে পারিল না। সন্ধ্যার পূর্ব্বে ছমির তাহার ভগিনীকে সঙ্গে লইয়া আসিল। সে দাওয়ার এক পার্শ্বে শুইয়া রহিল—জাহ্নবী অপর পার্শ্বে পড়িয়া থাকিল, কারণ পুলিশের লোক ঘরের মেঝে এমন ভাবে খুঁড়িয়া গর্ত্ত করিয়া রাখিয়া গিয়াছে যে, তাহার মধ্যে প্রবেশ করাই কষ্টসাধ্য। ছমির সদর দরজা বন্ধ করিয়া, তাহার পার্শ্বে এক-খানা কম্বল বিছাইয়া শয়ন করিল। বলা বাহুল্য, ছমিরই এখন তাহায় রক্ষক হইয়া, তাহার তত্ত্বাবধান করিতে লাগিল। আর তাহার স্বজাতি—যাহারা হিন্দুয়ানির গর্ব্ব করিয়া আকাশ-বাতাস কম্পিত করিয়া বেড়ায়, তাহারা এ দুর্দ্দিনে একবার উঁকি মারিয়াও দেখিল না, কেমন করিয়া এই নির্য্যাতিতা দুঃখিনী বিধবার দিন কাটিতেছে! (ক্রমশঃ)

ডায়মণ্ড হারবার রোডের পথিপার্শ্বের দৃশ্য।

গল্প

ফাল্গুনে

শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিদ্যাবিনোদ, এম-এ

(১) কল্পারম্ভ

ফাল্গুনে হয় শীতের অন্ত, শুভাগমন করেন নব বসন্ত, কাননে কোকিল ডাকে কুহু কুহু, মৃদুমন্দ মলয় সমীরণ বহে শন্ শন্, তাই তোমাদের কাছে ফাল্গুনের এত আদর। আমি যখন তোমাদের মত যুবা ছিলাম,—যখন প্রাণটা একটা অজানা ভবিষ্যৎ জীবনের কাল্পনিক সুখের গোলাপী নেশায় ভরপুর ছিল, যখন সংসাররূপ 'দিল্লিকা লাড্ডু' না খাইয়া পস্তাইতেছিলাম, যখন 'তাপদগ্ধ জীবনের ঝঞ্ঝা-বায়ু-প্রহারে' বিধ্বস্ত হইতে হয় নাই,—তখন আমিও তোমাদের মত ফাল্গুনের একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলাম। থাকিব না কেন? এই ফাল্গুনেই ত কি যেন একটা নূতন ভাবাবেশের সোণার কাঠির স্পর্শে আমার সুপ্ত প্রাণটা হঠাৎ জাগিয়া উঠিয়াছিল, যে জাগরণের স্পন্দন আজিও এই প্রৌঢ় বয়সে সুদূরাগত বাঁশীর রবের মত অতি মৃদুস্বরে কাণে বাজিতেছে! তবে আজ আর তাহাতে সে জগৎ-ভুলান উন্মাদনা নাই—আছে শুধু একটা অবসাদ—একটা ক্ষীণ বিষাদের স্মৃতি।

যে সমুদ্র হইতে অমৃত উত্থিত হইয়াছিল, সেই সমুদ্র হইতেই গরল উঠিয়াছিল। যাহার অদৃষ্ট ভাল, সে অমৃত লাভ করিল। যাহার অদৃষ্ট মন্দ, তাহাকে গরল লইয়াই সন্তুষ্ট হইতে হইল। যখন আমার সময় ভাল ছিল, তখন এই ফাল্গুনই আমাকে অমৃতে অভিষিক্ত করিয়াছিল; আবার যখন সময় খারাপ হইল, তখন এই ফাল্গুনেরই হলাহল অসহ্য হইয়া উঠিল। যদি একটু ধৈর্য্য ধারণ কর, তাহা হইলে সব কথা খুলিয়া বলি।

(২) যৌবন

উচ্চ ইংরাজি স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়িতাম। বয়স ১৫ কি ১৬ বৎসর। ভাল ছেলে বলিয়া খ্যাতি ছিল সকল পরীক্ষাতেই প্রথম স্থান অধিকার করিতাম। আচার ব্যবহারেও খুব নম্র ও বিনয়ী ছিলাম, সুতরাং ছোট বড় সকলেরই ভালবাসার অধিকারী হইয়াছিলাম। কিন্তু বয়সটা ছিল খারাপ সঙ্গ দোষে মজিলাম। কুসুমে কীট প্রবেশ করিল। নানাবিধ পাপসঙ্কল্প আসিয়া হৃদয় অধিকার করিল এবং সেই সব সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিবার উদ্যোগ আয়োজনও চলিতে লাগিল। জানি না ইহার পরিণাম কি হইত,—কিন্তু এই সময় একদিন একটা অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটিয়া আমার জীবনের গতি পরিবর্ত্তিত করিয়া দিল।

সে দিন শনিবার। তারিখটাও মনে আছে—১৫শে ফাল্গুন, ইং ৯ই মার্চ্চ। অন্যান্য দিনের মত সে দিনও বৈকালে নানারূপ কুৎসিত বিষয়ের চিন্তা করিতে করিতে স্কুল হইতে বাটী আসিলাম। কিন্তু আজ বাটীতে প্রবেশ করিয়াই এ কি দৃশ্য দেখিলাম! দেখিলাম প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া—এক অপূর্ব্ব রমণী মূর্ত্তি। এ কি মানবী, না দেবী? এমন রূপ ত কখনও দেখি নাই! দেখিলাম, রূপের প্রভায় শুধু,

বাড়ীখানা নয়, আমার কলুষিত হৃদয়ের ঘোরতমসাচ্ছন্ন গহ্বরটা পর্য্যন্ত আলোকিত হইয়া উঠিয়াছে। মুহূর্ত্তের দৃষ্টিতে নরককে স্বর্গে পরিণত করিয়া দিতে পারে এমন জিনিসও পৃথিবীতে আছে,—এ জ্ঞান আমার পূর্ব্বে ছিল না, সেই দিন প্রথম লাভ করিলাম। রমণীর দিকে মুগ্ধদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলাম,—হৃদয়ের পাপপ্রবৃত্তি কোথায় উড়িয়া গেল—সম্ভ্রমে মাথা নত হইয়া পড়িল। রমণীও একবার আমার দিকে চাহিলেন—সে দৃষ্টি সরল ও অকুণ্ঠিত। অনুমানে বোধ হইল, তাঁহারও বয়স ১৫।১৬ বৎসর হইবে! সীমন্তে সিন্দূর-রেখা জল্ জল্ করিতেছে। মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম, কে এ রমণী? ইহাকে ত পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই।

কৌতূহল বেশীক্ষণ চাপিয়া রাখিতে পারিলাম না। সন্ধ্যার সময় দিদিকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম, মেয়েটি পাশের বাড়ীতে আসিয়াছে, ওবাড়ীর বৌএর ছোট বোন্, দূর সম্পর্কে আমাদেরও ভগিনীস্থানীয়া, পূর্ব্বে আরও ২।৩ বার আসিয়াছিল। ইহাও জানিতে পারিলাম যে, মেয়েটি দিদির খুব অনুগত, এবং এখানে আসিলে প্রায় চব্বিশ ঘণ্টাই দিদির নিকট থাকে। সন্ধ্যার পরই এ কথার যাথার্থ্য প্রমাণিত হইল। দিদি তখন রন্ধনশালায় ছিলেন,—মেয়েটি আসিয়া গল্পের আসর জাঁকাইয়া বসিল। আমার পড়া শুনা শেষ হইলে রন্ধনশালায় আহার করিতে গেলাম। দিদি অমলার উপর (মেয়েটির নাম অমলা) পরিবেশনের ভার দিলেন। অমলার হাস্যপ্রফুল্ল বদন এবং নিঃসঙ্কোচ ব্যবহার দেখিয়া তাহার সহিত আলাপ করিবার অত্যন্ত ইচ্ছা হইল ; কিন্তু পূর্ব্বে কখনও জানাশুনা ছিল না—লজ্জা আসিয়া বাধা দিল। কিন্তু অমলা অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই আমার এই বিপদ্ বুঝিয়া লইয়া স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আমার সহিত বাক্যালাপ করিয়া আমায় অকূল সাগরে কূল দিল। কি সুমিষ্ট তাহার কণ্ঠস্বর! জীবজগতে বা বাদ্যজগতে এমন কোন সুস্বর আজ পর্য্যন্ত খুঁজিয়া পাইলাম না, যাহার সহিত সেই স্বরের তুলনা হইতে পারে। সেই অপূর্ব্ব স্বরলহরী আমার কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়া আমার শিরায় শিরায় আনন্দের তড়িৎপ্রবাহ ছুটাইয়া দিল,—সে আনন্দের মধ্যে উদ্দীপনা মোটেই ছিল না, ছিল একটা বিমল তৃপ্তি, একটা স্বর্গীয় প্রীতি, কোন্ এক অজানা জগতের একটা অনির্ব্বচনীয় অনুভূতি। জানি না, "অনন্ত সমুদ্রের জনহীন তীরে" কপালকুণ্ডলার মুখোচ্চারিত সেই আশ্বাসের বাণী—"পথিক, তুমি পথ হারাইয়াছ?"—কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় নবকুমারের প্রাণে এমন স্বর্গীয় সুধা ঢালিয়া দিতে পারিয়াছিল কি না। বাইশ বৎসর পূর্ব্বের ঘটনা,—কিন্তু মনে হইতেছে যেন এখনও বাইশ দিন হয় নাই।

দিদির নিকট শুনিলাম,—অমলা যখনই এখানে আসে, তখনই, তাহাদের বাটীতে স্থানাভাববশতঃই হউক বা দিদির প্রতি অত্যধিক আনুরক্তিবশতঃই হউক, রাত্রিতে দিদির নিকট শয়ন করে। আজও এনিয়মের ব্যতিক্রম হইল না। রাত্রিতে গল্পের আসর ভাল করিয়াই জমিল! রাক্ষস খোক্কস ও ভূত পেত্নী হইতে আরম্ভ করিয়া পল্লীসংস্কার ও মশক-সংহার পর্য্যন্ত কোন বিষয়ই আমাদের আলোচনা হইতে বাদ পড়িল না। এই সব আলোচনার ভিতর দিয়া অমলার হৃদয়ের যত ঘনিষ্ঠ পরিচয় পাইতে লাগিলাম, ততই তাহার প্রতি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। দেখিলাম, বিধাতা অমলাকে শুধু অলৌকিক রূপলাবণ্যের অধিকারিণী করেন নাই, পরন্তু তাহার অন্তরটাকে বাহির অপেক্ষাও অধিক সুন্দর করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। অমলা বিদুষী

না হইলেও চলনসই লেখাপড়া জানিত, সুতরাং তাহার সহিত পল্লীগ্রামের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সমাজ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া সবিশেষ প্রীতিলাভ করিলাম।

সে সময় স্বদেশী আন্দোলনের খুব ধুম পড়িয়াছিল! স্কুলের ছাত্রগণ ধ্বজা উড়াইয়া 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে রে ভাই,' 'জাগ রে জাগ রে ভারত সন্তান,' 'কতকাল পরে বল ভারত রে,' 'একবার তোরা মা বলিয়ে ডাক্' প্রভৃতি স্বদেশী-গান গাইয়া রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইত। আমি একখানি খাতা করিয়া তাহাতে এইরূপ কয়েকখানি গান মুখস্থ করিবার উদ্দেশ্যে লিখিয়া রাখিয়াছিলাম। অমলা একসময় আমার অজ্ঞাতসারে খাতাখানি গ্রেফ্‌তার করিয়াছিল, এখন আব্দার ধরিল, গানগুলি তাহাকে লিখিয়া দিতে হইবে। আমিও 'তথাস্তু' বলিয়া সানন্দে তাহার আব্দার রক্ষা করিলাম।

তখন আমাদের স্কুলে নবপ্রতিষ্ঠিত ডিবেটিং ক্লাব খুব জোরে চলিতেছে। আমার উপর 'দেশের অবস্থা' সম্বন্ধে একটি কবিতা লিখিবার ভার ছিল। একখানি খাতায় কবিতাটির খস্‌ড়া করা ছিল—সময়ান্তরে নকল করিব এইরূপ মতলব ছিল। সে খাতাখানিও অমলার তীক্ষ্ণদৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারিল না—খাতাখানি লইয়া তাহার পাতা উল্টাইয়া অমলা আমার কবিতাটি বাহির করিয়া একাগ্রচিত্তে পাঠ করিল, এবং সেটিও নকল করিয়া দিতে হইবে বলিয়া হুকুম জারি করিল। বলা বাহুল্য, আমি পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর আনন্দে এই প্রস্তাবে সম্মত হইলাম, কেন না আমার মত লেখকের লেখার পাঠক বা সমজ্দার বড় একটা মিলিত না।

রাত্রি প্রায় আড়াই প্রহর পর্য্যন্ত লেখাপড়া ও গল্পগুজব চলিল। অবশেষে দাশুরায়ের পাঁচালি হইতে দুই চারিটা বাছাই বাছাই গান নকল করিয়া দিয়া তবে নিস্তার পাইলাম। সভাভঙ্গের সময় স্থির হইল, পরদিন আরও কয়েকখানি ভাল ভাল স্বদেশী গান লিখিয়া দিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে অমলা তাহার একটি ভাল কলম আমার জিম্মায় রাখিয়া দিল।

পরদিন (২৬শে ফাল্গুন) রবিবার ছিল,—দুপুরে আহারাদির পর অমলা বেড়াইতে আসিল। দুইজনে বসিয়া কতকগুলি স্বদেশী গান বাছিয়া রাখা হইল, রাত্রিতে ধীরে সুস্থে সেগুলি লিখিয়া দেওয়া যাইবে। কিন্তু তখন কে জানিত যে আমাদের উভয়ের মনের এই ইচ্ছা চিরকালের জন্য মনেই রহিয়া যাইবে, কখনও তাহা কাজে পরিণত হইবে না? রবিবার সন্ধ্যার সময় একটু ঝড়বৃষ্টি হইল—সুতরাং অমলা আসিতে পারিল না। ঝড়বৃষ্টি থামিলে সংবাদ লইয়া জানিলাম, অমলা ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, সেদিন আর আসিবে না।

পরদিন (সোমবার) সকালে অমলা হঠাৎ আমার পাঠাগারে আসিয়া উপস্থিত হইল। একবার মনে করিলাম, অমলা পূর্ব্বদিন তাহার কথা রাখে নাই, সেইজন্য রাগ করিয়া গম্ভীর হইয়া থাকিব, কথা কহিব না। কিন্তু অমলার স্মিত সদাহাস্যময়ী লক্ষ্মীপ্রতিমার আবির্ভাবে আমার সে সঙ্কল্প এক মুহূর্ত্তও টিকিল না,—আমি তাহার সহিত গল্প জুড়িয়া দিতে বাধ্য হইলাম। একথা সে কথার পর অমলা বলিল, "কাল বৃষ্টির জন্য আসিতে পারি নাই - আজ নিশ্চয়ই আসিব এবং গানগুলি লিখিয়া লইব।" কিছুক্ষণ পরে অমলাকে চলিয়া যাইতে দেখিয়া আমি বলিলাম, "ইন্‌স্পেক্টর স্কুল দেখিয়া মন্তব্য লিখিয়া যায়,—তুমি আমার পড়িবার ঘর দেখিয়া কোনও মন্তব্য প্রকাশ করিলে না যে?" অমলা মুখ ফিরাইয়া

একটু হাসিয়া বলিল, "বেশ—বিউটীফুল (beautiful)"

সোমবার বৈকালে স্কুল হইতে আসিয়া শুনিলাম, অমলার শ্বশুরের অকস্মাৎ কঠিন অসুখ হওয়ায় সেখান হইতে গাড়ী আসিয়া একটু পূর্ব্বে অমলাকে লইয়া চলিয়া গিয়াছে।

অমলার নিকট প্রতিশ্রুত ছিলাম, তাহাকে আরও গোটা-কয়েক গান লিখিয়া দিব। কিন্তু সে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিতে পারি নাই। তাহার সেই কলমটি এখনও আমার নিকট রহিয়াছে—সেটির নাম দিয়াছি 'সোণার কলম।' মনে করিতাম, একদিন না একদিন অমলার দেখা পাইব, অন্ততঃ চেষ্টা করিয়াও দেখা করিব, এবং তাহার ঈপ্সিত গানগুলি লিখিয়া দিয়া তাহার কলম তাহাকে ফিরাইয়া দিব। কিন্তু বিধাতা এ জীবনে আর সে সুযোগ দিলেন না। অমলা আর ইহজগতে নাই। কিছুদিন পূর্ব্বে সংবাদ পাইয়াছি, পুণ্যবতী সতী তাহার পৃথিবীর কর্ত্তব্য শেষ করিয়া সাধনোচিত ধামে চলিয়া গিয়াছে।

অমলা আমার কেহই নহে। জীবন-পথে চলিতে চলিতে মাত্র তিনটী দিনের জন্য তাহার সহিত আমার দেখা হইয়াছিল,—সেই দেখাই প্রথম এবং তাহাই শেষ। অথচ এই তিন দিনের দেখাতেই মনে হইয়াছিল, যেন সে আমার কত দিনের পরিচিত, আত্মীয় অপেক্ষাও পরমাত্মীয়। তাহার পুণ্যপ্রভায় আমার আঁধার-হৃদয় আলোকিত হইয়াছিল,—তিনটি দিনের জন্য তাহার সংস্পর্শে আসিয়া যে শিক্ষালাভ করিয়াছিলাম, জীবনে তাহার মূল্য বড় কম নহে,—অমলার নিকট যে উপকার পাইয়াছি, জীবনে তাহা ভুলিব না,—অমলাই আমাকে নরকের পথ হইতে ফিরাইয়া স্বর্গের পথে লইয়া আসিয়াছিল। আমার জীবনের সেই ভীষণ সন্ধিক্ষণে যদি অমলার আবির্ভাব না হইত, তাহা হইলে আমার জীবনের যে কি ভীষণ পরিণতি হইত তাহা কল্পনায়ও আনিতে পারি না। এক কথায় বলিতে গেলে, ফাল্গুনের সেই বাসন্তী নিশিতে অমলাই আমাকে নবজীবন দান করিয়াছিল। অমলার ঋণ আমি সারা জীবনে শুধিতে পারিব না—যতদিন বাঁচিব, ততদিন তাহার পুণ্যস্মৃতি আমার হৃদয়ে জাগরূক থাকিবে।

(৩) প্রাণপ্রতিষ্ঠা

অমলার পূত-চরণরেণুস্পর্শে যেদিন আমি পবিত্র ও ধন্য হইলাম, তাহার ঠিক আট বৎসর পরে আর এক ফাল্গুনে আমার জীবন-নাটকের এক নূতন অঙ্কের অভিনয় আরম্ভ হইল। আট বৎসর পূর্ব্বে অমলার সহিত আলাপ করিয়া বুঝিয়াছিলাম, এ জগতে এমন একটা অলৌকিক বস্তু আছে, যাহার সংস্পর্শে আসিতে পারিলে মানুষ দেবতা হইয়া যায়, যাহার অধিকারী হইতে পারিলে মানুষ সহস্র দুঃখের মধ্যেও আপনাকে পরম সুখী মনে করে। এই আট বৎসরের মধ্যে অনেকবার অনেক প্রলোভনের মধ্যে পড়িয়াছি, অনেকবার পদস্খলনের উপক্রম হইয়াছে, কিন্তু অমলার পুণ্যস্মৃতি সকল সময়েই আমাকে রক্ষা-কবচের মত রক্ষা করিয়াছে। "কখনও বিপথে যদি ভ্রমিতে চাহে এ হৃদি, অমনি ও মুখ হেরি' (আমার বেলায় অবশ্য 'হেরি' নয়, 'স্মরি') সরমে সে হয় সারা"—এ কথার যাথার্থ্য বর্ণে বর্ণে উপলব্ধি করিয়াছি। আট বৎসর পূর্ব্বে কল্পনায় একটা জিনিসের আভাসমাত্র পাইয়াছিলাম, আট বৎসর পরে কল্পনা বাস্তবে পরিণত হইল, সেই অলৌকিক বস্তুটী একান্ত নিবিড় ও নিজস্বভাবে অনুভব করিলাম। মলয়ানিল-সেবিত কোকিলকূজন-

মুখরিত ফাল্গুনের এক মধুযামিনীতে এক দ্বাদশ বর্ষীয়া কিশোরীকে জীবনসঙ্গিনীরূপে লাভ করিয়া দাম্পত্য প্রণয়রূপ অপার্থিব সম্পদের অধিকারী হইয়া ধন্য হইলাম,—আমার শূন্য হৃদয় পূর্ণ হইল, —নিখিল বিশ্ব আমার নিকট মধুময় হইয়া উঠিল।

সংসারে সুখও আছে, দুঃখও আছে। সুতরাং আমার ত্রয়োদশবর্ষব্যাপী দাম্পত্যজীবন অবিমিশ্র সুখে কাটে নাই, একথা বলাই বাহুল্য। রোগ, শোক, অর্থাভাবজনিত দুশ্চিন্তা, পারিবারিক কলহ প্রভৃতি নানাবিধ অশান্তি আরও পাঁচজনের জীবনে যেমন ঘটে, আমার জীবনেও ঠিক তেমনই ঘটিয়াছে। তথাপি ইংরেজ কবি যেমন বলিয়াছেন, "England! with all thy faults I love thee still," আমিও তেমনই তাঁহার সুরে সুর মিলাইয়া বলিব, "হে দাম্পত্য-জীবন, তোমার ভিতরে অনেক কষ্ট, অনেক অশান্তি, থাকা সত্ত্বেও আমি তোমায় ভালবাসি।" কমলে কণ্টক আছে, তথাপি কমলকে কে না ভালবাসে? পতিব্রতা পত্নীর পবিত্র প্রেম এবং একনিষ্ঠ পতিসেবা যে ভাগ্যবান লাভ করিয়াছে, সে কি দাম্পত্য-জীবনের নিন্দা করিতে পারে?

"ন কিঞ্চিদপি কুর্ব্বাণঃ সৌখ্যৈর্দুঃখান্যপোহতি।
তৎতস্য কিমপি দ্রব্যং যোহি যস্য প্রিয়োজনঃ॥"—

মানবচরিত্র-বিশ্লেষণনিপুণ অমর কবির লেখনী-নিঃসৃত এই উক্তি কি চিরসত্য নহে?

"অদ্বৈতং সুখদুঃখয়োরনুগুণং সর্ব্বাস্ববস্থাসু যদ-
বিশ্রামো হৃদয়স্য যত্র জরসা যস্মিন্নহার্য্যো রসঃ।
কালেনাবরণাত্যয়াৎ পরিণতে যৎ স্নেহসারে স্থিতং
ভদ্রং প্রেম সুমানুষস্য কথমপ্যেকং হি তৎ প্রার্থ্যতে॥"

এ প্রার্থনা যাহার জীবনে পূর্ণ হইয়াছে, তাহার আর অভাব কিসের?

(৪) বিসর্জ্জন

ফাল্গুনে কি পাইয়াছি, এতক্ষণ তাহাই বলিলাম। এইবার বলিব, ফাল্গুনে কি হারাইয়াছি। ত্রয়োদশ বর্ষ পূর্ব্বে যে ফাল্গুনে একজনকে পাইয়া আমার জীবন মধুময় হইয়া উঠিয়াছিল, ত্রয়োদশবর্ষ পরে সেই ফাল্গুনেই আবার তাহাকে হারাইয়া আমার জীবন মরুময় হইয়া গিয়াছে। সুদীর্ঘ ত্রয়োদশ বৎসর কাল যে সরলা সুখে দুঃখে, সম্পদে, বিপদে, আবাসে প্রবাসে ছায়ার ন্যায় আমার অনুগমন করিয়াছে, সে আজ কোথায়? একদিন নয় আধ দিন নয়, পূর্ণ দশটি বৎসর দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধির অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিয়া সে কোন এক অজানা দেশে চলিয়া গেল। ফাল্গুনে প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, ফাল্গুনেই বিসর্জ্জন হইল। কিন্তু ইহার ভিতর একটা জিনিস লক্ষ্য করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি। ৪ঠা ফাল্গুন, মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া তাহার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলাম, আবার সেই ৭ঠা ফাল্গুন, আমাদের শুভমিলনের দিন, তখন সে কাতরকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "ওগো, আজ যেন আমি মরিগো!" তাহার পূর্ব্বে কিন্তু একদিনও সে মরিতে চাহে নাই। যখন রোগের যন্ত্রণা দুঃসহ হইয়া উঠিয়াছে, তখনই বলিয়াছে, "যন্ত্রণার জন্য মরিতে ইচ্ছা করে, কিন্তু আমি মরিতে চাহি না, কেন না তোমায় ছাড়িয়া স্বর্গে গিয়াও আমার সুখ নাই।"

রবীন্দ্রনাথের "মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে।" অথবা Gray's

"Who to dumb forgetfulness a prey
This pleasing anxious being e'er
resigned?"

কতকটা এই ভাবেরই অভিব্যক্তি নহে কি?

হাঁ, বলিতেছিলাম, সে ত যাইতে চাহে নাই, তাহাকে যে জোর করিয়া লইয়া গেল। ৭ই

ফাল্গুন আমাদের ফুলশয্যা হইয়াছিল, সে দিন প্রথম তাহার অমৃত নিঃস্যন্দিনী বাণী আমার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিয়া আমাকে মুগ্ধ করিয়াছিল, নবীন প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া সারা রাত্রি নিদ্রাকে কাছে আসিতে দিই নাই,--

"কিমপি কিমপি মন্দং মন্দমাসক্তি যোগাদ্ —
অবিরলিত কপোলং জল্পতোবক্রমেণ।
অশিথিল পরিরম্ভ ব্যাপৃতৈ কৈকদোষ্ণো—
রবিদিতগত যামা রাত্রিরেব ব্যরংসীৎ॥"

আবার সেই ৭ই ফাল্গুনই তাহার বাগরোধ হইল, সেই দিন তাহার শেষ কথা শুনিলাম, আমার সাধের বীণা চিরতরে নীরব হইল।

সেবার ১০ই ফাল্গুন তাহাকে বাপের বাড়ী পাঠাইয়াছিলাম,—এবারও ১০ই ফাল্গুন বাপের বাড়ী পাঠাইলাম। কিন্তু সেবার পাঠাইয়াছিলাম মাস কয়েকের জন্য, এবার পাঠাইয়াছি—কতদিনের জন্য, কে জানে?

আর একটা কথা। সেবার ত তাহাকে একা পাঠাই নাই,—আমিও যে তাহার সহিত "জোড়ে" গিয়াছিলাম। এবার কিন্তু সে গিয়াছে সম্পূর্ণ একা—কাহাকেও সঙ্গে লয় নাই—আমাকেও না। জানি না, অজানা পথে কেমন করিয়া যাইবে; বলিতে পারি না, আমাকে ছাড়িয়া কেমন করিয়া থাকিবে।

অশেষ

শ্রীমতী চারুলতা দেবী

ফুরাতে চাহে না বেলা, স্বপ্ন-অনুরাগ লয়ে
পলে পলে বাড়িছে সময়,
বর্ত্তমানে আবেষ্টিয়া ভবিষ্য আকুল হয়ে
আঁকে কত ছবি জ্যোতিশ্ময়।
হৃদয়-তটিনী তীরে,
কামনা নাচিয়া ফিরে,
হাসিমুখে উড়াইয়া কেশ,
বিরলে বসিয়া স্মৃতি জীবন-আলেখ্য-পটে
করে শত বর্ণ সমাবেশ।

* * *

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুখ-দুঃখ, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অশ্রু-হাসি
সহসা লভিয়া সম্প্রসার,
কালের বিশাল বুকে আনন্দে উঠিয়া ভাসি
পূর্ণ করে ব্যোম-পারাবার।
অর্দ্ধস্ফুট কত রেখা,
ক্ষণে ক্ষণে দিয়া দেখা,
সকৌতুকে নিমেষে লুকায়,
কল্পনা তৃষিত হয়ে আপনার ক্ষুদ্র বুকে
সেই ছবি ফুটাইতে চায়!

* * *

প্রভাত-রবির কোলে লীলায়িত ভঙ্গিমায়
মেঘমালা পরে লুটাইয়া,
স্নিগ্ধ অম্বরালে তার ধীরে বেলা বেড়ে যায়
আপনারে গোপন রাখিয়া।
চিত্র হয় দীর্ঘতর,
বেড়ে যায় পরিসর,
কামনার আয়ু বেড়ে যায়,
স্বপ্ন-মদিরার স্রোতে সুখ-শান্তি ভেসে যায়,
আশা শুধু আপনা জাগায়।

* * *

হায় তৃষাতুর হিয়া, তবু পরিতৃপ্তি নাই?
তবু নাই বাসনার শেষ?
ইন্দ্রায়ুধ-বিনিন্দিত বর্ণ-স্রোতে সর্ব্বদাই
জাগাইয়া সুরের আবেশ—
তবু তোর দীর্ণ প্রাণ
গাহে ব্যর্থতার গান?
স্বপ্ন-চিত্রে আনে বাস্তবতা?
কল্পনার যবনিকা সরাইয়া ধীরে ধীরে
দিকে দিকে ঢালে আকুলতা?

* * *

উপন্যাস

অন্নপূর্ণার মন্দির

শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

হীরার একটু বিশেষ পরিচয় আমাদের দিতে হইবে। তাহা না হইলে পাঠক এই কূট-রহস্যময়ী হীরাবাই সম্বন্ধে সকল কথা জানিতে পারিবেন না। কেন যে সে ছায়ার মত, মন্ত্রমুগ্ধের মত হেমন্ত-লালের পশ্চাতে পশ্চাতে ঘুরিতেছিল—তাহার হুকুমে চলিতেছিল—তাহার ত রহস্যভেদ হইবে না। এক কথায় বলিতে গেলে হীরার তখনকার অস্তিত্ব কূট-প্রহেলিকায় সমাচ্ছন্ন! এ প্রহেলিকার আবরণ মুক্ত করিতে হইলে তাহার সম্বন্ধে সকল কথাই জানা প্রয়োজন।

প্রাণের মধ্যে ধূমায়িত একটা অজানা প্রবৃত্তির প্ররোচনায় হীরা সেই গভীর রাত্রে হেমন্তলালের আশ্রয় ত্যাগ করিল। সেই বৃদ্ধা পরিচারিকা, তাহার রক্ষিকা তখন ঘোর নিদ্রায় অভিভূত। সুতরাং সে কিছুই জানিতে পারিল না।

রাত্রি দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণ। কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি। চারিদিকে ঘোর অন্ধকার। সেই জনবিরল গ্রামের সকলেই সুষুপ্ত। এমন কি শৃগাল কুকুর পর্য্যন্ত পথে একটীও নাই।

সে অন্ধকারে দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিল, কি করা উচিত। কিয়ৎক্ষণ চিন্তার পর সে বুঝিল,—"না—এ স্থান ত্যাগ করাই কর্ত্তব্য। যাহা আমার আশার অতীত, যে বস্তু লাভ করা আমার পক্ষে অসম্ভব—তখন তাহার নিকট হইতে, পাপময় প্রলোভনের পথ হইতে দূরে থাকাই ভাল।"

কিন্তু যে হেমন্তলাল তাহার জীবনরক্ষা করিয়াছে, যে চরিত্রে দেবতুল্য, নিঃস্বার্থ পরোপকারে অদ্বিতীয়—তাহাকে না বলিয়া কহিয়া, তাহার আশ্রয় ত্যাগ তাহার পক্ষে ভয়ানক অকৃতজ্ঞতার পরিচায়ক। যে হেমন্তলাল তাহাকে গভীর অরণ্যমধ্য হইতে কুড়াইয়া আনিয়া আশ্রয় দিয়াছে—পরিচর্য্যা দ্বারা তাহার জীবন রক্ষা করিয়াছে—তাহাকে এত যত্নে আদরে রাখিয়াছে—তাহাকে না বলিয়া কহিয়া চলিয়া যাওয়াটা কি তাহার পক্ষে কৃতঘ্নতা হইতেছে না?

সে ঊর্দ্ধনেত্রে, যুক্তকরে সেই অন্ধকারবেষ্টিত আকাশের দিকে চাহিয়া বলিল, "হে ভগবান! হে অন্তর্য্যামী! হে নারায়ণ! তুমি এই হত-ভাগিনীর মনের কথা ত জান। আমার এ অকৃতজ্ঞতা ত স্বেচ্ছাকৃত নয়! হেমন্তলাল অতি মহৎ—অতি দয়াবান্—অতি নিষ্পাপ। আমার হৃদয়ের দুর্ব্বলতা বড়ই বেশী। হিন্দুর ঘরের বিধবা হইয়া আমি এতকাল নানা কৌশলে আত্ম-রক্ষা করিয়া আসিয়াছি। মুসলমান সৈনিকের দ্বারা অপহৃতা ও উৎপীড়িতা হইয়াও আমি বিষপ্রয়োগে সেই শয়তানকে হত্যা করিয়া নিজের নারীধর্ম্ম রক্ষা করিয়াছি। কিন্তু এই নিষ্কলঙ্ক রূপবান হেমন্তলালের অফুরন্ত রূপজ্যোতি আমার নেত্রকে দিন দিন ঝলসাইয়া দিতেছে—চিত্তকে

সর্ব বিষয়ে তাহার অধীন করিয়া দিতেছে—তাহার সাহচর্য্যকে মধুময় করিয়া তুলিয়াছে। তাই আমি তাহাকে না বলিয়া এই গভীর নিশীথে অকূল সংসার-পাথারে আত্মসমর্পণ করিয়াছি। আমার এ অনিচ্ছাকৃত অকৃতজ্ঞতার পাপ—হে ভগবান তুমি মার্জ্জনা করিও।"

এই কথাগুলি মনে মনে বলিতে তাহার চোখে জল আসিল। মর্ম্মচ্ছেদকারা একটী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া, অঞ্চলে চোখের জল মুছিয়া সে সেই অন্ধকারের মধ্যে অগ্রসর হইল।

কিন্তু তাহার বোধ হইল, তাহার সম্মুখের অন্ধকার যেন ক্রমশঃ জমাট বাঁধিয়া উঠিতেছে। এদিকে নানা কথা ভাবিতে ভাবিতে সে তাহার আশ্রয়স্থান ছাড়িয়া অনেকটা দূরে আসিয়া পড়িয়াছে। লোকের বসবাস ক্রমশঃ বিরল হইয়া পড়িতেছে। সেই অপ্রশস্ত, ক্ষুদ্র গ্রাম্য পথ—সম্পূর্ণরূপে নির্জ্জন, নিস্তব্ধ ও একাবারে জনসমাগমশূন্য। তখন যেন তাহার চমক ভাঙ্গিল। হতভাগিনী বুঝিল, এই সূচীভেদ্য অন্ধকারের মধ্যে পথ চিনিয়া চলা তাহার মত শক্তিহীনা অথচ রূপসম্পদময়ী নারীর পক্ষে অতি বিপদজনক। মানুষের ভয়, নিশাচরের ভয়, ধরা পড়িবার ভয়,—এইরূপ অনেক ভয়ই তাহার চিত্তকে চমকিত করিয়া তুলিতেছিল। তবুও সে সাহসাবলম্বনে অগ্রসর হইতে লাগিল।

সে মনে মনে ভাবিল, গ্রামের পথ অপেক্ষা মাঠের পথ অনেকটা নিরাপদ। দেখিল—যে সংকীর্ণ গ্রাম্য পথ ধরিয়া সে আসিতেছিল তাহা শেষ হইয়া গিয়াছে। ক্ষীণ নক্ষত্রালোকে সে বুঝিল যে, গ্রামের সংকীর্ণ পথ এইখানেই শেষ হইয়া মাঠের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে।

মাঠে নামিয়া সে আবার পথ চলিতে আরম্ভ করিল। সম্মুখে বিশাল বহুদূর বিস্তীর্ণ মাঠ। মাঝে মাঝে ছোট ঝোপ জঙ্গল। পথ অতি বন্ধুর। দ্রুত গমনের সকল চেষ্টাই যেন বিফল করিয়া দিতেছে। সে কখনও এদিকে আসে নাই—কোথায় আসিয়া পড়িয়াছে তাহাও সে জানে না। কিন্তু তাহার শরীরের ক্লান্তি ও অবসন্নতার সহিত তুলনা করিয়া সে বুঝিল, গ্রাম হইতে অনেকটা দূরেই সে আসিয়া পড়িয়াছে।

যে গ্রামে হেমন্তলালের পল্লীনিবাস ছিল তাহার নাম অমরপুর। ইহা সে তাহার বৃদ্ধা পরিচারিকার মুখেই শুনিয়াছিল। অমরপুরের দক্ষিণ প্রান্তে একটী "তেপান্তর" মাঠ। এ মাঠে ডাকাতের ভয়ও আছে। মাঠ শেষ হইলেই একটী ক্ষুদ্র বন। এই বন উত্তীর্ণ হইলেই গঙ্গাতীর। বৃদ্ধা পরিচারিকার মুখে, অমরপুরের ডাকাতদের গল্প শুনিয়া অনেক কথাই সে জানিতে পারিয়াছিল। এই বনের মধ্যে জঙ্গলের শেষ দিকে এক মন্দিরমধ্যে ডাকাতরা কালীপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। সে কালীর কাছে তাহারা নরবলি দিত। অনেক ভীষণদর্শন কাপালিক সেই কালী-মন্দিরে আসিত। গল্পচ্ছলে এইরূপ অনেক কথাই সে তাহার সঙ্গিনীর মুখে শুনিয়াছিল।

এই সুদীর্ঘ প্রান্তরমধ্যে নামিয়া, অনেকটা পথ চলিবার পর, পথের পরিসমাপ্তি না দেখিয়া তাহার মনে সেই অতীতে শ্রুত 'ডাকাতে প্রান্তরের' কথাই জাগিয়া উঠিল। সে মনে মনে কতই ভয় পাইল। সে ভাবিল, ডাকাতে আমার আর কি লইবে? অলঙ্কারহীনা অভাগিনী দরিদ্রা আমি। ডাকাতের ভয় আমি করি না।

এই সময়ে সহসা পিছনে একটা মৃদু পদশব্দ শুনিয়া তাহার প্রাণ চমকিয়া উঠিল। সে অদূরে একটী বিশালকায় নিম্ববৃক্ষ দেখিতে পাইয়া বিটপীর অন্তরালে আত্মগোপন করিল। অনেক ক্ষণ স্থির

র্ণে থাকিয়া সে আর কোন শব্দই শুনিতে পাইল না। বুঝিল হয় ত কোন নিশাচর জন্তুর পদশব্দেই সে ভয় পাইয়াছিল। ডাকাতের পদশব্দ চোরের পদশব্দের মত অতি মৃদু নহে।

সে কিয়ৎক্ষণ সেই বৃক্ষতলে বিশ্রাম করিয়া আবার অগ্রসর হইল। মাঠটী শেষ করিয়া সে একটি ক্ষুদ্র বনভূমির মধ্যে আসিয়া পড়িল। আবার তাহার মনে—সঙ্গিনীর কথিত ডাকাতে বনের কথা উদিত হইল। তবুও সে বনের মধ্যে প্রবেশ করিল।

তখন উষার আলোকে পথ যেন অনেকটা পরিষ্কার। সে দেখিল বনের মধ্যে প্রায় দুই হাত প্রশস্ত একটী চলা পথ রহিয়াছে। পথের অবস্থা দেখিয়া বুঝিল—এ পথে নিশ্চয়ই মানুষ চলাচল করিয়া থাকে। খুব সম্ভবতঃ ইহা কাঠুরিয়াদের সৃজিত বনপথ।

তখন তৃষ্ণায় তাহার ছাতি ফাটিয়া যাইতেছে। জল—জল, কে তাহাকে একটু জল দিবে?

সহসা নদীতরঙ্গের দূর-শ্রুত কলকল শব্দ শুনিতে পাইল। বুঝিল—সে গঙ্গাতীরের খুব কাছে আসিয়া পড়িয়াছে।

সে আরও দ্রুত চলিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু সহসা এক ক্ষুদ্র প্রস্তরখণ্ডে হোঁচট খাইয়া অভাগিনী ভূপতিতা হইল। সে প্রস্তরখণ্ডে সে এই আঘাত পাইল তাহা একটী ক্ষুদ্র দেবায়তনের ধ্বংসাবশেষ। অন্ধকারে সে এই বৃহৎকায় ও স্থানচ্যুত পাষাণ-স্তূপের অস্তিত্ব জানিতে পারে নাই। টাল রাখিতে না পারায় মাটীতে পড়িবার মুখে তাহার মাথায় আর একখণ্ড প্রস্তরের ধাক্কা লাগিল। মস্তক সবলে প্রস্তরাহত হওয়ায় মাথা হইতে প্রচুর রক্তস্রাব হইতে লাগিল। সে আঘাত-যাতনায় মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

ইহাই হতভাগিনী হীরার জীবনাঙ্কের পূর্ব্বাংশ।

চেতনা হইবার পর সে সবিস্ময়ে দেখিল—"এক ভগ্ন মন্দিরমধ্যে ক্ষুদ্র অথচ পরিষ্কৃত এক পর্ণশয্যায় সে শুইয়া আছে। কক্ষমধ্যে একটী ক্ষীণ প্রদীপ জ্বলিতেছে। কিন্তু তাহার কাছে কেহই নাই। সে একা।

যাতনায়, ভয়ে, আতঙ্কে সে চীৎকার করিয়া উঠিল। তাহার চীৎকার শুনিয়া পাশের কক্ষ হইতে এক সৌম্যমূর্ত্তি সন্ন্যাসী আসিয়া ধীরে ধীরে তাহার শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইলেন। স্নেহপূর্ণ স্বরে বলিলেন—"ভয় নাই মা—আমি সংসার বিরাগী সন্ন্যাসী। তুমি কি স্বপ্ন দেখিয়া ভয় পাইয়া চীৎকার করিয়াছিলে?"

হীরা উদাসদৃষ্টিতে সন্ন্যাসীর মুখের দিকে একবার চাহিয়া বলিল—"আমি কোথায় আছি?"

সন্ন্যাসী বলিলেন—"আমারই আশ্রমে।"

"কে আমাকে এখানে আনিল?"

"আমি?"

"এখানে আর কে আছে?"

"কেহই না। আমি আর একজন বৃদ্ধা পরিচারিকা।"

"পরিচারিকা কোথায়?"

"তাহাকে তোমার দুগ্ধ আনিবার জন্য—গ্রামে পাঠাইয়াছি।"

"কতক্ষণ আমি এ অবস্থায় এখানে আছি?"

"বোধ হয় চব্বিশ ঘণ্টার উপর।"

"এখন রাত্রি কত?"

"রাত্রি শেষ প্রহর। প্রভাত আসিতেছে।"

এতগুলি কথা জিজ্ঞাসা করিয়া সে যেন একটু ক্লান্ত হইয়া পড়িল। সন্ন্যাসী ইঙ্গিতে তাহাকে চুপ করিতে বলিলেন। তারপর এক মৃৎপাত্র

হইতে ঔষধমিশ্রিত পানীয় তাহার মুখে ঢালিয়া দিলেন। বলিলেন,—"তুমি একটু স্থির হইয়া ঘুমাও। এই ঔষধের ক্রিয়ায় তোমার যাতনা নাশ ও সুখনিদ্রা হইবে। তুমি সুস্থ হইলে আমি তোমায় সব কথাই খুলিয়া বলিব। তোমার মাথায় ভয়ানক আঘাত লাগিয়াছে। অনেক কষ্টে মাথার রক্তস্রাব বন্ধ করিয়াছি। স্থিরভাবে শুইয়া থাক। কোন ভয় নাই তোমার মা! জানিও আমি পিতা তুমি কন্যা। তুমি পিতৃগৃহেই আছ।"

এই সন্ন্যাসীর পক্কজটাজুটময় সৌম্যমূর্ত্তি ও প্রসন্ন বদন দেখিয়া হীরা অনেকটা নির্ভয় ও চিন্তাহীন হইয়া চক্ষু মুদিল। কিয়ৎক্ষণ মুদিতনেত্রে থাকিবার পর সে ঘুমাইয়া পড়িল।

সন্ন্যাসী ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে গঙ্গাস্নানে গেলেন। পথে তাঁহার প্রিয় শিষ্য দীনদয়ালের সহিত দেখা হইল।

দীনদয়াল প্রভুর পদধূলি লইয়া বলিলেন,—"আপনার মুখ অত চিন্তাপূর্ণ কেন? আমাকে সহসা আসিতে বলিয়াছেন কেন?"

সন্ন্যাসীর নাম অচ্যুতানন্দ স্বামী। স্বামীজী বলিলেন,—"বড বিপদে পড়িয়াই তোমায় ডাকাইয়াছি।"

দীনদয়াল। আপনার আবার কি বিপদ?

স্বামীজী। আবার মায়ার আকর্ষণ। মহামায়ার লীলা। আমি নিষ্ক্রিয় হইতে পারি; তিনি নহেন।

হীরার সম্বন্ধে সমস্ত কথাই তিনি তাঁহার প্রিয় শিষ্যকে বলিয়া গেলেন। দীনদয়াল সমস্ত ব্যাপার শুনিয়া বলিলেন,—"সত্যই এ মহামায়ার ছলনা।"

স্বামী। তোমাকে কাশীতে আমার মঠে যাইতে উপদেশ দিয়াছিলাম। কারণ সম্মুখেই একটা মহাযোগ উপস্থিত। আমার আদেশমাত্র যে চলিয়া যাও নাই তাহাও ঐ বেটীর লীলা। ভাগ্যে তুমি নগরে ছিলে তাই তোমাকে সংবাদ পাঠাইতে পারিয়াছি। এখন কিছুদিন তোমায় এখানে অপেক্ষা করিতে হইবে। বোধ হয় এই অনাথিনী দু চার দিনেই সুস্থ হইতে পারে।

"ইহার চেতনা প্রাপ্তি পর্য্যন্ত কি অপেক্ষা করিব?"

"উহার সম্পূর্ণ চেতনালাভ, পূর্ণজ্ঞান ও স্মরণশক্তি ফিরিয়া না আসা পর্য্যন্ত তোমার এখানে থাকা প্রয়োজন বুঝিতেছি। এখানে পুরুষমাত্র নাই যে সাহায্য করে।"

"প্রভুর আদেশে তাহাই করিব।"

এইরূপ কথোপকথনের পর উভয়ে গঙ্গাজলে নামিলেন। স্নান ও সন্ধ্যাহ্নিক সারিতে সারিতে সূর্য্যোদয় হইল। নবোদিত বালার্করাগে গঙ্গাবক্ষ অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। স্নানান্তে সন্ন্যাসী সশিষ্য তাহার বনমধ্যস্থ সেই ভগ্নকুটীরে ফিরিয়া আসিলেন।

প্রথমেই তিনি পার্শ্বস্থ কক্ষে প্রবেশ করিয়া সেই রোগিণীর অবস্থা বিশেষভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিলেন। নাড়ী ধরিয়া দেখিলেন—নাড়ী পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক সবল, আরোগ্যের সম্ভাবনা খুব নিকটে। রক্তস্রাবও গত রাত্রে বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

সন্ন্যাসী বুঝিলেন—তাঁহার ঔষধের বিশেষ ফল ধরিয়াছে। এত শীঘ্র যে এই রোগিণীর অবস্থা উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে তাহা তিনি ভাবেন নাই কিম্বা প্রত্যাশাও করেন নাই। আশান্বিত চিত্তে, প্রফুল্লমুখে তিনি ডাকিলেন—"দীনদয়াল!"

দীনদয়াল তাহার পার্শ্বের কক্ষে ছিল। তখনই আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল।

স্বামীজী প্রসন্নমুখে বলিলেন,—"হয় ত, তোমাকে চার পাঁচ দিনের মধ্যেই বিদায় দিতে পারিব। রোগিণীর অবস্থা আশাতীত উন্নতি লাভ করিয়াছে। সবই জগদম্বার ইচ্ছা। [ক্রমশঃ]

উপন্যাস

প্রত্যাবর্ত্তন

কবিশেখর শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

শ্রাবণের নিবিড় মেঘরাজি করিযূথের ন্যায় ত্রিকূটশৃঙ্গ পরিবেষ্টিত করিয়া সহস্র শুণ্ড দোলাইতেছে। বর্ষার বারিধারায় পরিপুষ্ট বনানী শ্যামশ্রী ধারণ করিয়াছে। পরাগকেশর-সমন্বিত কদম্ব-ফুল স্তবকে স্তবকে প্রস্ফুটিত হইয়া কুঞ্জ আলোময় করিয়াছে। বর্ষার বন-শ্রী অতুল, বর্ষার শৈল-শোভা বিচিত্র।

দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ গিরীন্দ্রনাথ এই কয় বৎসর ভারতের নানা তীর্থ, নানা ধর্ম্ম-মঠ, নানা সন্ন্যাসীর আস্তানা পরিদর্শন করিয়া অবশেষে বৈদ্যনাথধামে আসিয়া উপনীত হইয়াছে। হরিহরনাথের কোন সন্ধান করিতে না পারিয়া, নৈরাশ্য-পীড়িত হৃদয়ে স্বদেশের অনতিদূরে এই শৈব-তীর্থে কিছুদিন অবস্থানের অভিপ্রায়ে সে শিবগঙ্গার নিকটে একটি ক্ষুদ্র গৃহ ভাড়া করিয়া বাস করিতেছিল। মনোরমাকে সে প্রতিশ্রুতি দান করিয়াছিল যে, হরিহরনাথকে সঙ্গে লইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিবে। কিন্তু গ্রহ-বৈগুণ্যে তাহার সে আশা এখনও পূর্ণ হয় নাই। সে ভাবিল, এত দীর্ঘকাল ধরিয়া কত স্থানে তাহার কত অনুসন্ধান করিলাম, কিন্তু কেহই তাহার সংবাদ দিতে পারিল না। তবে কি এত আগ্রহ, এত পরিশ্রম, এত অনুসন্ধান ব্যর্থ হইবে? সৎকর্ম্ম অচির-ফলপ্রসূ; তাহার পুরস্কার সুনিশ্চিত। তবে কেন আমাকে এত নৈরাশ্যে বিড়ম্বিত হইতে হইতেছে? কোন্ ক্রূর-প্রকৃতির রুষ্ট গ্রহ আমাকে তাহার করাল কবলে কবলিত করিয়া আমার সুতীক্ষ্ণ কামনার প্রতি দ্বার সবলে রুদ্ধ করিয়া দিতেছে? জন্মান্তরীণ লালসা-লোলুপ ঘৃণিত কর্ম্মের ফলে নিষ্ঠুর নিয়তি উদ্দেশ্যসিদ্ধির পথে ভীষণা বিঘ্ন-রূপিণী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কে বলিতে পারে আমার এই চির-বিঘ্নসঙ্কুল গন্তব্য পথ সুগম হইবে কি না? একমাত্র বিশ্ব-নিয়ন্তা অন্তর্যামী সে কথা জানেন। আমি বাবা বৈদ্যনাথের চরণে কুণ্ডলাকৃত ভুজঙ্গের ন্যায় জড়াইয়া পড়িয়া থাকিব; আর এক পাও কোথাও নড়িব না, দেখি দেবাদিদেব মহাদেব কি বিধান করেন? বিধাতার বিচিত্র রহস্য কে বুঝিবে? যে ঘটনা অবশ্যম্ভাবী তাহার উপায় যে অদৃষ্ট-পুরুষ নানা প্রতিকূল ঘটনার মধ্য দিয়াও কি রূপ বিচিত্র কৌশলে খুঁজিয়া বাহির করেন, তাহা মনুষ্য ত দূরের কথা, অনেক দেবতারও দুর্জ্ঞেয়। ভবিষ্যতের গাঢ় অন্ধকারে লুক্কায়িত অগণনীয় বিধিলিপির অপূর্ব্ব উদ্‌ঘাটন-প্রণালী দেখিয়া অনেক সিদ্ধ-পুরুষও স্তম্ভিত হইয়া যান। অনেক মহাপুরুষেরও বুদ্ধি বিপাকে বিজড়িত হইয়া পড়ে।

গিরীন্দ্র ভারতের বহু তীর্থস্থান ঘুরিয়াছে; কিন্তু কোথাও এক সপ্তাহের অধিক অবস্থিতি করে নাই। কিন্তু বৈদ্যনাথধামে আসিয়া তাহার কেমন মন হইল যে, সে এখানে কিছুদিন থাকিয়া যায়। এ সকলই সেই চক্রীর চক্র। সমগ্র সংসার এই মহাচক্রে ঘুরিতেছে।

গিরীন্দ্র তাহার নিভৃত কক্ষে একাকী থাকে। পার্শ্বের কক্ষে তাহার আর একটি সঙ্গী জুটিয়াছে। গিরীনের সন্ন্যাসী-বেশ, সম্বলের মধ্যে লোটা-কম্বল। দিনে একপাকের আহার; কোন দিন হবিষ্যান্ন, কোন দিন ভাতে ভাত, আবার কোন দিন বা খিচুড়ী। রাত্রে দোকানের পুরী, তরকারী, তৎসঙ্গে কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন এবং সামান্য ফলমূল। সে

...চারিখানি বাঙ্গালা ধর্ম্মগ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিল। তাহা পাঠ করিয়া সময় কাটাইত। একাকী নির্জ্জনে কালযাপন করা অভ্যাসবশে তাহার স্বভাবসিদ্ধ হইয়া গিয়াছিল।

গিরীন্দ্র প্রত্যহ প্রত্যূষে স্নান করিয়া মন্দিরে গিয়া মহাদেবের পূজা করিত। আবার অপরাহ্ণ হইতে নৈশারতি পর্য্যন্ত মন্দির-মণ্ডপে গিয়া বসিয়া থাকিত। সে সময়ে যত সাধু সন্ন্যাসী আগমন করিতেন, সে প্রখর দৃষ্টিতে প্রত্যেকের আপাদ মস্তক দেখিয়া লইত। শিবগঙ্গায় স্নানের সময়ও গিরীন্দ্র উপরি-উক্ত কার্য্যটি সুচারু-রূপে সম্পন্ন করিতে ভুলিত না।

এইরূপে তাহার দিন যায়। একদিন সে স্নান করিয়া মন্দিরপ্রাঙ্গণে উপস্থিত হইয়াছে, এমন সময়ে অকস্মাৎ এক গৈরিক-বসন-ভূষিত দীর্ঘশ্মশ্রু-বিলম্বিত ব্যক্তিকে দেখিয়া চমকিয়া উঠিল। কে এই দীর্ঘকায় পুরুষ, প্রশস্ত ললাট, আকর্ণ-আয়ত প্রদীপ্ত নয়ন, সিংহগ্রীব, উজ্জ্বল মুখমণ্ডল? ইঁহাকে সে পূর্ব্বে কখনও দেখিয়াছে কি? ইনি যে তাহার চির প্রতিপালক—ইনিই যে সেই দীর্ঘকাল-নিরুদ্দিষ্ট মহাপুরুষ—যাঁহার উদ্দেশ-অনুসন্ধানে সে বহুবৎসর ধরিয়া দেশে দেশে তীর্থে তীর্থে অবিশ্রান্ত ভ্রমণ করিয়াছে; যাঁহার নিমিত্ত তাহাকে সন্ন্যাস-ব্রতাবলম্বী হইতে হইতেছে। হায়, এতদিনে কি তাহার কঠোর ব্রতের উদ্‌যাপন হইল?

হরিহরনাথকে দেখিয়া গিরীন্দ্র কি ভাবিয়া কিছুদূরে সরিয়া গেল। অলক্ষ্যে থাকিয়া সেই জ্যোতির্ম্ময় দিব্য-রূপ নয়ন ভরিয়া দেখিতে লাগিল। ভাবিল, কালের কি অত্যাশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন!

সন্দেহে ও ভয়ে গিরীন্দ্র তাহার সম্মুখীন হইতে পারিল না। পাছে তিনি তাহার নয়ন-পথ হইতে অন্তর্হিত হইয়া যান; পাছে তাহার অনুরোধ-উপরোধ তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট না হয়; পাছে তাহার উদ্দেশ্য-তরুর প্রথম তরুণ অঙ্কুর অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইয়া যায়, এইরূপ নানা দুশ্চিন্তায় অভিভূত হইয়া গিরীন্দ্র অলক্ষ্যে থাকিয়াই তাহার গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিল, কিছুতেই তাহার নিকটে যাইতে সাহস করিল না। ভাবিল, তিনি ত এখন এইখানেই আছেন; দুই-চারিদিন তাঁহার অজ্ঞাতে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ঘুরিয়া দেখা যাক্। তার পর সুযোগ বুঝিয়া, সাক্ষাৎ করিয়া প্রকৃত উদ্দেশ্যের অবতারণা করা যাইবে।

হরিহরনাথ প্রথমে মন্দিরে প্রবিষ্ট হইয়া মহাদেবের পূজা করিলেন; তৎপরে প্রাঙ্গণের চারিদিকে অবস্থিত অন্যান্য দেবদেবীর অর্চ্চনা করিয়া দেবায়তন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া, সহর ছাড়িয়া সহরের প্রান্তর-পথ অবলম্বন করিয়া, কমণ্ডলুহস্তে পূর্ব্ব দক্ষিণাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। পশ্চাতে প্রায় শতাধিক হস্ত ব্যবধানে গিরীন্দ্রও তাহার অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে। সে গোপনে তাঁহার আশ্রমের সন্ধান লইয়া আসিবে।

প্রায় তিন মাইল পথ অতিক্রম করিয়া, একটি ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য নদী পার হইয়া, হরিহরনাথ ঐ নদী-কূলেই অবস্থিত চোল পাহাড়ে উপনীত হইলেন। ধীরে ধীরে শৈলপথে আরোহণ করিয়া ক্ষুদ্র শৈল শীর্ষে একটি স্বল্পায়তন খর্পরাচ্ছাদিত কুটীরাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলেন। গিরীন্দ্র কিছুদূর হইতে তাহা নিরীক্ষণ করিয়া নিজ বাসায় প্রত্যাগমন করিল।

সেই দিনই সন্ধ্যার পর গিরীন্দ্র চোল পাহাড়ে গমন করিল। পথ দুর্গম নহে, সহজেই পৌছান যায়, আর প্রত্যাগমনেও তেমন কিছু অসুবিধা নাই। অন্ধকার রাত্রিতে যাতায়াত অনভ্যস্তের পক্ষে তাদৃশ সুগম নহে, কিন্তু সেদিন কৃষ্ণা-পঞ্চমী, রজনী

জ্যোৎস্নাময়ী; গিরীন্দ্র সহজেই সেই অনুচ্চ ক্ষুদ্র গিরিশীর্ষে উপস্থিত হইল। শুভ্রকুন্দকুসুমনিভ চন্দ্রালোকে সে সেই পাহাড়ের শোভায় আত্মহারা হইয়া গেল। সেই ঘনপাদপসমাকীর্ণ গিরি-খণ্ডের সর্ব্বাঙ্গে চন্দ্ররশ্মিত রূপত্রজাল ভেদ করিয়া অপূর্ব্ব নৈশ-সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিয়াছে। লুক্কায়িত বন-ফুলের সৌরভে চারিদিক আমোদিত। শীতল সমীর ধীরে ধীরে বহিতেছে। গিরীন্দ্র নিম্নে চাহিয়া দেখিল সঙ্কীর্ণকায়া তটিনী বক্রধারায় নিঃশব্দে প্রবাহিত হইতেছে। এই দেবতা-বাঞ্ছিত স্থানে উপনীত হইয়া তাহার প্রাণ জুড়াইয়া গেল। সে কিয়ৎক্ষণ একটি শিলাখণ্ডের উপর তন্ময় হইয়া বসিয়া রহিল। সহসা আরতির ধ্বনি উত্থিত হইলে সে দেবালয়ে উপস্থিত হইয়া দেখিল, সন্ন্যাসিগণ স্তোত্রধ্বনিসহ মহাদেবের আরতি করিতেছেন। কাহারও কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই, সকলেই একাগ্র-চিত্তে, ভক্তিপ্লুত-স্বরে হরভজন-গীতে আত্মহারা। একজন অপরিচিত আগন্তুক যে তাঁহাদের পশ্চাদ্ভাগে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা লক্ষ্য করিবার সময়ও তখন নহে। কাজেই গিরীন্দ্র একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া নির্ব্বিঘ্নে দেবারতি-দর্শন করিল।

আরতি শেষ হইলে সন্ন্যাসিবৃন্দ মন্দিরের দাওয়ায় আসিয়া কম্বলাসনে উপবেশন করিলেন। সহসা গিরীন্দ্রকে দেখিয়া একজন সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসিলেন, "আপনি কতক্ষণ এখানে আসিয়াছেন, সম্প্রতি বুঝি শ্রীধামে আগমন করা হইয়াছে?"

গিরীন্দ্র। আজ্ঞা হাঁ, আরতির কিঞ্চিৎ পূর্ব্বেই আসিয়াছিলাম, তাই ভগবদ্-আরতিদর্শন ভাগ্যে ঘটিল। মহাত্মন্! এমন স্বর্গীয় শান্তি ও তৃপ্তি বহু দিন উপভোগ করি নাই। এমন নির্জ্জন, কোলাহল-বিবর্জ্জিত জনবিরল স্থানই সাধুদিগের আশ্রম। তদুপরি এই দেবারতি হৃদয়ে কৈলাসের বার্ত্তা বহন করিয়া আনিল। শ্রীশ্রীবৈদ্যনাথধামের একপ্রান্তে যে এমন শান্তি-নিকেতন বিরাজিত, তাহা পূর্ব্বে জানিতাম না।

সন্ন্যাসী। এই নিভৃত দেবাশ্রমের সন্ধান আপনি কিরূপে পাইলেন, কে আপনাকে এ স্থানের সংবাদ দিয়াছেন?'

গিরীন্দ্র। অদ্য দিবাভাগে এ অঞ্চলে আসিয়া মহাশয়ের ন্যায় একজন মহাপুরুষকে এই পাহাড়ে উঠিতে দেখিয়া ভাবিলাম যে, এখানে নিশ্চয়ই সাধু-দিগের আশ্রম আছে। পূজার ঘণ্টাধ্বনিও শুনিয়া-ছিলাম, তখন বেলা অধিক হওয়ায় ফিরিয়া গিয়া-ছিলাম। মনে করিলাম যে, সন্ধ্যার সময় আসিয়া কৌতূহল চরিতার্থ করিয়া যাইব।

সন্ন্যাসী। উত্তম। প্রত্যেক ভক্তের জন্যই এ স্থান উন্মুক্ত। দেবাদিদেবের ইচ্ছায় অনেক মহা-পুরুষের দর্শনলাভ আমার ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে। আমি মহাপুরুষ নহি, ভগবান ও তাঁহার ভক্তদিগের দাসানুদাস মাত্র। পরম সৌভাগ্য অদ্য আপনার দর্শনলাভ ঘটিয়াছে। অদ্য এইস্থানে রাত্রি যাপন করুন। যাবৎ ইচ্ছা করিলে, যতদিন শ্রীধামে থাকিবেন, এই ক্ষুদ্রাশ্রমে অবস্থিতি করিতে পারেন। সাধু-সন্দর্শন বহু ভাগ্যে বহু সুকৃতির ফলে ঘটিয়া থাকে। আমরা সে সৌভাগ্য হইতে নিজেদের বঞ্চিত করিতে চাহি না। আপনি স্বচ্ছন্দে অবস্থান করুন।

সন্ন্যাসীর কথায় গিরীন্দ্র সবিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়িল। ভাবিল, রাত্রি হইয়া গিয়াছে, এক্ষণে বাসায় প্রত্যাগমনও সম্পূর্ণ নিরাপদ নহে। অগত্যা স্বীকৃত হইয়া গিরীন্দ্র কহিল, "হাঁ মহাশয়, অদ্য রাত্রে থাকিতেই হইবে, পথে অন্য কোন ভয় না থাকিলেও এই পার্ব্বত্যপ্রদেশে বন্যজন্তুর উপদ্রব থাকিবার সম্ভাবনা, আর আপনার আদেশও অলঙ্ঘনীয়;

জন্য অতি প্রত্যুষেই আমাকে যাইবার অনুমতি প্রদান করুন। বাসায় আমার সঙ্গী আছেন, আমার অনুপস্থিতির নিমিত্ত তাঁহাকে বিশেষ দুর্ভাবনায় রাত্রি কাটাইতে হইবে। কারণ আমি তাঁহাকে কিছু বলিয়া আসি নাই।

সন্ন্যাসী। তাহা হইলে আপনাকে কোন মতে থাকিতে বলিতে পারি না। অকারণ একজনের দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগ উৎকণ্ঠার কারণ হইতে আমি ইচ্ছা করি না; তাহাতে ধর্ম্মক্ষয় হয়। চলুন, আমি আপনাকে সঙ্গে করিয়া সহরপ্রান্তে পৌছিয়া দিতেছি।

গিরীন্দ্র। আপনাকেও কি একাকী ফিরিতে হইবে?

সন্ন্যাসী। নিরবচ্ছিন্ন অভ্যাসের হেতু তাহাতে আমার কিছুমাত্র ক্লেশ নাই।

গিরীন্দ্র। তবে চলুন, আর বিলম্বের প্রয়োজন নাই।

উভয়ে যাত্রা করিলেন, গিরীন্দ্রকে সহরপ্রান্তে পৌছাইয়া দিয়া সন্ন্যাসী শৈলকুটীরে প্রত্যাগত হইলেন। গিরীন্দ্র বাসায় আসিয়া নিশ্চিন্ত হইল। সন্ন্যাসীদিগের মধ্যেও আরতির সময় সে হরিহরনাথকে দেখিয়াছিল। মনে বড় ভয় ছিল, পাছে হরিহরনাথ তাহাকে চিনিয়া ফেলেন। পূর্ব্বোক্ত সন্ন্যাসীর অনুরোধে অনিচ্ছায় থাকিতে সম্মত হইয়াছিল। প্রত্যাগমনের সুযোগ আপনা আপনি উপস্থিত হওয়ায় সে সেটা ধরিয়া ফেলিল। বাসায় আসিয়া কি উপায়ে হরিহরনাথের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহার উদ্দেশ্য সাধন করিবে সেই চিন্তাতেই নিমগ্ন হইল।

মনোরমা যে এক্ষণে পিত্রালয়ে অবস্থিতি করিতেছে সে সংবাদ গিরীন্দ্র তাহার জননীর পত্রে অবগত হইয়াছিল। সে হরিহরনাথের সমাচার মনোরমাকে পাঠাইতে কৃতসঙ্কল্প হইল। ভাবিল, বহু বৎসর পরে নিরুদ্দিষ্ট স্বামীর সংবাদ পাইয়া কোন্ পতিপ্রাণা পত্নী স্থির হইয়া থাকিতে পারে? পত্র পাইলেই সে এখানে আসিয়া উপস্থিত হইবে। হায়, গিরীন্দ্র! মনোরমাকে চিনিতে তোমার এখনও অনেক বাকী। অবশেষে সে মনোরমাকে লিখিল,—

"শ্রীচরণকমলেষু!

বহুদিন তোমাদের কোন সংবাদ পাই নাই। ভগবদিচ্ছায় আমি এখনও এই পৃথিবীতে বিচরণ করিতেছি। যে উদ্দেশ্য লইয়া গৃহত্যাগ করিয়াছিলাম, তাহা এত বৎসর পরে বুঝি বাবা বৈদ্যনাথের কৃপায় সফল হইতে চলিল। এই পবিত্র তীর্থে তাঁহার দর্শন পাইয়াছি; সাক্ষাৎ করিতে এখনও সাহস হইতেছে না। কিন্তু শীঘ্রই করিব। তোমার অবগতির জন্য আপাততঃ এই পত্র লিখিলাম। ইতি শ্রীচরণাশ্রিত সেবক

শ্রীগিরীন্দ্রনাথ

[ক্রমশ]

বিষয়-সূচী

চৈত্র, ১৩৩৮

বিষয়-সূচী

চৈত্র, ১৩৩৮

চিত্র-সূচী—চৈত্র, ১৩৩৮

ত্রিবর্ণ চিত্র

প্রথম বর্ষ | চৈত্র, ১৩৩৮ | দ্বাদশ সংখ্যা

জাতীয় পতাকা

দুর্গের অনতিদূরে প্রশস্ত প্রান্তরে শেষ যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। বিজয়ী সেনাদল দুর্গ অবরুদ্ধ করিয়াছে। দুর্গশীর্ষে গৈরিক পতাকা উড়িতেছে। ইহাই নিরঞ্জনীদের জাতীয় পতাকা।

জয়-গর্ব্বে স্ফীতবক্ষ সেনাপতি বলিলেন,—সন্ন্যাসীদের দুর্গ ধ্বংস করিতে হইবে—উহাদের গৈরিক পতাকা ছিন্ন ভিন্ন করিতে হইবে—নিরঞ্জনীদের চিহ্নমাত্র রাখিব না।

সৈনিকেরা চীৎকার করিয়া উঠিল—জয় রাজ-রাজেন্দ্রের জয়! জয় সেনাপতি বীরবীরেন্দ্রের জয়!

সেনাপতি আবার বলিলেন, তোমরা প্রস্তুত হও।

প্রতিদিনই বিজয়ী সেনাদল দুর্গপ্রাকারের সন্নিহিত হইতে লাগিল। ক্রমে অবস্থা এমন হইল যে, তাহারা যে কোনও সময়ে নিরঞ্জনীদের দুর্গপ্রাকারে আরোহণ করিতে পারে।

দুর্গপরিখার সেতু ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছে। বিজয়ী সেনাদল দিবারাত্র পরিশ্রম করিয়া নূতন সেতু নির্ম্মাণ করিতেছে। সেতুনির্ম্মাণ শেষ হইলেই দুর্গপ্রাকার আক্রান্ত হইবে।

সেদিন অমাবস্যার রাত্রি। চারিদিক ঘোর অন্ধকার। সহসা দুর্গশীর্ষে আলোক জ্বলিয়া উঠিল। আলোক ক্রমশঃ উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর

হইতে লাগিল। সেই প্রোজ্জ্বল আলোকে রাজরাজেন্দ্রের সেনাদল দেখিল—নিরঞ্জনীদের কিশোর বীর শঙ্কর দুর্গশীর্ষে বীরদর্পে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে; তাহার হস্তে নিরঞ্জনীদের জাতীয় পতাকা। দুর্গশীর্ষে আরোহণ-অবরোহণের পথ দুর্ভেদ্য করা হইয়াছে। যেখানে শঙ্কর দাঁড়াইয়া রহিয়াছে সে স্থান এরূপ সুরক্ষিত যে, একটি সূক্ষ্মতম তীরও তাহার শরীরে বিদ্ধ হইবার পথ পাইবে না।

অর্দ্ধদণ্ড পরেই আলোক নিবিয়া গেল। তার পর দুর্গের বাহিরে যাহারা সেতুনির্ম্মাণ করিতেছিল তাহাদের উপর অসংখ্য তীর বৃষ্টি হইতে লাগিল। কোথা হইতে তীর আসিতেছে, অন্ধকারে রাজরাজেন্দ্রের সেনাদল তাহা বুঝিতে পারিল না। সুতরাং তাহারা পাছু হটিয়া দূরে নিরাপদ স্থানে আশ্রয় লইল। পরিখা-তীরে যেখানে সেতু নির্ম্মিত হইতেছিল সেইখানে অনেকগুলি মশাল জ্বলিতেছিল; সেইস্থান এখন জনশূন্য হইল। সুতরাং তীরগুলি আসিয়া মশালের উপর পড়িতে লাগিল। তীরের আঘাতে কতকগুলি মশাল নিবিল; কতকগুলি ছিন্নভিন্ন হইয়া ভূতলশায়ী হইল; একটি জ্বলন্ত মশালের অগ্রভাগ নিক্ষিপ্ত তীরের মুখে জড়াইয়া সেতুনির্ম্মাণের জন্য স্তূপীকৃত কাষ্ঠরাশির উপর পড়িল; ফলে সেই কাষ্ঠের স্তূপে আগুন লাগিল।

রাজরাজেন্দ্রের সেনাদল তাহাদের উদ্যম ব্যর্থ হইল দেখিয়া চঞ্চল হইয়া উঠিল। এমন সময়ে সেনাপতি আসিয়া তাহাদিগকে বলিলেন,—তোমরা বিজয়ী হইয়াও কি এ অপমান সহ্য করিবে? আজিকার এই অন্ধকারের সুযোগ ত্যাগ করিও না। বর্ম্মাবৃত হইয়া দুর্গের চারিদিক আক্রমণ কর; পরিখার একহস্ত-পরিমিত তীরভূমিও যেন শূন্য পড়িয়া না থাকে। আমি দেখিতে চাই, রাজরাজেন্দ্রের বীর-বাহিনীতে পরিখা-তীর সমাচ্ছন্ন হইয়াছে এবং তাহারা অসামান্য শৌর্য্য প্রদর্শন করিয়া পরিখা উত্তীর্ণ হইয়া দুর্গপ্রাকার আক্রমণ করিয়াছে। কেবল আক্রমণ নহে—আমি দেখিতে চাই, নিরঞ্জনীদের জাতীয়-পতাকাধারী শঙ্করকে তোমরা জীবিত বন্দী এবং উহাদের গৈরিক পতাকাও হস্তগত করিয়াছ।

প্রচণ্ড রবে রণ-দামামা বাজিয়া উঠিল। রাজরাজেন্দ্রের সৈন্যদল বীরদর্পে অগ্রসর হইল। নিরঞ্জনীদের তীর তাহাদের বর্ম্মাবৃত অঙ্গ ভেদ করিতে পারিল না। যাহার অঙ্গ ভেদ করিতে পারিল সে মরিল। পরিখাতীরে মৃত্যুভয়হীন সৈনিক দলের কতক মরিল কিন্তু একজনও পাছু হটিল না। ক্রমে মৃতদেহে পরিখা পূর্ণ হইল এবং তাহাকে অবলম্বন করিয়া রাজরাজেন্দ্রের বীর-বাহিনীর একাংশ পরিখা পার হইল। তার পর রজ্জু-সহযোগে অবশিষ্ট সৈন্যকে পার করাইয়া দিল। তখন দুর্গপ্রাকারে ভীষণ সংগ্রাম আরম্ভ হইল। প্রাকারের উপর হইতে নিরঞ্জনীরা অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিল। নিম্নে দাঁড়াইয়া রাজরাজেন্দ্রের সেনাদল তাহা বক্ষ পাতিয়া গ্রহণ করিতে লাগিল। একজন মরে আর একজন তাহার স্থান অধিকার করিয়া অগ্রসর হয়। এমনই করিয়া তাহারা দুর্গপ্রাকারের উপরে উঠিল। তাহাদের পশ্চাতে বিপুল সেনাদল। নিরঞ্জনীরা কত মারিবে?

সুতরাং নিরঞ্জনীদের হটিতে হইল। নিরঞ্জনীরা এক পা হটে, রাজরাজেন্দ্রের সেনাদল এক পা অগ্রসর হয়। একদল দেশরক্ষার জন্য—জাতিরক্ষার জন্য যুঝিতেছে, অপর দল পর রাজ্য অধিকারের জন্য—একটি জাতিকে পদ-দলিত করিবার জন্য অস্ত্রধারণ করিয়াছে। একদল ক্ষুদ্র—দুর্ব্বল; অপর দল—বিরাট্ প্রবল।

সেনাপতি ক্ষুধার্ত্ত শার্দ্দুলের মত চীৎকার করিয়া বলিল—ঐ দেখ সূর্য্য পশ্চিম আকাশে ঢলিয়া পড়িতেছে; চাই জীবন্ত শঙ্কর, চাই শত্রুর জাতীয় পতাকা। অগ্রসর হও সৈন্যদল!

আবার রণ-দামামা বাজিয়া উঠিল। রাজরাজেন্দ্রের সৈনিকেরা দুর্গশীর্ষে উঠিতে লাগিল।

আরও দুইদিন পরে। সকল নিরঞ্জনীই দেশের জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছে। অবশিষ্ট বার জন। তাহাদের উপরই নিরঞ্জনীদের জাতীয় পতাকা রক্ষার ভার। দুর্ভেদ্য গিরিশিরে তাহারা দাঁড়াইয়া রহিয়াছে—শত্রুর শরজাল তুচ্ছ করিয়া, ক্ষুধা তৃষ্ণা নিদ্রা উপেক্ষা করিয়া জাতীয় পতাকা সগৌরবে ধারণ করিয়া তাহারা বীরদর্পে দণ্ডায়মান।

তিন দিন পরে রাজরাজেন্দ্রের সেনাদল অমিত-বিক্রমে পথের বাধা বিদূরিত করিয়া দুর্গশীর্ষে অগ্রসর হইল। বার জন নিরঞ্জনী জাতীয় পতাকা রক্ষার জন্য বিপুল পরাক্রমে যুদ্ধ করিয়া একে একে বীরলোকে যাত্রা করিল। তাহারা এমন যুদ্ধ করিয়াছিল যাহা মানুষে পারে না। দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য বুঝি মানুষ এমনই করিয়াই সংগ্রাম করে।

এইবার শঙ্করের পালা। সে যেখানে দাঁড়াইয়া ছিল, তাহা পর্ব্বতের সর্ব্বোচ্চ শিখর। সেখানে কোনও রূপে তিন চারিটী মানুষ দাঁড়াইতে পারে। রাজরাজেন্দ্রের বাছা বাছা কয়জন সৈনিক সেই দুর্গম শিখরে শঙ্করকে বন্দী করিতে যাত্রা করিল। তাহারা অনেক কষ্টে যখন পর্ব্বত-শিখরের অতি নিকটে উপনীত হইল তখন শঙ্কর দেখিল,—আর জাতীয় পতাকার সম্মান-রক্ষা অসম্ভব। রাজরাজেন্দ্রের সৈনিকেরা তাহাকে উদ্দেশ করিয়া বলিল—ক্ষুধায় তৃষ্ণায় অনিদ্রায় জীবন্তে মরিতেছ কেন? তোমার দেশ গিয়াছে, তোমার জাতি মরিয়াছে—তোমার জাতীয় পতাকা লইয়া তুমি নামিয়া আইস, আমরা তোমার গায়ে হস্তক্ষেপ করিব না।

শঙ্কর উত্তর করিল—ক্ষুধা, তৃষ্ণা, অনিদ্রা কোনও ক্লেশই গ্রাহ্য করি না। দেশের জন্য, স্বাধীনতার জন্য, জাতির গৌরবের প্রতীক—জাতীয় পতাকার সম্মান-রক্ষার জন্য এ সকল তুচ্ছ—জীবন তুচ্ছ। তোমরা অপেক্ষা কর—দেখ জাতীয় পতাকা রক্ষার জন্য আমি কেমন করিয়া মৃত্যুকে আলিঙ্গন করি। আমার মৃত্যুর পর তোমাদের যাহা ইচ্ছা করিও। জাতীয় পতাকার গৌরব ও পবিত্রতা রক্ষার জন্য আমি জীবন পণ করিয়াছি।

রাজরাজেন্দ্রের সেনাপতি শিখর-সান্নিধ্যে উপনীত হইয়াছিলেন। তিনি উত্তেজিতকণ্ঠে বলিলেন—শত্রুকে বন্দী কর। তোমাদেরও জীবন পণ। শত্রুর জাতীয় পতাকা ভূলুণ্ঠিত কর।

সৈনিকেরা জীবন পণ করিয়া শিখরে উঠিতে লাগিল। একজন শিখরে উঠিল; আর একজন উঠিবার উপক্রম করিল। শঙ্কর দেখিল—নিরঞ্জনীর সম্মান—জাতির সম্মান আর রক্ষা করা যায় না। সে তখন 'সত্য নিরঞ্জন' বলিয়া জাতীয় পতাকা দৃঢ় মুষ্টিবদ্ধ করিয়া পর্ব্বত-শিখর হইতে সহস্র হস্ত নিম্নে ঝাঁপ দিল।

রাজরাজেন্দ্রের বিপুল বাহিনী নিষ্পলক দৃষ্টিতে এবং সসম্ভ্রম বিস্ময়ে জাতীয় পতাকার সম্মান-রক্ষক বীরের কীর্ত্তি অবলোকন করিল। শঙ্করের উদ্দেশে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিবার জন্য তাহাদের অজ্ঞাতসারে তাহাদের মস্তক নমিত হইল।

গল্প

রন্তী

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ পালিত

১

"আজ আর থাক্ পণ্ডিতজী! আজ বোধ হয় আপনার শরীর অসুস্থ।"

বালিকার পশ্চাতে উপবিষ্ট যোদ্ধা উঠিয়া দাঁড়াইলেন। আপনার ধনুর্ব্বাণ তুলিয়া লইলেন। অদূরে বৃক্ষকাণ্ড লক্ষ্য করিয়া জ্যা টানিলেন। শর গিয়া চিহ্নিত স্থান ভেদ করিল।

যোদ্ধা পুনরায় আসিয়া পূর্ব্ববৎ বাম জানুতে ভর দিয়া, বালিকার পশ্চাতে উপবিষ্ট হইলেন। বালিকার হস্তস্থিত ধনুকের কাণ্ড ধরিয়া তাহাতে শর সংযোগ করিতে বলিলেন। উভয়ে জ্যা টানিয়া ধরিলেন। বালিকার অঙ্গস্পর্শে যোদ্ধা শিহরিয়া উঠিলেন। এবারেও লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইল। বালিকা কহিল,—"পণ্ডিতজী! তার চেয়ে চলুন, আজ ঐ শিলাখণ্ডের উপর কিছুক্ষণ বসি।"

যোদ্ধা বিশুষ্কমুখে কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া কহিলেন,—"তাই চল রাজকন্যা!"

বালিকা ততক্ষণে আসিয়া শিলাখণ্ডের উপর বসিয়া পড়িয়াছে। যোদ্ধা প্রায় কাছাকাছি আসিয়া পৌছিতেই সে কহিল,—"আমাকে রাজকন্যা বলবেন না পণ্ডিতজী! বরং বলুন দস্যুকন্যা।"

যোদ্ধা চমকিয়া উঠিয়া বলিলেন,—"আমি তোমার পিতার অধীন একজন সামান্য কর্ম্মচারী। তোমার ধনুর্ব্বিদ্যা শিক্ষার ভার আমার উপর।"

"শুদ্ধ তারি জন্যে আমি রাজকন্যা হ'তে পরি না।"

"মারহাট্টারাজ দস্যু নয়।"

"আপনার মত বীরের মুখ দিয়ে এরূপ কথা আমি কোন দিন প্রত্যাশা করি নি। আপনি নিজেও মারহাট্টা কি না।"

"রাজকন্যাও মারহাট্টা-দুহিতা।"

"পিতা মারহাট্টা হ'তে পারেন—কিন্তু আমার মা ছিলেন রাজপুতের মেয়ে।"

"রাজকন্যা! অন্ততঃ আমার সমুখে আমার প্রভুকে তোমার দস্যু বলা উচিত নয়।"

"ফের রাজকন্যা! আপনি আমাকে রন্তী বলেই ডাকবেন পণ্ডিতজী।"

"রন্তী! এই চম্বল নদের সৃষ্টি কেমন ক'রে হয় জান? রন্তী দেবীর সমুখে একদিন অসংখ্য পশুবলি হ'য়েছিল। তারই চর্ম্মস্তূপ হতে যে রক্তের স্রোত—। এই চম্বল নদের সঙ্গে প্রতিদিন মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে তোমার কথা মনে হয় আমার রন্তী! আর মনে হয় যুদ্ধক্ষেত্র,—রক্তস্রোত।"

যোদ্ধা একরূপ ভাবিতেছিলেন, বালিকা ভাবিতেছিল অন্যরূপ। বালিকা কহিল,—"মারহাট্টা-রাজ দস্যু নয় কিসে পণ্ডিতজী?"

"শিবাজী দস্যু ছিলেন না।"

"কৈ সে শিবাজীর মহামন্ত্র? পিতার এই রাজপুতদের নগর তবে রোধ ক'রে রাখার উদ্দেশ্য কি বলুন ত পণ্ডিতজী! রাজ্যজয়?"

যোদ্ধা নীরব রহিলেন।

"অর্থসংগ্রহ দস্যুতা—রাজপুতরাজ এক কোটী টাকা দিতে পারলে পিতা নগর ত্যাগ ক'রবেন।" তার পর নিজের মনে বলিতে লাগিল,—"কি নৃশংস দস্যুতা! নানান্ দিক দিয়ে শত্রুরা আসছে আর দেশের বুকে বসে রক্ত শুষছে। দেশের আর আছে কি—মারহাট্টা, রাজপুত, শিখ এরা যদি এক হতে পার ত!" বালিকা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিল।

যোদ্ধা বালিকার দীর্ঘ, বলিষ্ঠ, নিটোল অথচ কুসুমপেলব মূর্ত্তির দিকে অনিমেষনয়নে চাহিয়া ছিলেন। সন্ধ্যার আঁধারের মতই বিষণ্নতা আসিয়া ধীরে ধীরে তাহাকে মলিন হইতে মলিনতর করিয়া তুলিতেছিল। কিয়ৎক্ষণের জন্য উভয়েই নীরব রহিল।

বালিকা কহিল,—"পণ্ডিতজী! আমি ধনুর্ব্বিদ্যা শিখব না। এ এখনকার অস্ত্র নয়। এ অস্ত্র অসভ্যদেরই উপযুক্ত। এখন এমন অস্ত্র চাই, যাতে এমন বিষ থাক্‌বে এমন কালকূট —।" বালিকা আর বলিতে পারিল না। যোদ্ধা ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, —"ধনুর্ব্বাণই ভারতের শ্রেষ্ঠ অস্ত্র। অরণ্যময় পার্ব্বত্যদেশ—এখানে গোলা, গুলী, বারুদ বিশেষ কাজে আসে না।"

বালিকা ঈষৎ উত্তেজিত হইয়া কহিল, "না, আমায় যুদ্ধ করতে হবে। পিতার বিরুদ্ধে আমি অস্ত্রধারণ করব। মারহাট্টাদের তাড়িয়ে তাদের বাড়ী রেখে আসতে হবে—"

যোদ্ধা হাস্য করিলেন।

"আচ্ছা পণ্ডিতজী! রাজপুতনায় কি এমন কোন বীর নাই যে, আজ এই মারহাট্টাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ ক'রে জয়ী হ'তে পারে?"

যোদ্ধা চিন্তিত হইলেন।

"রাণাবংশে?—রাণা প্রতাপের বংশে?—"

"আছে, সে লাল সিং। লাল আমারই বন্ধু! আমারই নিকট সে মারহাট্টার রণকৌশল শিক্ষা করেছিল।"

"লাল সিং? শুনেছি বটে। আপনার পরিচিত? সে আপনার বন্ধু?"

বালিকা কিছুক্ষণ কি চিন্তা করিল, তার পর কহিল, "পিতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার জন্যে এই লাল সিংকে যদি সাহায্য করতে পারেন পণ্ডিতজী, তা হ'লে আমি আপনাকে বিয়ে করতে রাজী আছি।"

যোদ্ধা একবার উৎফুল্ল হইলেন। পরক্ষণেই নৈরাশ্য আসিয়া তাঁহার দৃষ্টি ভাসাইয়া দিল।

গাত্রোত্থান করিবার পূর্ব্বে বালিকা একবার চোখের কোণে যোদ্ধার মুখের দিকে চাহিল। বালিকা সুন্দরী এবং আগতযৌবনা হইলেও যোদ্ধা সে দৃষ্টিতে তাহার প্রীতি বা সারল্যের চিহ্ন কোথাও খুঁজিয়া পাইলেন না। বরং বুঝিলেন যে, সে স্থিরপ্রতিজ্ঞ।

"বেশ করে ভেবে দেখুন পণ্ডিতজী! আবশ্যক হ'লে আপনার প্রভুর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণও করতে হবে। না পারেন, আমার আশা ত্যাগ করুন। রম্ভীর এক কথা। আমার অশ্ব?"

রম্ভী শিস্ দিতেই অদূরে অশ্বের হ্রেষারব শ্রুত হইল। রম্ভী তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেল। তখন সন্ধ্যা হয় হয়।

২

বহুক্রোশ অশ্বারোহণে আসিবার পর রাত্রি-শেষে এক অরণ্যপ্রান্তে পৌঁছিয়া রম্ভী অশ্ববল্গা সংযত করিল। আকাশে তখনও জ্যোৎস্না ছিল। দূরে কুঞ্জমধ্যে এক রাজপুত যোদ্ধার উষ্ণীষ দেখা যাইতেছিল। অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া রম্ভী ধীরে ধীরে সেই কুঞ্জের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল।

তখন সবে মাত্র মোগল-সাম্রাজ্যের পতন হইয়াছে। ইংরাজ রাজ্যেরও প্রতিষ্ঠা হয় নাই। দেশ অরাজক। যেখানে সেখানে পথে ঘাটে দস্যু-তস্করেরা যখন তখন নির্ভয়ে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। রম্ভীর প্রথমটা খুব ভয় করিতে লাগিল। নিকটেই অশ্ব বাঁধিয়া সাহসে ভর করিয়া সে গিয়া বৃক্ষান্তরালে লুকাইল।

লালসিংহ বুকের ভিতর ইলাকে টিপিয়া ধরিয়াছিলেন। রাজপুত বীরের প্রশস্ত বক্ষ ইলার চোখের জলে ভাসিয়া যাইতেছিল।

"ইলা—ইলারাণী! লাল ত তোমার যোগ্য নয়। সে দরিদ্র সামান্য কর্ম্মচারী। যুদ্ধ তার বৃত্তি। রাজপুতানার রাণা বংশের অনেক যোগ্য বীর তোমাকে অক্ষয় কবচের মত বক্ষে ধারণ করবে। যাও,—তুমি তোমার সেই রাজ-অন্তঃপুরে ফিরে যাও।"

ইলা কাঁদিতে লাগিল।

লাল। যে ভালবাসার জন্যে তোমার পিতা আজ আমায় নির্ব্বাসিত করলেন, সেই ভালবাসাই হয় ত আবার কাল তোমার ও আমার উভয়েরই মৃত্যুর কারণ হতে পারে।

ইলা। যুদ্ধ তোমার বৃত্তি, তুমি ত মৃত্যুকে ভয় কর না। আমিও রাজপুতের মেয়ে, আমারই বা মরণে ভয় কি? প্রিয়তম! তোমার মত বীর আর রাজপুতানায় কে আছে? তোমার মত স্বামিলাভ রাজপুত-বালিকার তপস্যা।

লাল। ইলা! তুমি ফিরে যাও। নইলে অনেক অশুভ ঘটতে পারে।

ইলা। ঘটে ঘটুক! এখন তুমি কোথায় যাবে ঠিক ক'রেছ?

লাল। যেখানে যুদ্ধ। আগুন আমার কর্ম্মস্থল।

ইলা আবার কাঁদিতে আরম্ভ করিল।

লাল। প্রভাত হয়ে আস্‌ছে ইলা! তুমি ফিরে যাও। উপস্থিত আমি আমার এক মারহাট্টা বন্ধুর কাছে যাব। অনেক দিন তার সঙ্গে দেখা করি নি।

অশ্বারোহণে রম্ভী।

ইলা। আমিও তোমার সঙ্গে যাব।

"বালিকা!"—লালসিংহ হাস্য করিলেন।

"প্রিয়তম!" বলিয়া ইলা লাল সিংহের গলা জড়াইয়া ধরিল।

"ইলা! আমি আবার ফিরে আসব"—বলিয়া লাল সিংহ একলম্ফে অশ্বে উঠিলেন। অভিমানে বুক ভরিয়া লইয়া ইলাও অশ্বে উঠিল। গ্রীষ্মকাল। মৃদুমন্দ বাতাস বহিতেছিল। কোকিল ডাকিতেছিল। অশ্ব হইতে মুখ বাড়াইয়া লালসিংহ ইলাকে চুম্বন করিলেন।

"কোথা যাও বন্ধু!" রম্ভী আসিয়া ইলার অঞ্চল টানিয়া অশ্ব থামাইল। লাল সিংহ তখন অনেক দূর চলিয়া গিয়াছেন।

"উনি বুঝি তোমার বর?"

"কে তুমি ভাই?"—ইলা অশ্ব হইতে নামিল।

"বেশ ভাই তোমার চেহারাখানি।" বলিয়া রম্ভী ইলার গাল দুইটি টিপিল।

ইলা অবাক্ হইয়া রম্ভীর দিকে চাহিয়া রহিল।

"কি দেখছ? ওঁর নাম বুঝি লাল? তোমার তা হ'লে লাল বর?"

ইলা লজ্জার হাসি হাসিল।

"এরি মধ্যে কোথায় যাবে ভাই? এখনো ভোর হয় নি। এসো এইখানে ব'সে একটু গল্প করি।"

উভয়ের অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তা হইল। যেন কতদিনের পরিচয়—কত কালের বন্ধুত্ব। খুব কম সময়ের মধ্যে সকলের সঙ্গে আলাপ করিয়া লওয়াটা রম্ভীর গুণের মধ্যে ছিল। ইলা খুব বেশী কথা বলিল। কেবল লাল সিংহের বিষয়! কেমন করিয়া তিনি জতোয়ারো যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছিলেন। কি বিপুল বিক্রমে যুদ্ধ করিয়া তিনি তাহার পিতাকে রক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রতি তাহার অনুরাগের কথা কেমন করিয়া তাহার পিতা জানিতে পারিয়াছিলেন। কেমন করিয়া পিতা প্রকাশ্য সভায় তাঁহাকে নির্ব্বাসনদণ্ড দিলেন। তার পর কেমন করিয়া, কি দারুণ যন্ত্রণা বক্ষে চাপিয়া সে এই কিছুপূর্ব্বে তাঁহাকে তাহার হৃদয় সর্ব্বস্বকে নির্ব্বাসনে বিদায় দিল; সমস্তই বলিল। ইলা অনেক কাঁদিল, অনেক দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল। রম্ভী সমস্তই শুনিল। কখনও অঞ্চল দিয়া তাহার চক্ষু মুছাইয়া দিল, কখনও দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া সমবেদনা প্রকাশ করিল। নিতান্ত বালিকা-প্রকৃতি ইলা অন্তরের দুঃখ জানাইয়া প্রাণ লঘু করিল। রম্ভী নীরব থাকিয়া, নীরবে ইলার সমস্ত ব্যথার কথা শুনিয়া আপনার হৃদয়-ব্যথা দ্বিগুণ করিয়া লইল। তার পর প্রভাত হইল। সূর্য্য উঠিল। বন্য জন্তু ঘরে ফিরিল। মাঠে মাঠে গোপাল দেখা দিল। রম্ভী ও ইলা অশ্বারোহণ করিল। নির্দ্দিষ্ট দিনে, নির্দ্দিষ্ট সময়ে এইস্থানে দেখা হইবে—রম্ভী পুনর্ব্বার ইলাকে ইহা বলিয়া দিল। তার পর দুইজনের অশ্ব দুইদিকে ছুটিল।

৩

গভীর রাত্রে এক নিবিড় অরণ্যে এক অতি প্রাচীন জীর্ণ মন্দিরের ভিতরে প্রবেশ করিয়া দস্যু-সর্দ্দার রম্ভীকে বন্ধনমুক্ত করিল। অনুচরেরা মশাল জ্বালিয়া দিল। রম্ভী একবার মাত্র দস্যুসর্দ্দারের ভীষণ মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া দেখিল। সর্দ্দারও রম্ভীর দিকে চাহিল। সে দেখিল, বালিকা বালিকা, কিন্তু নিতান্ত নির্ভীক।

রম্ভী কহিল—"একটি সামান্য রমণীকে অপহরণ ক'রে নিয়ে আসায় দস্যুসর্দ্দারের কি উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে—বুঝলাম না।"

দস্যুসর্দ্দার। সত্য বটে। এতে আমার উদ্দেশ্য কি তা তোমার মত বালিকার পক্ষে বোঝা কঠিন।

রম্ভী। আমি নিরস্ত্র।

দ। আবশ্যক হ'লে দস্যুসর্দ্দারের নিকট অস্ত্রের অভাব হবে না।

র। আমার অস্ত্র চাই—আত্মরক্ষার জন্য আমার অস্ত্রের প্রয়োজন।

দ। কোন চিন্তা নাই বালিকা! কেউ তোমার ওপর কোন অত্যাচার ক'রবে না।

র। তা হ'লে আমি মুক্ত।

সর্দ্দার হাসিয়া বলিল—"মুক্ত নও। যতদিন না তোমার পিতার নিকট হ'তে দশ লক্ষ টাকা আদায় হয়, ততদিন তোমাকে এইখানে থাকতে হবে।"

রত্নী চিন্তিত হইল। পরে কহিল—"আর যদি আমার পিতা দশ লক্ষ টাকা দিতে অসমর্থ হন—?"

দ। তা হ'লে তোমাকে বেঁধে নিয়ে আস্‌তাম না।

র। দশ লক্ষ টাকা নিয়ে তোমার কি হবে দস্যু?

দ। টাকা নিয়ে কি হবে?—টাকা নিয়ে মানুষের যা হয় আমারও তাই হবে। তবে তোমার পিতা-দস্যুর টাকা নিয়ে যা হয়—বিলাস বাসনা পূর্ণ করা, এ দস্যুর তা হবে না। রাজপুতদের নগর আক্রমণ ক'রে, তোমার পিতা যে টাকাটা লুট ক'রবে, সেই টাকা আবার আমি তোমার পিতার নিকট হ'তে লুট ক'রে সেই রাজপুতদেরই বিলিয়ে দেব। তোমার পিতাকে খবর দেওয়া হ'য়েছে। দশ লক্ষ টাকা এসে পৌছলে তবে তুমি মুক্ত।

রত্নী নীরব রহিল।

"মঙ্গল"—

লাল সিংহ মন্দিরে প্রবেশ করিয়াই সম্মুখে রত্নীকে দেখিতে পাইলেন। বিস্মিত হইয়া কহিলেন —"একি! মঙ্গল! এত অধঃপতন তোমার?"

অকস্মাৎ এরূপ সময়ে লাল সিংহের আগমনে মঙ্গল চমকিয়া উঠিল। ভয় পাইয়া কোন কথা বলিতে পারিল না। লাল সিংহ কিয়ৎক্ষণ দস্যুর প্রতি স্থির দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া পরে কহিলেন,—"এর মধ্যেও তোমার কি সদুদ্দেশ্য থাকতে পারে তা বুঝলাম না।"

মঙ্গল নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল।

রত্নী একদৃষ্টিতে লালসিংহের দিকে চাহিয়াছিল। সে দেখিতেছিল—কি সুন্দর গৌর কান্তি, কি বীরোচিত, উন্নত ভঙ্গি!

লালসিংহ সে দৃষ্টি লক্ষ্য করিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন—"মঙ্গল! কে এ বালিকা?"

মঙ্গল প্রথমে দ্বিধা করিল। তার পর কহিল—"মারহাট্টা-রাজকন্যা।"

"মঙ্গল! অনেক দিন তোমার কোন খবর নিই নি। রাণাকে রক্ষা ক'র্‌তে হবে। কাল প্রভাতে মারহাট্টাদের আক্রমণ কর। তোমার সৈন্যবল কত?"

মঙ্গল লালসিংহের পদতলে তরবারি রাখিয়া কহিল—"উপস্থিত চার'শ'।"

"তা হ'লে প্রস্তুত হও। কালই আমার সঙ্গে যোগ দিতে হবে। আমি আমার এক মারহাট্টা বন্ধুর নিকট তাদের অনেক গুপ্ত খবর জান্‌তে পেরে, কাল প্রভাতেই তাদের আক্রমণ করবার উপযুক্ত কাল ঠিক ক'রেছি।"

মঙ্গল ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিল, "পণ্ডিতজী বোধ হয়।"

"হাঁ পণ্ডিতজী! পণ্ডিতজী এরূপ বিশ্বাসঘাতক তা আমি আগে জানতাম না। কাল তা'কে আমি যৎপরোনাস্তি অপমান ক'রেছি।

"পণ্ডিতজী—বিশ্বাসঘাতক!"

"হাঁ পণ্ডিতজী বিশ্বাসঘাতক। আমি তার মুখ আর কখনো দেখব না বলে এসেছি।"

মঙ্গল চিন্তিত হইল। লালসিংহ কহিলেন—"এই বালিকাকে মুক্ত ক'রে দাও।" তার পর

বালিকার দিকে চাহিলেন। বালিকা তখনও তাঁহার দিকে চাহিয়াছিল। লালসিংহ ভাবিলেন, এ কি পাষাণী? বলিলেন—বালিকা। তুমি মুক্ত।"

লাল সিংহের আশঙ্কা হইল—হয় ত বালিকা ভয়ে অভিভূতা অথবা জ্ঞানশূন্যা। তাই আবার বলিলেন,—"বালিকা মুক্ত তুমি।" রস্তী তথাপি নিশ্চল।

লাল সিংহ গিয়া রস্তীর হাত ধরিলেন। রস্তীর সর্ব্বাঙ্গে তড়িৎ ছুটিল। সে কাঁদিবার উপক্রম করিল, পারিল না। লাল সিংহ মঙ্গলকে কহিলেন, "মঙ্গল! বালিকাকে ওর পিতার নিকট পৌঁছে দিয়ে এসো।" মঙ্গল অশ্বের সন্ধানে বাহিরে গেল। রস্তী অঞ্চলে চোখ ঢাকিল। কাঁদিয়া কহিল,—"লাল সিংহ! তুমি আমার হস্ত স্পর্শ করলে কেন? আমি যে হিন্দু-কন্যা।"

লাল সিংহের ইলাকে মনে পড়িল। তিনি কিয়ৎক্ষণের জন্য বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইলেন।

৪

গভীর চিন্তা-নিমগ্ন পণ্ডিতজী উদ্যানে পদচারণা করিতে ছিলেন। লাল সিংহ প্রভাতে মারহাট্টা শিবির আক্রমণ করিয়াছেন। সমগ্র দিবসব্যাপী যুদ্ধ। নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে মনুষ্য কি পশুর গতায়াত বন্ধ হইয়াছে। চারিদিক নিস্তব্ধ। দূরে রণ-কোলাহল কখনও অস্পষ্ট, কখনও বা স্পষ্ট রূপে শুনা যাইতেছিল। মারহাট্টা রাজপুত সকলেই রণস্থলে রণোন্মত্ত। কেবলমাত্র পণ্ডিতজী,—মারহাট্টা-রাজের প্রধান সেনাপতি ধীর পদসঞ্চারে উদ্যান পরিভ্রমণ করিতেছিলেন, দুশ্চিন্তায় জর্জ্জরিত হইতে ছিলেন। কখনও বা অস্ফুট শব্দোচ্চারণে আপনাকে শত ধিক্কার দিতেছিলেন। তাঁহার মুহুর্মুহু মনে হইতেছিল, পূর্ব্ব দিনের লাল সিংহের সেই তিরস্কারের কথা। তাঁহার কেবলই মনে হইতে ছিল, তবে কি তিনি সত্যই বিশ্বাসঘাতক? কিসে? রস্তী বলিয়াছিল;—মারহাট্টা-রাজ ত দস্যু! সত্যই ত তিনি তাঁর প্রধান সেনাপতি।—কিন্তু তাই বলিয়া তাঁর এরূপ দস্যুতার প্রশ্রয় দেওয়া ঠিক নয়। আবার মনে হইতেছিল—না! লাল সিংহই ঠিক। হাজার হউক তিনি তাঁর প্রভু। তিনি মারাহাট্টা-রাজের প্রধান একজন কর্ম্মচারী। ওঃ কি ভয়ানক বিশ্বাসঘাতকতা! এর প্রায়শ্চিত্ত কোথায়?

"পণ্ডিতজী!"

পণ্ডিতজী চমকিত হইয়া ফিরিয়া চাহিলেন। স্বপ্নঘোরে যেন দেখিলেন—রস্তী।

রস্তী কহিল—"পণ্ডিতজী! আজ আপনাকে খুব রুক্ষ বিষণ্ণ দেখাচ্ছে।"

হুঁ না বলিয়া পণ্ডিতজী যেন অস্পষ্ট রণ-কোলাহলে কর্ণপাত করিবার চেষ্টা করিলেন।

রস্তীও কিয়ৎক্ষণ কান পাতিয়া রহিল। তার পর কহিল—"যুদ্ধ চলেছে!—কি ভয়ানক যুদ্ধ! কি তেজস্বী লাল সিংহ! বীর বটে পণ্ডিতজী! আমার জন্যে আপনি আজ যে কাজ করলেন তাতে ঘৃণা করবার অনেক কিছু থাকলেও আমি আপনার নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি।"

"রস্তী!"—পণ্ডিতজীর মুখ পাংশু বর্ণ হইল।

"পণ্ডিতজী!" রস্তীর চোখ দিয়া এক ফোঁটা অশ্রু গড়াইল।

ঊর্দ্ধশ্বাসে ক্ষতবিক্ষত দেহে একজন সৈনিক আসিয়া ডাকিল, "পণ্ডিতজী!"

পণ্ডিতজী ও রস্তী ফিরিয়া চাহিলেন।

সৈনিক হাঁফাইতে হাঁফাইতে কহিল, "মারহাট্টা-রাজ আহত—সৈন্য সব ছত্রভঙ্গ।"

পণ্ডিতজী ডাকিলেন—"রস্তী!"

দূরে—প্রান্তরে মারহাট্টা শিবির শ্রেণী অঙ্কিত চিত্রের ন্যায় দেখা যাইতেছিল। কোথাও আগুন জ্বলিতেছিল। কোন স্থান অজস্র গোলাবর্ষণে ধ্বংস হইতেছিল। সৈন্যেরা ছুটিয়া পলাইতেছিল। রম্ভী সেইদিকে চাহিয়াছিল। পণ্ডিতজী রম্ভীর মুখের দিকে চাহিয়া যেন কিসের ইঙ্গিত পাইলেন। উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন—"সৈন্যদের ফেরাও সৈনিক! আক্রমণ কর" বলিয়া অস্ত্রাগারের দিকে ছুটিলেন।

অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া আসিয়া পণ্ডিতজী দেখিলেন,—রম্ভী তখনও সেইদিকে চাহিয়া আছে—ডাকিলেন "রম্ভী!"

রম্ভী কহিল—"পণ্ডিতজী!—লাল সিংহকে বন্দী ক'র্‌তে পারেন?"

তোমার জন্য পণ্ডিতজী সবই ক'র্‌তে পারে

পণ্ডিতজী অশ্ব ছুটাইলেন।

যুদ্ধাবসান হইলে সন্ধ্যার পর জ্যোৎস্নায় চম্বল-তীরে অরণ্যপ্রান্তে এক উন্মুক্ত স্থানে গিয়া রম্ভী ইলার সহিত মিলিত হইল। পক্ষাধিক পূর্ব্বে তাহাদের এইরূপ কথাবার্ত্তা হইয়াছিল। রম্ভী ইলাকে বলিল,—লাল সিংহ বন্দী হইয়াছে। ক্রমে ক্রমে ইহাও জানাইল যে, কাল প্রভাতে তাহার প্রাণদণ্ড হইবে। ইলা কাঁদিতে লাগিল। রম্ভী অনেকক্ষণ ইলার মস্তক বুকে ধরিয়া চুপ করিয়া রহিল। শেষে সেও কাঁদিতে লাগিল। সেই নীরব নিশীথে নিস্তব্ধ আকাশতলে বসিয়া উভয়ে অনেকক্ষণ অশ্রু বিসর্জ্জন করিল। ইলা ভাবিল, রম্ভী তাহারই দুঃখে দুঃখিত হইয়া, তাহারই বেদনায় ব্যথিত হইয়া সমবেদনা প্রকাশ করিতেছে। রম্ভী মিথ্যা করিয়া জানাইল যে, সে এইমাত্র তাহার মৃত স্বামীকে যুদ্ধক্ষেত্রে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া আসিতেছে। উভয়ে আবার কাঁদিল। দ্বিগুণ বেগে অশ্রু ছুটিল, গণ্ড ছাপাইয়া বক্ষ ভিজাইল। প্রকৃতিস্থ হইলে উভয়ে গাত্রোত্থান করিল। অগ্নিকুণ্ড প্রস্তুত করিবার জন্য কাষ্ঠ আহরণ করিতে লাগিল। ক্ষণকাল মধ্যেই কাষ্ঠ সংগৃহীত হইল। ইলা তখনও কাঁদিতেছিল। রম্ভী ইলাকে সেইস্থানে বসিতে বলিল এবং বলিল, সে যদি সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে লাল সিংহকে সঙ্গে লইয়া ফিরিতে না পারে, তাহা হইলে ইলা যেন কুণ্ডে অগ্নি-সংযোগ করিয়া তাহাতে প্রাণ বিসর্জ্জন করে।

অরণ্য হইতে বাহির হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রের উপর দিয়া অশ্ব ছুটিল। চারিদিক শান্ত, স্থির ও নিস্তব্ধ। প্রতি মুহূর্ত্তে হত সৈনিকদের মৃতদেহ-স্পর্শে অশ্বের চরণ প্রতিহত হইতে লাগিল। রম্ভী আসিয়া পণ্ডিতজীর শয়ন কক্ষের দ্বারে করাঘাত করিল।

পণ্ডিতজী জাগিয়া ছিলেন। শয্যা-কণ্টক বোধ হওয়ায় কক্ষমধ্যে পদচারণা করিতেছিলেন। এরূপ দুঃস্বপ্ন-জড়িত নিদ্রা, এরূপ অশান্তিকর রজনী তিনি জীবনে খুব কমই পাইয়াছেন। রম্ভীর ইচ্ছায় তিনি লাল সিংহকে মারহাট্টা-রাজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করাইলেন; নিজে নিরস্ত্র থাকিয়া প্রভুর নিকট বিশ্বাসঘাতক হইলেন। রম্ভীর ইচ্ছায় লাল সিংহকে বন্দী করিয়া পুনরায় তাহার সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিলেন। প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে প্রিয়তম বন্ধু লাল সিংহ—রাজপুতনার একমাত্র বীরের জীবন শেষ—সেও রম্ভীর ইচ্ছা! রম্ভী কি মায়াবিনী? রম্ভী! রম্ভী!

রম্ভী দ্বারে করাঘাত করিয়া ডাকিলেন—"পণ্ডিতজী!"

স্বপ্নভ্রমে—পণ্ডিতজী আপনাকে চেতন করিবার চেষ্টা করিলেন।

"পণ্ডিতজী!"

পণ্ডিতজী আসিয়া দ্বার খুলিলেন এবং বিস্মিত হইয়া দেখিলেন—নিশীথ সময়ে রম্ভী—রাজকন্যা তাঁহার শয়ন-কক্ষে!"

রম্ভী হাসিয়া উঠিল। কহিল—"আশ্চর্য্য হ'চ্ছেন পণ্ডিতজী? সব ঠিক। প্রভাতে আপনার সঙ্গে—চম্বলতীরে—সেই স্থানে—রম্ভীর মিলন।"

পণ্ডিতজী তাড়াতাড়ি দ্বারবন্ধ করিয়া দিলেন।

"পণ্ডিতজী! পণ্ডিতজী!"

অনেকক্ষণ পরে পণ্ডিতজী পুনরায় দ্বার খুলিলেন। রম্ভী কহিল—"আমি রম্ভী কারাগারের চাবি দিন। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে সেই স্থানে উপস্থিত হ'তে না পারেন, রম্ভীর সঙ্গে জীবনে আর সাক্ষাৎ হবে না।—এ স্বপ্ন নয়।"

নিদ্রা-ঘোরে লাল সিংহ কারাগারের দ্বারোদ্ঘাটনের শব্দ পাইলেন। শৃঙ্খলিত চরণে উঠিয়া বসিলেন। রম্ভী আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল। লাল সিংহের মনে হইল, কোন সুরবালা স্বর্গ হইতে নামিয়া আসিলেন। রম্ভী কহিল, "লাল সিংহ! আমায় চিন্‌তে পারচেন?"

লাল সিংহ নীরব থাকিয়া রম্ভীকে চিনিবার চেষ্টা করিলেন। স্মরণ করিতে পারিলেন না। রম্ভী কহিল, "সেই মহারণ্যে মন্দিরাভ্যন্তরে মঙ্গল দস্যুর আড্ডায় ভেবে দেখুন! আর একদিন তার পূর্ব্বে সেই জ্যোৎস্না রাত্রে, চম্বল তীরে ইলার কাছে বিদায় নিলেন। আমি সেদিন কুঞ্জমধ্যে লুক্কায়িত ছিলাম।"

লাল সিংহ অর্দ্ধস্ফুট বচনে মাত্র কহিলেন,—"মারহাট্টা নন্দিনী!"

"হাঁ, মারহাট্টা-নন্দিনী। আমার করস্পর্শ করেছিলেন সেদিন আপনি, মনে আছে? আমি হিন্দুনারী, ধর্ম্মতঃ আপনি আমার স্বামী।"

"আমায় ক্ষমা কর রাজকন্যা! আমি বিবাহিত।"

"লাল সিংহ! বীর! তোমার কি প্রাণের মমতা নাই? আমাকে বিবাহ করলে তুমি এই মুহূর্ত্তে মুক্ত হ'তে পারবে।"

"চাই না মুক্তি।"

রম্ভী বিস্মিত হইল। কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া কি ভাবিয়া ধীরে ধীরে লালসিংহের শৃঙ্খল মোচন করিতে লাগিল।

"লালসিংহ! মুক্ত তুমি।"

"রাজকন্যা! আমি ত আগেই ব'লেছি, আমি মুক্তি চাই না। আমি তোমার করুণার ভিখারী নই।"

"লাল সিংহ! মরবার পূর্ব্বে তোমার কি একবারও ইলাকে দেখবার সাধ হয় না?"

"ইলা! কোথায় ইলা!"

"এসো আমার সঙ্গে।"

প্রভাত হইয়া আসিতেছিল। অনেকক্ষণ ধরিয়া পথপানে চাহিয়া থাকিয়া, হতাশ হইয়া ইলা চম্বলের জলে স্নান করিয়া আসিয়া, কুণ্ডে অগ্নি সংযোগ করিল। দাউ দাউ করিয়া কুণ্ড জ্বলিয়া উঠিল। তাহাতে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে ইলা আর একবার পথের দিকে ফিরিয়া চাহিল। দূরে অশ্ব-পদোত্থিত ধূলিরাশি দেখিতে পাইল। দেখিতে দেখিতে অশ্ব নিকটবর্ত্তী হইল। পণ্ডিতজী অশ্ব হইতে অবতরণ করিলে ইলা লাল সিংহ ভাবিয়া তাঁহার চরণতলে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল। "রম্ভী! রম্ভী!" বলিয়া পণ্ডিতজী ইলাকে তুলিলেন। কিন্তু অগ্নিকুণ্ডের আলোকে ইহার মুখচ্ছবি দেখিয়াই বিস্ময়-বিমূঢ় হইয়া আপন মনে কহিলেন, "এ কি! কে এ?"

তৃণ-শয্যায় ইলার সুঠাম দেহলতা বিছাইয়া রাখিয়া পণ্ডিতজী চম্বল হইতে তাড়াতাড়ি জল আনিয়া তাহার মুখে দিলেন। একটু পরেই ইলার চেতনা সঞ্চারিত হইল। সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে লাল সিংহকে সঙ্গে লইয়া রম্ভীও সেখানে উপস্থিত হইল। লাল সিংহের হস্ত লইয়া রম্ভী ইলার হস্তের

উপর স্থাপন করিয়া কহিল,—"ইলা! বন্ধু! ভগিনী! এই নাও তোমার হৃদয়সর্ব্বস্ব! বড় ভাগ্যবতী তুমি।" পণ্ডিতজীর সমুখে নতজানু হইয়া কহিল, "পণ্ডিতজী! গুরুদেব! আমায় ক্ষমা করুন।" তার পর হরিণীর মত দ্রুতগতিতে ছুটিয়া সে চম্বলে অবগাহন করিল।

অগ্নিকুণ্ড তখনও জ্বলিতেছিল। সিক্তবসনে রন্তী আসিয়া পণ্ডিতজীর পদধূলি লইল। তার পর কুণ্ডে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

পণ্ডিতজী চীৎকার করিয়া উঠিলেন,—"রন্তী! রন্তী!"

শিশু-প্রতিভা

চারি বৎসরের শিশু 'ভূপাই' ঢোল বাজাইয়া গানের সহিত সঙ্গত করিতেছে।

নাটক

মীনা

শ্রীপাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায়

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

কক্ষ

অনঙ্গাপীড় ও সুনন্দা

অনঙ্গা। তুমি আমায় বৃথা প্রবোধ দিচ্ছ রাণি—উৎপল কখনও গৃহে ফিরবে না। আজ আমার বাল্যের কথা স্মরণ হচ্ছে, আমিও এমনি অভিমানী ছিলুম। মনে পড়ে, রাণি—যৌবনের নিরন্তর ভোগ-বিলাসে মত্ত ব'লে আমার পরমারাধ্য পিতৃদেব আমায় একদিন অলস আমোদপ্রিয় ব'লে ধিক্কার দিয়েছিলেন, সেই দিন—সপ্তবিংশবর্ষীয় যুবক আমি—মাত্র দুইশত অনুচর সঙ্গে নিয়ে দিগ্বি-জয়ে বেরিয়েছিলুম, উত্তর ও পশ্চিম ভারতের বুকের ওপর দিয়ে ঐ নামমাত্র সেনা নিয়ে গুজরাট অভিমুখে যাত্রা করি—দুই একটা রাজ্যও জয় করেছিলুম। তার পর—

সুনন্দা। তার পর কি হ'ল, মহারাজ? কোন রূপ বিপদ হয়েছিল বোধ হয়? ফিরে এসে ত এ কথা আমায় বলেন নি?

অনঙ্গা। বিপদ—হাঁ—তা একরকম বিপদ বৈ কি!

সুনন্দা। এমন কি বিপদ মহারাজ?

অনঙ্গা। ঠিক বিপদ বলা যায় না—তবে—থাক্ সে কথা। উৎপল আমারই মত অভিমানী, নইলে সপ্তাহের জন্য নির্ব্বাসন-দণ্ডে দণ্ডিত যুবক, পক্ষাধিক কাল অতীতপ্রায়, আজও গৃহে ফিরল না।

সুনন্দা। আমার মন বল্‌ছে, সে নিশ্চয়ই ফিরে আস্‌বে।

অনঙ্গা। যদি সে ফিরে আসে, তা হ'লে বুঝব—সে আমার পুত্র নয়।

সুনন্দা। ওকি কথা বলছেন, মহারাজ! যার প্রত্যাগমনের আশায় মহারাজ এতটা দারুণ উৎকণ্ঠা নিয়ে প্রতিমুহূর্ত্ত যাপন করছেন, তার প্রত্যাবর্ত্তন এখন মহারাজের অভিপ্রেত নয়?

অনঙ্গা। এতদিন পুত্রস্নেহে আত্মহারা হয়ে ছিলুম, নিজের কথা ভাববার অবসর পাই নি, আজ আমার বংশগত অভিমান জেগে উঠেছে—এই অভিমানই উৎপলের বংশ-পরিচয়। যদি রাজ্য-লোভে সে এ অভিমান ভুলে যায়, তা হ'লে বুঝব রাণি! সে আমার পুত্র নয়—বংশের কেউ নয়। আর যদি সে না ফিরে আসে ওকি, কাঁদছ? কাঁদ—কাঁদ—উপযুক্ত পুত্রকে হারিয়েছ, কাঁদবে বৈ কি।

সুনন্দা। মহারাজ—

অনঙ্গা। বল্‌তে চাইছ, তুচ্ছ অভিমান—পুত্রের তুলনায় কিছুই নয়—কেমন? তা নয়,—ঐ অভি-মানের মূলে জন্মগত সংস্কার—বংশগত আচার—পিতাপুত্রের সম্বন্ধ। অভিমানী পিতার অভিমানের ফল দিগ্বিজয়-যাত্রা—অভিমানী পুত্রের গৃহত্যাগ।

সুনন্দা। কিন্তু মহারাজ ত গৃহে ফিরে এসে-ছেন।

অনঙ্গা। ঘটনাক্রমে একটা করুণ স্মৃতি বুকে নিয়ে ফিরে আস্‌তে বাধ্য হ'য়েছিলুম।

সুনন্দা। করুণ স্মৃতি কার, তা কি জিজ্ঞাসা ক'র্‌তে পারি, মহারাজ?

অনঙ্গা। অবাধে প্রশ্ন কর রাণি! আমিও নিঃসঙ্কোচে তোমার প্রশ্নের উত্তর দেব। যেন কতদিনের—যেন যুগান্তের কোলে সুপ্ত এক

মধুময় স্মৃতি আজ সহসা জীর্ণ মলিন বেশে আমার চোখের সম্মুখে ভেসে উঠেছে। স্মৃতির অধিষ্ঠাত্রী দেবী সিন্ধুনদ-তীরবর্ত্তী এক ক্ষুদ্র পল্লীবাসী এক বৃদ্ধের কন্যা—স্বল্পকালের জন্য আমার দৃপ্ত লালসার অগ্নিতে ইন্ধনরূপে পতিত হ'য়েছিল। প্রতিদানে পেয়েছিল—একটী প্রস্ফুটিত গোলাপের মত সুন্দরী কন্যা। তার পর ঘুম ভেঙে গেল—জেগে উঠে দেখলুম—আমি এই সুরম্য কাশ্মীর প্রাসাদে—পিতার আদেশে নজরবন্দী!

সুনন্দা। সে রমণীকে কি বিবাহ করেছিলেন, মহারাজ?

অনঙ্গ। ক'রেছিলুম।

সুনন্দা। তবে তাকে পরিত্যাগ ক'র্লেন কি অপরাধে?

অনঙ্গ। দরিদ্রের কন্যা সে, পাছে বংশ-মর্য্যাদার হানি হয়, তাই পিতা কৌশলে আমায় সেখান থেকে স্থানান্তরিত করেন।

সুনন্দা। উঃ—কি নিষ্ঠুরতা! তাও কি মহারাজের অজ্ঞাতে?

অনঙ্গ। অনেকটা তাই। পিতা আমাকে সেখান হ'তে স্থানান্তরিত কর্‌বার উদ্দেশ্যে কয়েক জন চর নিযুক্ত করেছিলেন। মিথ্যা পরিচয় দিয়ে তারাই হ'য়েছিল আমার সঙ্গী। তাদের সঙ্গে প্রায়ই শিকারে যেতুম। একদিন শিকার ক'রে ফির্‌তে অনেকটা বিলম্ব হয়; অন্ধকারে বুঝতে পারি নি যে—আমি আমার বজরায় না উঠে অন্য বজরায় উঠেছি। তার পর ক্লান্তি-বশতঃ ঘুমিয়ে প'ড়েছিলুম; তার পর প্রভাতে নিদ্রাভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে দেখলুম, পিতা আমার সম্মুখে। তার পর পিতার সঙ্গে কাশ্মীরে ফিরে এলুম।

সুনন্দা। তার পর সে রমণীর আর কোন সংবাদ পেয়েছিলেন?

অনঙ্গ। অনেক চেষ্টা ক'রেও তাদের আর কোন সংবাদ পাই নি। শুধু এইমাত্র জেনেছিলুম—তারা আমার নিরুদ্দেশের পর সে গ্রাম ছেড়ে কোথায় চ'লে গেছে।

সুনন্দা। আহা হতভাগিনী! মহারাজের কি মনে হয়—তারা এখনও জীবিত?

অনঙ্গ। জগদীশ্বর জানেন।

সুনন্দা। যদি জীবিত থাকে, তা হ'লে তাদের দেখলে কি মহারাজ চিন্‌তে পার্‌বেন?

অনঙ্গ। একজনকে হয় ত পার্‌ব, কিন্তু সেই দুগ্ধ'পোষ্য শিশুকে কেমন ক'রে চিন্‌ব?

সুনন্দা। কিন্তু সে অভাগিনী যদি বেঁচে না থাকে, তা হ'লে সে বালিকার দশা কি হবে! আহা কাশ্মীর-রাজনন্দিনী আজ পথের ভিখারিণী! অদৃষ্টের কি ক্রূর নির্য্যাতন! তাদের চেন্‌বার কি কোন নিদর্শন নেই, মহারাজ?

অনঙ্গ। নিদর্শন? হাঁ, মনে প'ড়েছে—নিদর্শন আছে, রাণি! আমার প্রদত্ত একখানি সোণার পদক আছে; সেখানা সে শিশুকন্যার গলায় পরিয়ে রাখত।

সুনন্দা। সোণার পদক। অভাবের তাড়নায় তা' কি এতদিন আছে? আমার মনে হয়, সে শিশুকন্যা এখন পূর্ণ ষোড়শী।

অনঙ্গ। যদি বেঁচে থাকে!

সুনন্দা। আহা অভাগিনী! মহারাজের মত উৎপলও যদি ফিরে আস্‌তে বাধ্য হয়?

অনঙ্গ। তখন আর আমার কিছু বল্‌বার নেই।

সুনন্দা। তা হ'লে সুসংবাদ মহারাজের কাছে নিবেদন করি—সুচেৎসিংহ কুমারকে আহত ও সংজ্ঞাহীন অবস্থায় এক গিরিগুহা থেকে গৃহে এনেছে।

অনঙ্গ। আহত! কেমন ক'রে আহত হ'য়েছে, শুনেছ কি?

সুনন্দা। পাহাড়ীরা কুমারকে হত্যা ক'র্‌তে উদ্যত হ'য়েছিল, কিন্তু সসৈন্য সুচেৎসিংহ সেখানে উপস্থিত হওয়ায়, তারা তাকে আহত অবস্থায় রেখে পলায়ন করে। একটা পাহাড়ী মেয়ে আর একজন পাহাড়ী বন্দী হ'য়েছে।

অনঙ্গ। পাহাড়ীরা আমার পুত্রকে হত্যা কর্‌তে উদ্যত হয়েছিল?

সুনন্দা। রাজগুরু হংসরাজ গুপ্ত ঘাতকদের দেখে চীৎকার করাতে, সুচেৎসিংহ সসৈন্য সেখানে উপস্থিত হয়েছিল। তার পর যখন সুচেৎসিংহ ঐ পাহাড়ীটাকে আর মেয়েটাকে বন্দী করে, তখন মেয়েটার হাতে একখানা ছুরিও দেখেছে।

অনঙ্গ। পাহাড়ীরা এতখানি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে! হাঁ, কুমার কিছু বল্‌লে?

সুনন্দা। কুমার এখনও সংজ্ঞাহীন। যদিও মুহূর্ত্তের জন্য জ্ঞান হচ্ছে, আবার তখনই সংজ্ঞা হারাচ্ছে।

অনঙ্গ। কুমারের এমন অবস্থা তুমি আমায় এতক্ষণ বল নি কেন, রাণি? চল, দেখি কুমার কোথায়?

সুনন্দা। মহারাজের চিত্তচাঞ্চল্য দেখে বল্‌তে সাহস হয় নি; কি জানি—যদি হিতে বিপরীত হয়! চিকিৎসক বলেছেন, ভয়ের কোন কারণ নেই।

(সুচেৎসিংহের প্রবেশ)

অনঙ্গ। কুমার ফিরে এসেছে, সুচেৎসিংহ?

সুচেৎ। তিনি স্বেচ্ছায় ফিরে আসেন নি, মহারাজ! আমি তাঁকে আহত অবস্থায় নিয়ে এসেছি, আর সঙ্গে সঙ্গে সেই গুপ্ত আততায়িদ্বয়কেও বন্দী ক'রে এনেছি। এক্ষণে বন্দীদের প্রতি কি আদেশ হয়, মহারাজ?

অনঙ্গ। কাশ্মীর অধিপতি অনঙ্গাপীড়ের পুত্রকে যে গুপ্ত অস্ত্রাঘাত করতে উদ্যত হয়, তার অপরাধ অমার্জ্জনীয়—শাস্তি প্রাণদণ্ড। যাও—অবিলম্বে তাদের মশানে নিয়ে গিয়ে বধ কর। দাও, দণ্ডাজ্ঞায় স্বাক্ষর ক'রে দিই—[তথাকরণ]

চল, রাণি—আমার হারানিধি পুত্র কোথায় দেখাবে চল।

(পরিচারিকার প্রবেশ)

সুনন্দা। তুই আবার কি মনে ক'রে?

পরি। ছোটরাণী মা বিষপান ক'রেছেন—কেমন ক'র্‌ছেন।

অনঙ্গ। রাক্ষসী—কন্যাকে হত্যা ক'র্‌লে—পুত্র ফিরে এসেছে, তাও প্রাণে সইলো না—নিজে বিষপান ক'র্‌লে! মরুক্! চল, রাণি পুত্রকে দেখি গে চল।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

কক্ষ।

পালঙ্কোপরি উৎপল নিদ্রিত; অদূরে একজন পরিচারিকা দাঁড়াইয়া ধীরে ধীরে ব্যজন করিতেছিল।

উৎপল। [তন্দ্রাঘোরে] মিথ্যা কথা! ভণ্ড তপস্বি—তুমি আমায় ছলনায় ভোলাতে এসেছ? পার্‌বে না—কখনও পার্‌বে না - পাহাড়ী আমার ভগিনী নয়—কখনও নয়। উঃ অসহ্য যন্ত্রণা! পাহাড়ী পাহাড়ী—তুমি ত জান—তুমি একবার বল—তুমি আমার কে? বল্‌লে না—নীরব রইলে? বল, পাহাড়ী দেখছ না—আমার বুক ফেটে যাচ্ছে—তবু তুমি নীরব? দোহাই, সন্ন্যাসি—তোমার পায়ে ধরি, আমার সমস্ত অপরাধ ভুলে সত্য বল—পাহাড়ী, আমার কেউ নয়।

পরি। কুমার! একটু ঘুমুন্—রোগা শরীরে অমনটী করবেন নাই। এখানে ত পাহাড়ীরা নেই—আপনি যে ঘরে এসেছ।

উৎপল। [পূর্ব্ববৎ তন্দ্রাবেশে] পাহাড়ী—পাহাড়ী—যেও না—যেও না! দেখ, আমি কিছু বলি নি—কারও কথা বিশ্বাস করি নি, তুমি তা বিশ্বাস কর্‌ছ কেন? মিথ্যা কথা—প্রবঞ্চনা—শঠতা! আমি তাকে যোগ্য শাস্তি দেব—তুমি যেও না!

পরি। না, আমার দ্বারা হবে না, বাপু! রাণীমাকে বলি। অসুখ বিসুখ ত আমাদের ঘরেও হয়, কিন্তু এমন বিদ্‌ঘুটে রকম হয় না। জ্বর-বিকের হ'ল, মুড়ি শুড়ি দিয়ে প'ড়ে রইল; টোট্‌কা টাট্‌কি কর্‌লুম—উঠ্‌লো খেলে দেলে বেড়ালে। রাজ-রাজড়ার ঘরে রাজা মহারাজা রোগও বটে! ঘুমুতে ঘুমুতে তেওড়ায়—লড়াই দাঙ্গা মাতনী করে। বেঘোরে কিল্‌টে ঘুসোটা যদি বসিয়ে দেয়, ব্যস্—আর উঠে পত্যিটী কর্‌তে হবে নি। কাজ নেই, বাপু, রুগী আগুলে, রাণীমাকে বলি। যাক্, আর যেতে হ'ল নি, ঐ যে রাজারাণী দুজনেই আস্‌ছেন।

(অনঙ্গাপীড় ও সুনন্দার প্রবেশ)

সুনন্দা। কুমার ঘুমিয়েছে?

পরি। হাঁ, ঘুমোবার লেগে তেনার দায়টী প'ড়ে গেছে! একটুকু ঘুমুতে তর নেই, অমনি তেউড়ে মেউড়ে উঠ্‌ছেন—গাল দিচ্ছেন—মার্‌ছেন আবার পায়ে ধর্‌ছেন, পেরনাম কর্‌ছেন।

সুনন্দা। স্বপ্ন দেখছে বুঝি?

পরি। স্বপন কেন হবে? রোগের ওগুলো উপুসগ্‌গো।

সুনন্দা। তোর যেমন বুদ্ধি—বাছার আমার রোগ কোথায়?

পরি। [স্বগত] ও হরি! তবে কি ভিট্‌কি-লেমী ক'রে মাথায় পকড় বেঁধে প'ড়ে আছে না কি? রাজা-রাজড়ার ঘরের অসুখকে গড় করি, বাবা!

[প্রস্থান।

সুনন্দা। উৎপল—বাবা—

উৎপল। [পূর্ব্ববৎ তন্দ্রাঘোরে] পাহাড়ী—পাহাড়ী—আমার কথা বিশ্বাস কর, ও কথা ভুলে যাও; ও মিথ্যাবাদী—ভণ্ড—প্রতারক।

অনঙ্গ। রাণি—শুনছ?

সুনন্দা। বাছা বোধ হয়, স্বপ্ন দেখছে।

অনঙ্গ। স্বপ্ন নয়, রাণি! ঐ স্বপ্নের পশ্চাতে লুকানো আছে কঠোর সত্য! রাণি আমার মনে হচ্ছে আমি একটা বিরাট ভুল করেছি। প্রারম্ভ হতেই ভুলের সূত্রপাত—ভুলেই তার পরিসমাপ্তি!

সুনন্দা। ভুল? কিসে ভুল করেছেন, মহারাজ?

অনঙ্গ। কিসে নয়, রাণি? সারাজীবন ভুলই ক'রে আসছি! যৌবনে ভুল ক'রে একজনের সর্ব্বনাশ করেছি, বার্দ্ধক্যের ভুলে পুত্রকে নির্ব্বাসন-দণ্ড দিয়েছি; সে ভুল সংশোধন করতে বোধ হয়, আবার ভুল কর্‌লুম?

সুনন্দা। উৎপল—বাবা—

উৎপল। য়্যাঁ কে মা! আমি কোথায়?

সুনন্দা। কেন, বাবা! তুমি রয়েছ রাজপ্রাসাদে তোমারই কক্ষে।

উৎপল। আমারই শয়ন—কক্ষে! আর তারা?

সুনন্দা। কাদের কথা বলছ, বাবা? তোমায় শত্রুরা—যারা তোমায় হত্যা করতে গিয়েছিল, সেই পাহাড়ীদের কথা বলছ?

উৎপল। কে বললে, পাহাড়ীরা আমায় হত্যা করতে এসেছিল?
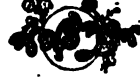
অনঙ্গ। তবে তোমার অঙ্গে অস্ত্রাঘাত করলে কে ?

উৎপল। কৈ, আমার ত কিছু মনে পড়ে না।

অনঙ্গ। প্রকৃতিস্থ হ'য়ে কথা কও, উৎপল ! দেখ, তোমার ললাটে ক্ষতচিহ্ন।

উৎপল। আমি প্রকৃতিস্থ হ'য়েই কথা কইছি, পিতা এ ক্ষত-চিহ্ন অস্ত্রাঘাতের নয়।

অনঙ্গ। তুমি ঠিক বল্‌ছ—সেই বন্দিনী পাহাড়ী বালিকা অথবা তার সঙ্গী কেউ তোমায় অস্ত্রাঘাত করে নি ?

উৎপল। না।

অনঙ্গ। তোমাব কি বিশ্বাস তাবা তোমাব শত্রু নয় ?

উৎপল। না।

অনঙ্গ। তুমি জান না, পুত্র ! সেই পাহাড়ী বালিকা তোমায় হত্যা ক'র্‌তে এসেছিল।

উৎপল। বিশ্বাস হয় না।

অনঙ্গ। তুমি কি বল্‌তে চাও—রাজগুরু হংসরাজ সেই বালিকা ও তার সঙ্গীর বিরুদ্ধে যে অভিযোগ এনেছেন, সে অভিযোগ মিথ্যা ?

উৎপল। সম্পূর্ণ মিথ্যা। হংসরাজ ভণ্ড—প্রতারক !

অনঙ্গ। উৎপল, জান—তুমি কার সঙ্গে কথা কইছ ?

উৎপল। জানি—জগতের প্রত্যক্ষ দেবতা পিতার সঙ্গে—কাশ্মীর অধিপতি মহারাজ অনঙ্গাপীড়ের সঙ্গে।

অনঙ্গ। কে আছিস্, আমার দণ্ডাজ্ঞা ফিরিয়ে আন্—আমার দণ্ডাজ্ঞা ফিরিয়ে আন্ ! উঃ—আবার ভুল—আবার ভুল—

[বেগে প্রস্থান।

উৎপল। তাদের কি দণ্ড দিয়েছেন, মা, যে—পিতা অমন ব্যস্ত হ'য়ে আদেশ প্রত্যাহার কর্‌তে চল্‌লেন ?

সুনন্দা। তোমার মাথার উপর যে খড়্গ তুল্‌বে, তাকে মৃত্যুদণ্ড ভিন্ন আর কি দণ্ড দেবেন বাবা !

উৎপল। য়্যাঁ, বল কি, মা ! সে যে আমার ভগিনী— !

[বেগে প্রস্থান।

সুনন্দা। হায়—হায়—কি সর্ব্বনাশ হ'ল !

তৃতীয় দৃশ্য

মশান—কালীমন্দির

পাগলিনী উপবিষ্টা

পাগ। বেশ হয়েছে—খাসা হয়েছে—আমার বুকের নিধিকে যারা ছিনিয়ে নিয়েছে, তাদের আজ এখানে প্রাণদণ্ড হবে। তাই দেখব ব'লে ছুটে এসেছি—কি আনন্দ ! দেখব আর অট্টহাসি হাস্‌ব ! হা—হা—হা—ন্যায়বান্ রাজা ন্যায়বিচার করেছে ! আজ দুষ্টের দমন হবে—পৃথিবীর পাপের বোঝা ক'মে যাবে। উঃ এত পাপ ! এত পাপ কি পৃথিবীর বুকে সয় ? সয় না—তাই আজ ন্যায়ের দণ্ড পাপীর মাথায় পড়বে। হা—হা—হা ! কিন্তু এত আনন্দ আমার সইবে কি ? কেন সইবে না ? এত দুঃখ সইছে আর আনন্দ সইবে না ? আমার বুক থেকে বুকের নিধি কেড়ে নিলে, তা সইল, আজ তাদের শাস্তি দেখে আনন্দ ক'র্‌ব তা সইবে না ? খুব সইবে। এই ত—হা—হা—হা—কেমন হাসছি !

দুইজন রক্ষীসহ শৃঙ্খলিত মীনা ও মেঘা এবং ঘাতকের প্রবেশ।

এসেছে—সব এসেছে—বলিও হাজির। দাও না, বলি দাও না ; দেখছ না নররক্ত পান করবার

জন্য মায়ের জিভটা কেমন লক্ লক্ করছে। মায়ের বড় পিপাসা—নররক্ত পানের পিপাসা—দাও শীঘ্র বলি দাও। ওরে ও রাক্ষুসী মেয়েটা আয় মা—একবার এদিকে আয় না—[মীনার নিকটবর্ত্তী হইয়া] সেও এতদিনে ঠিক এমনটী হ'ত! রাক্ষুসী তোর এত ক্ষিদে? তা আমায় বলিস্ নি কেন? আমি তোকে আমার দেহের মাংসগুলো টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে কেটে তোকে খাওয়াতুম। মর্—এখন যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল! নে—নে—তোরা বলি দে! দেখছিস না—রাক্ষুসীর লক্ লকে জিভ—আবার হয় ত কাকে খাবে। না—না দিব্যি মেয়েটী থাক্—থাক্—একে তোরা মারিস নি—একে তোরা মারিস নি—

১ম রক্ষী। স'রে যা, পাগলী—আমাদের কাজে বাধা দিস নি।

পাগ। কি বল্‌লি—মার্‌বি? কৈ মার দেখি? দেখ, আমিও সন্তানের জননী; এই আমি একে বুকে করে নিয়ে দাঁড়ালুম, দেখি তুই কেমন ক'রে একে বধ করিস। [বক্ষে ধারণ]।

মীনা। মা, রাজদণ্ডে দণ্ডিতা আমি—আমার জন্য রাজদ্রোহিণী হ'য়ো না!

পাগ। আঃ—আঃ—আবার বল্—আবার বল্—আবার মা ব'লে ডাক্—বড় মিষ্টি—বড় মিষ্টি—স্বর্গের সুধার চেয়েও মিষ্টি! সেও এমনি মিষ্টি ক'রে ডাক্ ত! ডাক্—ডাক্—আবার ডাক্—

মীনা। মা—মা—আমায় ছেড়ে দাও, মা!

পাগ। কখনও না—কখনও না—প্রাণ থাক্‌তেও না! তুমি এমনি মা ব'লে ডাক্, আর আমি তোকে এমনি ক'রে বুকে জড়িয়ে ধ'রে শুনি—

১ম রক্ষী। ছাড়, মাগী—আবার ন্যাক্‌রা হচ্ছে!

পাগ। খবরদার, রাক্ষস—বাঘিনী তার শাবককে বুকে লুকিয়ে রেখেছে—তাকে ঘাঁটাস নি।

সুচেৎসিংহের প্রবেশ।

সুচেৎ। এখনও বিলম্ব কর্‌ছিস্ তোরা। নে সয়তান সয়তানীকে অবিলম্বে বধ কর্।

১ম রক্ষী। আমরা কি কর্‌ব হুজুর! দেখছেন ঐ পাগলী মাগীর কাণ্ড-কারখানা; ওঁর যেন আঁতের দরদ চেগে উঠেছে।

সুচেৎ। অকর্ম্মণ্যের দল! ঐ পাগলী মাগীর কাছ থেকে মেয়েটাকে ছিনিয়ে নিতে পাচ্ছিস না?

[রক্ষিগণ অগ্রসর হইল]

পাগ। খবরদার রাক্ষস—মাতৃহারা সন্তান সন্তান-শোকাতুরা জননীর কোলে আশ্রয় নিয়েছে—স্বর্গ মর্ত্ত্যে নেমে এসেছে—এমন অপার্থিব মিলনে বাধা দিস্ নি! যা—যা—স'রে যা! ডাক্, অভাগিনি—আবার মা ব'লে ডাক্।

সুচেৎ। দাঁড়িয়ে রইলি যে—মেয়েটাকে ছিনিয়ে নে।

মেঘা। নিষ্ঠুর নররাক্ষস—এমন করুণ দৃশ্য দেখেও যাদের পাষাণ হৃদয় গলে না, লোকে তাদের মানুষ বলে কেন?

সুচেৎ। চোপরাও উল্লু! নে, মেয়েটাকে ছিনিয়ে নে—

[রক্ষিগণের তথা করণ]

পাগ। ওগো, নিয়ো না—নিয়ো না—তোমাদের পায়ে পড়ি গো—নিয়ো না! তোমরা আমায় হত্যা কর, ওকে ছেড়ে দাও। এই নাও—আমিই হাড়ি কাঠে মাথা দিচ্ছি। [তথাকরণ]

সুচেৎ। আরে ম'লো, বেটী আবার দরদ দেখাতে এসেছে। দে ত মাগীর হাতখানা ধ'রে টেনে ওদিকে ফেলে—

ঘাতক। [মীনাকে লইয়া] দে হাড়িকাঠে গলা।

মীনা। মা! [তথাকরণ]

পাগ। ওহো! [আর্ত্তনাদ]

ঘাতক অস্ত্রাঘাত করিবা মাত্র মীনার ছিন্ন মুণ্ড মাটীতে গড়াইয়া গেল এবং কালীমন্দির হইতে হংসরাজ ক্ষিপ্রপদে আসিয়া মীনার ছিন্নমুণ্ড তুলিয়া লইল।

হংস। সুন্দরি! এইবার যদি তোমার এই ফুল্ল অধরোষ্ঠে চুম্বনরেখা অঙ্কিত ক'রে আমার অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত করি, তা হলে ত তুমি আমায় আর বাধা দিতে পারবে না? [চুম্বনোদ্যত]

মেঘা। তবুও তোর ও পাপ আশ পূর্ণ হবে না, সয়তান। [শৃঙ্খল ছিন্ন করতঃ ক্ষিপ্রহস্তে ঘাতকের খড়্গ কাড়িয়া লইয়া হংসরাজের কণ্ঠে আঘাত করিবা মাত্র হংসরাজের রক্তাক্ত দেহ ভূলুণ্ঠিত হইল]

নেপথ্যে অনঙ্গাপীড়। সুচেৎসিংহ—-আমার দণ্ডাজ্ঞা ফিরিয়ে দাও; বন্দীদের হত্যা ক'র না—

সুচেৎ। একি—মহারাজ না কি!

বেগে অনঙ্গাপীড়ের প্রবেশ।

অনঙ্গা। সুচেৎ সিংহ, এখনও আমার দণ্ডাজ্ঞা পালিত হয় নি ত? এ কি—এত শীঘ্র আদেশ পালন করেছ! আর একটু অপেক্ষা করতে পারলে না?

পাগ। কৈ আর পারলে মহারাজ! দীনা পাগলিনীর কথা কে শুনবে! [কিয়ৎক্ষণ অনঙ্গাপীড়ের মুখের দিকে চাহিয়া] এ কি—তুমি—তুমি—মহারাজ!

অনঙ্গা। য়্যাঁ, এ কি—তুমি—তুমি—বীরাবাঈ!

পাগ। প্রভু—স্বামি—দেবতা আমার--চিনতে পেরেছ? [অনঙ্গপীড়ের পদতলে পতিত হইল ও সংজ্ঞা হারাইল]

বেগে উৎপলের প্রবেশ।

উৎপল। একটু অপেক্ষা কর, সুচেৎসিংহ—বন্দিনী আমার ভগিনী।

অনঙ্গা। য়্যাঁ, বল কি উৎপল—তোমার ভগিনী? বীরাবাঈ বীরাবাঈ এ বালিকা কি তবে—

[উৎপল ক্ষিপ্রহস্তে মীনার পদক লইয়া অনঙ্গাপীড়ের পদতলে নিক্ষেপ করিল।

উৎপল। এই পদকই তার নিদর্শন।

অনঙ্গা। ওহো—হো—হো—কি করলুম।

পাগ। আক্ষেপ ক'রো না, প্রভু! মাতৃহারা কন্যা আমায় ডাকছে—আমি ত তাকে ফেলে থাকতে পারব না; যাই—বিদায় প্রভু— [মৃত্যু]

অনঙ্গা। জীবনটার আগাগোড়াই ভুল! ওহো—হো—

[যবনিকা পতন]

———

জীবন-চরিত

তরু দত্ত

শ্রীপ্রিয়লাল দাস, এম-এ, বি-এল

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

রমেশচন্দ্রের রচিত "কর্ম্ম-জীবনের স্মৃতি" নামে কাব্য-গ্রন্থের প্রথমাংশের উনিশটি কবিতার মধ্যে পাচটি তাঁহার নিকট আত্মীয়গণের উদ্দেশে লিখিত। জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে সম্বোধন করিয়া যে দুইটী কবিতা রচিত হইয়াছিল তৎসম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে যোগেশচন্দ্র দত্তের প্রসঙ্গে আলোচনা করা হইয়াছে। ১৮৭৩ সালে বনগ্রামে অবস্থানকালে রমেশচন্দ্রের মনে তাঁহার বাল্য-জীবনে পিতৃভক্তির স্মৃতি জাগিয়া উঠিয়াছিল। ইহার ফলে তিনি যে কবিতা (Filial Recollections) রচনা করিয়াছিলেন তাহার শেষ শ্লোক দুইটি উল্লেখযোগ্য। আশ্বিন মাসে বিজয়া দশমীর দিন হিল্লোলিত বায়ুস্পর্শে কবির সুপ্ত কল্পনা প্রবুদ্ধ হইয়া তাঁহার মানস-পটে অতীতের চিত্র অঙ্কিত করিতে আরম্ভ করিল।

4

The tide of years rolled backward,
and once more blithe and free,
I was a little truant, and viewed
those sights with glee,
And as the evening deepened, the moon
it shone out brave,
I sought each dear relation to bow and
blessings crave.

5

And there were forms among them,
O how surpassing dear,
Who blessed the little prattler with
many a loving tear.
O tears of love parental !
O blessings rich and rare !
O tender recollections of joys,
now where, O where ?

রমেশচন্দ্রের মাতা ১৮৫৯ সালে তাঁহাদের কলিকাতার বাটীতে পরলোক গমন করেন। ইহার দুই বৎসর পরে তাঁহার পিতা ১৮৬১ সালে কুষ্টিয়ার সন্নিকট চামরুল খালে নৌকাডুবি হইয়া ইহলোক ত্যাগ করেন। এই দুর্ঘটনার সময়ে রমেশচন্দ্রের বয়স মাত্র তের বৎসর ছিল। ঈশানচন্দ্র দত্ত ডেপুটি কলেকটারের পদে অধিষ্ঠিত থাকার সময়েই রমেশচন্দ্র ও তাঁহার ভ্রাতৃদ্বয় পিতৃহীন হইয়াছিলেন। সুদীর্ঘ কাল পরে পিতামাতার স্নেহাশীর্ব্বাদ বিস্মৃতির আবরণ ভেদ করিয়া কবির চিত্তকে ভক্তিপ্লুত করিয়াছিল। বাল্যাবস্থায় পিতৃমাতৃ-বিয়োগ হেতু রমেশচন্দ্রের যে অবস্থা হইয়াছিল তাঁহার জীবদ্দশায় তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ ও পুণ্যবলে তাঁহার পুত্রকন্যাগণের সে অবস্থা হয় নাই। রমেশচন্দ্র এক পুত্র ও পাঁচ কন্যা রাখিয়া ১৯০৯ সালে একষট্টি বৎসর বয়সে স্বর্গারোহণ করেন। তাঁহার কন্যাগণ সকলেই সুশিক্ষিতা। জ্যেষ্ঠা কন্যার রচিত কয়েকটি কবিতা ১৮৮১ সালে বাঁকুড়ায় অবস্থানকালে উপহারস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া রমেশচন্দ্র তাঁহার উদ্দেশে যে কবিতা লিখিয়াছিলেন (To

my Eldest Daughter) তাহার পঞ্চম শ্লোকটি এস্থলে উদ্ধৃত হইল,—

• Sendest thou some wishes kind ?
  Child or cherub from above !
Send my friends, a few that are,
  Approbation and their love ?
Thanks ! it cheers the toiler's heart,
  Thanks ! it cheers his livelong day,
And he wipes his moistened brow,
  Treads with firmer steps his way.

দ্বিতীয়া কন্যার বিবাহ ও শ্বশুরালয়ে গমনোপলক্ষে রচিত কবিতার (To My Second Daughter) শেষ শ্লোকটি এস্থলে উদ্ধৃত হইল—

Sweet and gentle life be thine,
Peace and blessings round thee shine,
Husband's love may bless thy heart !
Smiling cherubs bless thy home !
Hark the whistle ! Child, we part,
  But wherever I may roam,
Wheresoever may work my life,
Father's love with you shall be,

এই কবিতাটি ১৮৮৩ সালে বরিশালে অবস্থানকালে রমেশচন্দ্র রচনা করিয়াছিলেন। আলোচ্য স্মৃতি-কাব্যের প্রথমাংশের ইহাই শেষ কবিতা। এই কাব্যের দ্বিতীয়াংশে যে সকল কবিতা স্থান পাইয়াছে তাহাদের রচনাকাল ১৯০৭ হইতে ১৯০৯ সাল। ১৮৮৩ সাল হইতে গবর্ণমেণ্ট রমেশচন্দ্রের উপর জেলার শাসনভার ন্যস্ত করিয়াছিলেন। শ্যামাঙ্গ সিভিলিয়ানদের মধ্যে এদেশে তিনিই সর্ব্বপ্রথম ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট্। ১৮৯৩ সালে তিনিই সর্ব্বপ্রথম ডিভিসনাল কমিশনার নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১৮৯৭ সালে রমেশচন্দ্র সরকারি কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। ইহার পর তিনি রাজনীতি ও সমাজনীতি-ক্ষেত্রে বহু দেশহিতকর কার্য্য করিয়া ও সাহিত্যের সেবায় ব্রতী থাকিয়া ১৯০৯ সালে বরোদার প্রধান সচিবের পদে অধিষ্ঠিত থাকার সময়ে স্বর্গারোহণ করেন। আলোচ্য "স্মৃতি-কাব্যে"র দ্বিতীয়াংশের সর্ব্বশুদ্ধ দ্বাদশটি খণ্ড-কবিতা সেইজন্য কবির জীবনের গোধূলিতে রচিত। এই কবিতাগুলির দুই একটিতে রাজনীতির গন্ধ আছে বটে, কিন্তু কবির কৌতুকপ্রিয়তা পাঠকের মনে যে আনন্দ আনয়ন করে তাহাতে রাজনীতির উগ্রতা আদৌ অনুভূত হয় না। একটি কবিতার নাম "লতার প্রতি গোলাপের ঝোঁপ" (Rose Bush To Creeper)। ১৯০৭ সালে রচিত এই কবিতা-কণিকায় বিকেন্দ্রীকরণের ইসারায় (Decentralisation) উল্লেখ আছে।

Said rose-bush to creeper—Arise lazy
  sleeper,
Uprise and know deeper, the tidings
  of day !
Rise for she comes stealing, the Damsel
  of Darjeeling,
Overborne by her feeling, and blushing
  bright as May !
Maid of form majestic, and smiling
  and mystic—
A fairy all fantastic -say which
  will be her way ?
By railway and by steamer, her way is to
  the schemer,
Oh the Patriotic Dreamer !—the creeper
  spoke above,
So sing of bridal feasting, of loochi-
  monda tasting,
Evening songs and jestings, and grandsire's
  changeless love !

Ring the bell from town and dome,
Chant the lay, the bride is come
Decentralised from father's home !

কয়েক মাস পরে ১৯০৮ সালের এপ্রিল মাসে রচিত "বন্ধু-কপোতের প্রতি কোকিল" (Kokil to Ring-dove) শীর্ষক ক্ষুদ্র কবিতাতেও বিকেন্দ্রীকরণের উল্লেখ আছে !—

Precious good tidings,—said Kokil to
Ring-dove,—
Reached me this morning,—glad tidings
of true love !
Ah, is it real ? Yes, true news we carry,
The Bella of Baroda is now going to marry!
Iron-strong in purpose, deep in thought
as ocean,
Music in her accents, grace in all her motion
Ah ! but of her chosen hast thou any notion?
But I know,—said Ring-dove,—of the
maiden true,
Of the happy bridegroom, strong and
steadfast too,
Sing we them of bridel, for we may not
tarry,
E'en from Cormandal a grandsire's love
we carry.

Ring the bell from tower to dome,
Chant the lay the bride is come,
Decentralised from father's home !

রমেশচন্দ্রের অন্তরের নিভৃত স্থানে যে রঙ্গ-ব্যঙ্গের উৎস ছিল তাহা কে জানিত ? ১৯০৭ সালে বিকেন্দ্রীকরণ কমিশন্ (Royal Decentralisation Commission) গঠিত হইলে দেখা গেল যে, রমেশচন্দ্র তাহাতে সদস্যের আসন প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই কমিশনের অন্যতম সদস্য মিঃ মেয়ার (Mr. W. S. Meyer) রমেশচন্দ্রের জীবনীলেখক মিঃ জে এন্ গুপ্তকে লিখিয়াছেন,—"As regards our personal relations, Mr. Dutt's general *bonhomie* and constant sense of humour endeared him to all kis Colleagues on the Commission."—

রমেশচন্দ্রের এই কৌতুকপ্রিয়তার প্রমাণ আলোচ্য "স্মৃতি-কাব্যে"র অন্যান্য কয়েকটি কবিতাতেও পাওয়া যায়। ১৯০৭ সালে রচিত "প্রাচীন কবির গান" Lay of the Old Ministrel) নামক কবিতায় রমেশচন্দ্র কোনও মহিলার বিবাহোপলক্ষে নূতনের সহিত প্রাচীনের হাস্যরসোদ্দীপক তুলনা করিয়াছিলেন—

Wherefore on this bed of Roses
Scatter leaves of winter time,—
With these thoughts of youth and ardour
Wherefore blind an old man's rhyme ?

* * *

Joyous notes of mirth and laughter
From this volume seem to rise,—
Young hearts throb with tender passion,
Young eyes meet responsive eyes !

* * *

Each enthusiast brings a blossom
To this pure and perfumed shrine,
Every pen records a stanza,
Every poet adds a line !

* * *

And they dance in mirth and gladness
As they lightly come and go,
Shall I dare to tread a measure
With my poor rheumatic toe ?

* * *

Shall I, stuffed and over—coated,
Bring my harp to join this cheer ?
How the maids will smile and giggle,
How the youths will laugh and jear !

* * *

Nathless lady ! 'Tis thy mandate
I should chant a lay of mine,
To this store youthful music
Add an old man's rugged line.

* * *

Be it so ! Bright morning's radiance
Beams upon they budding life,
Be the day as bright and beauteous,
Be the evening free from strife.

* * *

"সোণার মেয়ে" (The Girl of Gold), "অপ্সরা ও গায়ক" (Nymphs and the Ministrel), "মেদিনীপুরের 'অ'র প্রতি" (To A. of Midnapur) ও "শিলংয়ের 'শ'র প্রতি" (To S. of Shillong) নামক কবিতাগুলিতেও হালকা রাগিণী শুনা যায়। "বেগম" নামে কবিতাতে জাঞ্জিরার নবাব বেগমকে সম্বোধন করিয়া রমেশচন্দ্র হিন্দু-মোসলেম প্রীতি ও সদ্ভাবের উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন,—

Caste and creed will often wrangle,
Tear apart those who are one,
Greed and selfishness will hinder,
What by selfless work is won ;
But true-hearted men and women—
Moslem or of Hindu faith,—
Love of men their high religion,
Serve their country until death !

* * *

And there are who mock our labours,
Oft devide us by their art,
But shall brother shun his brother,
Sister from her Sister part ?
Comrades in a common sorrow,
Comrades in a common toil,
Heaven unites !—No man shall sever
Children of a common soil !

"পল্লী" নামক কবিতাতেও রমেশচন্দ্র দেশবাসীকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন,—

Noble in thy aspirations,
Truth-beloving in thy heart,
Cast aside all nations' failings—
Choose the truer nobler part,
Search in every distant region,
What is great and what is grand,
Search the best in thought and action,
Plant it in thy native land.

"সমুদ্র-বক্ষে" রচিত কবিতাটির শেষ শ্লোকেও এই সুর শুনা যায়।

Hush !—an old man's daring visions
With the highest hopes are life !—
India's sons and duteous daughters
Waking to a higher life !
Workers true to toil and effort,
Be the battle lost or won,—
Manhood true to high endeavour,
Woman's duty nobly done !

হিন্দু-মোসলেম একতার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া রমেশচন্দ্র ১৯০৯ সালে যে কবিতা রচনা করিয়াছিলেন তাহার নাম "যমজ" (Twins in Love) এই কবিতার অন্তর্নিহিত ভাবটি একটি মাত্র শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দিলেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন।

One, a gentle Hindu mother,
One, a duteous Moslem maiden,
In their loves they were united
Like two creepers perfume—laden !

Sister streams that sweetly mingled,
Sister blossoms on one stem,—
Creeds might differ, love of duty,
Love of country blended them !

এই কবিতার হিন্দু মাতার নাম শ্রীমতী সারদা মেটা। ইনি বরোদার ডাঃ মেটার পত্নী। আলোচ্য কবিতার মোসলেম কুমারীর নাম মিস্ সরিফা। ইনি বরোদার মিঃ তায়াবজির কন্যা। এই দুই মহিলাকে রমেশচন্দ্র নিজের কন্যার মত ভালবাসিতেন। এই কবিতাটি রমেশচন্দ্র তাঁহাদিগকে ১৯০৭ সালে নববর্ষের উপহার দিয়াছিলেন। ১৯০৭ সাল হইতে ১৯০৯ সালের মধ্যে রচিত। 'স্মৃতি কাব্যে'র দ্বিতীয়াংশে সন্নিবিষ্ট দীর্ঘতম কবিতার নাম "বার্ট-

বৎসর আসিল ও চলিয়া গেল" (Sixty Years Have Come And Parted)—এই কবিতা ১৯০৮ সালের আগষ্ট মাসে লণ্ডনে রচিত হইয়াছিল। জন্মাবধি ১৯০৮ সাল পর্য্যন্ত রমেশচন্দ্রের জীবনের উল্লেখ-যোগ্য ঘটনাগুলি ইহাতে বিবৃত হইয়াছে। এই কবিতা রমেশচন্দ্রের জীবনের পদ্যময় সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। শুধু বঙ্গভাষা কেন, ইংরাজি ভাষাতেও আত্ম-জীবনের এই প্রকার স্মৃতি-কবিতা বিরল। এই কবিতাটি ইংরাজি ভাষাভিজ্ঞ অতি অল্পসংখ্যক বাঙ্গালী পাঠকের নিকট পরিচিত। আমরা সেইজন্য এস্থলে আংশিকভাবে কবিতাটি উদ্ধৃত করিয়া রমেশচন্দ্রের স্মৃতি-পূজার সুযোগ ত্যাগ করিতে পারিলাম না। রমেশচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার উদ্দেশে ইহা লিখিত।

SIXTY YEARS HAVE COME AND PARTED.

Sixty years have come and parted,
Friend and Brother, noble hearted !
We have wandered far and wide
O'er life's pathway, side by side,
Toil and trouble we have crost,
Joyed and sorrowed, loved and lost !
Chased in youth each bright illusion,
Proved in age life's vain delusion,—
Dreams of glory,—often shaded,
High ambitions,—often shaded,
Dreams of love and friendship faded,
Comrades by the waysidy lost !
Gallant hands have dropped the oar.
Pious hearts have beat no more,
Souls have reached their haven shore !
Toiling still in rain and sun,—
Labour lost or purpose done,—
We have walked through stress and strife,
Hand in hand the path of life,
Sixty years with struggles rife !

* * *

Now my arduous task was ended,
Life with lighter work was blended,—
Years in Europe's colder clime,
Work of love beguiled my time,
India's ancient tale of glory,
India's epics old and hoary,
India's mournful modern story !
I have felt and ever thought,
Progress by ourselves is wrought,
And a Congress of my nation
Shared with me my aspiration !
Years in far Baroda's soil,
I have felt a workman's pride,
And for travel or for toil
Ranged o'er India far and wide,—

* * *

Lo ! a ruddy light is breaking
O'er the sea, across the earth,
Young Japan is slowly waking,
Asia hails her glorious birth !
From Japan to Persian heights
Man will seek for newer lights
Man will conquer nobler rights !
Hark ! while yet we watch and wait,
Mighty impulse, purpose great,
Midst the storm and stress of strife
Wakes our land to higher life,—
Stern resolve in manhood's breath,
Deep in women's inborn faith !
Not as strangers in their soil,—
Not as voiceless slaves of toil,
They demand the citizen's station,
Lofty birthright of each nation !
Manly right and purpose high,
Place mid nations 'neath the sky,
Be our country's—when we die !

রমেশচন্দ্রের ঘটনাপূর্ণ সুদীর্ঘ কর্ম্মজীবনের পন্থ-ময় ইতিহাসে তাঁহার নিজের ও আত্মীয়-স্বজনের অনেক কথা যদিও তিনি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, কিন্তু য়ুরোপীয় সাহিত্য-জগতে তাঁহার লেখনী-প্রসূত যে সকল রচনা এই দত্ত কবির নাম বিঘোষিত করিয়াছিল তৎসম্বন্ধে তিনি কয়েকটি মাত্র ছত্রে ইসারায় উল্লেখ করিয়া নীরব হইয়াছেন। "ভারতের শোকপূর্ণ আধুনিক ইতিহাস, সরকারি কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিবার পরে আমার সময় অতিবাহিত করিবার পক্ষে সহায়তা করিয়াছিল।" রমেশচন্দ্র ছাব্বিশ বৎসর যোগ্যতা ও সম্মানের সহিত সরকারি কর্ম্ম করিবার পর ১৮৯৭ সালে পেনসন পাইয়াছিলেন। তিনি আরও নয় বৎসর কাল উচ্চ বেতনে গবর্ণমেণ্টের অধীনে কর্ম্ম করিতে পারিতেন। তাঁহার জনৈক জীবনী-লেখক—মিঃ ন্যাটেসন্ (Mr. Natesan)—বলেন, সাহিত্য-ক্ষেত্রে যশঃলাভের উচ্চাশা তাঁহাকে লক্ষ্মীর আরাধনা হইতে নিবৃত্ত করিয়া সরস্বতীর সেবায় প্রবৃত্ত করিয়াছিল। স্বায়ত্ত-শাসন লাভের জন্য দেশের মধ্যে সে সময়ে যে আন্দোলন হইতেছিল তাহাতে যোগদান করিবার জন্য রমেশচন্দ্র পেনসন লইয়া-ছিলেন, একথাও মিঃ ন্যাটেসন্ বলেন। রমেশচন্দ্রের আত্মকথা ও তাঁহার পরবর্ত্তী কর্ম্ম-জীবনের ইতিহাস পাঠ করিয়া কিন্তু মনে হয় যে, স্বাস্থ্যের দ্রুত অব-নতিই তাঁহার অসময়ে পেনসন গ্রহণের প্রধান কারণ। তাঁহার জামাতা ও জীবনী-লেখক মিঃ জে এন্ গুপ্ত আই-সি-এস্ এই কথাই বলেন। তবে রমেশচন্দ্র যে জীবনের গোধূলিতে নবোৎসাহে রামায়ণ ও মহাভারতের পদ্যময় ইংরাজি অনুবাদ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন তাহারও বিশেষ কারণ ছিল বলিয়া বোধ হয়। কবিযশঃপ্রার্থী হইয়া তিনি যে এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন নাই, ইহা সুনিশ্চিত। পেনসন গ্রহণের পর স্বাস্থ্য-সঞ্চয়ের জন্য রমেশচন্দ্র য়ুরোপে গমন করিয়া-ছিলেন। ইহার পূর্ব্বেই তিনি সরকারি কার্য্য করিবার সময় "য়ুরোপে তিন বৎসর" (Three Years In Europe) (১৮৭২), "বঙ্গের কৃষক সম্প্রদায়" (The Peasantry of Bengal), (১৮৭৫), "বঙ্গবিজেতা," "রাজপুত-জীবনসন্ধ্যা," "মাধবী-কঙ্কণ," মহারাষ্ট্র-জীবন-প্রভাত," প্রভৃতি বাঙ্গালা নভেল (১৮৭৪—১৮৮০), "বঙ্গের সাহিত্য" (Literature of Bengal), (১৮৭৭), "ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ" (১৮৮৫), "প্রাচীন ভারতে সভ্যতার ইতিহাস" (History of Civilization In Ancient India), (১৮৮৮-১৮৯০), "ভারতের কাহিনীমূলক গাথা" (Lays of Ancient India), (১৮৯৩), "ভ্রমণ-বৃত্তান্ত" (Rambles) ও অন্যান্য কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করিয়া সাহিত্য-জগতে যে যশঃ অর্জ্জন করিয়াছিলেন তাহাতে সরকারি কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিবার পরে রমেশচন্দ্রের নূতন করিয়া যশঃ লাভের উচ্চাশা তাঁহাকে পেনসন লইতে পরামর্শ দিয়াছিল, মিঃ ন্যাটেসনের এই অভিমত সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। য়ুরোপে স্বাস্থ্য-সঞ্চয়ের সঙ্গে সঙ্গে তিনি রামায়ণ ও মহা-ভারতের কতকগুলি অধ্যায় ইংরাজি পদ্যে অনুবাদ করিয়া যে যশঃ লাভ করিয়াছিলেন তাহা অযাচিত, কবির উচ্চাশার ফল নহে। রমেশচন্দ্র য়ুরোপে অবস্থান করিয়া (১৮৯৮-১৮৯৯) স্বাস্থ্যোন্নতি না করিলে রামায়ণ ও মহাভারতের ইংরাজি পদ্যানুবাদ বা তৎপরে ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া রাজনীতি-ক্ষেত্রে অদম্য উৎসাহে দেশের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম কিম্বা বরোদারাজ্যে গুরুতর দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া প্রধান সচিবের কার্য্য করিতে পারিতেন কি না তদ্বিষয়ে সন্দেহ হয়।

রমেশচন্দ্রের পূর্ব্বে সমগ্র সংস্কৃত মহাভারত মিঃ প্রতাপচন্দ্র রায় কর্ত্তৃক ইংরাজি পদ্যে অনূদিত হইয়াছিল। আচার্য্য মোক্ষমূলরের মতে এই ইংরাজি মহাভারত পাঠ করিতে ধৈর্য্যচ্যুতি হয়। রমেশচন্দ্র রামায়ণ ও মহাভারতের কতকগুলি ঘটনার চিত্র ইংরাজি পদ্যে অনূদিত করিয়া ইংরাজ পাঠকের পক্ষে সহজে আর্য্য-চরিত্র বুঝিবার সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। রমেশচন্দ্রের রচিত চিত্রাবলীর মধ্যে কয়েকখানির আদর্শ তরু দত্ত তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বে সৃজন করিয়া গিয়াছিলেন। তরু দত্তের "হিন্দুস্থানের প্রাচীন গান ও কাহিনী"তে "সাবিত্রী" ও "লক্ষ্মণ" নামে যে দুইটি কবিতা স্থান পাইয়াছে সেই কবিতা দুইটিতে বর্ণিত ঘটনাবলীর সহিত রমেশচন্দ্রের অনূদিত "পতিব্রতা-মাহাত্ম্য" ও "সীতা-হরণ" নামে পদ্যময় নিবন্ধ দুইটিতে বর্ণিত ঘটনা-বলীর তুলনা করিলে তরু দত্তের কবিত্ব-প্রতিভার কতকটা আভাস পাওয়া যায়। অনুবাদকের গণ্ডীর মধ্যে পড়িয়া রমেশচন্দ্রের কবিত্ব স্ফূর্ত্তি লাভ করিবার অবসর প্রাপ্ত হয় নাই। তরু দত্তের বর্ণনীয় বিষয় অনায়াস স্ফূর্ত্তিতে কবির লেখনী-মুখে বাহির হইয়া আসিয়াছে। সাবিত্রী ও লক্ষ্মণের চরিত্রাঙ্কন বিষয়েও সেইজন্য এই দুই কবির মধ্যে অল্পবিস্তর পার্থক্য লক্ষিত হয়। বিষয়নির্ব্বাচনে কিন্তু তরু ও রমেশচন্দ্র উভয়েই হিন্দু কবির আশৈশব শিক্ষার প্রভাব উপেক্ষা করিতে পারেন নাই। সাবিত্রী ও লক্ষ্মণের ন্যায় সীতা, দ্রোণাচার্য্য ও উমার চিত্র এই দুইজন কবি অঙ্কিত করিয়াছেন। তরু দত্তের ন্যায় রমেশচন্দ্রও যে কেবল সাহিত্য-জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিবার জন্য লেখনী চালনা করিয়াছিলেন তাহা নহে। উনবিংশ-শতাব্দীর শেষার্দ্ধে তাঁহারা বিদ্যাসাগর ও মধুসূদনের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া দেশবাসীকে স্বাধীন ভারতের অতীত গৌরব-কাহিনী শুনাইয়াছেন। দুর্ব্বল দরিদ্র পরাধীন ভারত-বাসীর মনে স্বদেশপ্রেম ও আত্মনির্ভরতার বীজ বপন করিবার উদ্দেশ্যেই যে তাঁহারা সাহিত্য ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই।

রমেশচন্দ্র রামায়ণ ও মহাভারত হইতে চব্বিশ-খানি চিত্র বাছিয়া লইয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত, ঋগ্বেদ হইতে দ্বাদশখানি চিত্র তিনি অঙ্কিত করেন। উপনিষদ্ হইতে আটখানি, বৌদ্ধ-সাহিত্য হইতে ছয়খানি, কালিদাস ও ভারবির আদর্শে নয়খানি চিত্রও তিনি অঙ্কিত করিয়াছিলেন। রমেশচন্দ্র সেইজন্য অনুবাদের মারফৎ ইংরাজি শিক্ষিত বাঙ্গালীকে আর্য্য-সভ্যতার যাহা কিছু জ্ঞাতব্য তাহার সারাংশ প্রদান করিয়াছেন। শাস্ত্রগ্রন্থ হইতে আখ্যানবিশেষ নির্ব্বাচনে রমেশচন্দ্র একটি নিয়ম অনুসরণ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। আর্য্যদের মধ্যে ঈশ্বরত্ববাদ সম্বন্ধে জ্ঞানের ক্রমবিকাশ কিরূপে হইয়াছে তাহার একটি নক্সা প্রস্তুত করিয়া এদেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় ও বিদেশী সুধী-সমাজকে উপহার দিবার উদ্দেশ্যে রমেশচন্দ্র ঋগ্বেদ হইতে আরম্ভ করিয়া বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থের ভিতর দিয়া ভারতের প্রাচীনতম চিন্তাধারার ইতিহাস ঋষি-কুল ও প্রাচীন কবিদের সাহায্যে সংক্ষেপে বর্ণন করিয়াছেন। আমাদের সেইজন্য মনে হয় যে, রামায়ণ ও মহাভারতের ইংরাজি অনুবাদ অপেক্ষা "প্রাচীন ভারতের গাথা"র (Lays of Ancient India) মূল্য অধিক। ভারতের বিরাট 'এপিক' সম্বন্ধে বিদেশী পাঠকের অভিজ্ঞতা পূর্ব্বে ছিল না সত্য, কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ফরাসি ভাষায় রামায়ণ ও মহাভারতের অনেকগুলি চরিত্রের বর্ণনা প্রকাশিত হইয়াছিল। তরু দত্ত ২৪শে এপ্রিল ১৮৭৬ সালে মিস্ মার্টিনকে লিখিয়া-ছিলেন,—"I have finished La Femme

dans le' Inde Antique." প্রাচীন ভারতের প্রসিদ্ধা নারীগণের মধ্যে শকুন্তলার আখ্যান রমেশচন্দ্রের শতবর্ষ পূর্ব্বে স্যর উইলিয়ম জোন্স কালিদাসের কাব্য হইতে ইংরাজিতে অনূদিত করিয়া বিদেশী পাঠকের কৌতূহল জাগাইয়া তুলিয়াছিলেন। গ্রিফিথ্ ও উইলসন্ পৌরাণিক নরনারীর বিস্তর চিত্র অঙ্কিত করিয়া কাব্যামোদী ইংরাজ পাঠকের অনুসন্ধিৎসা চরিতার্থ করিয়াছিলেন। ভারতের প্রাচীন সমাজ সম্বন্ধে সেইজন্য পাশ্চাত্য অভিজ্ঞতা লাভের কতকটা সুবিধা হইলেও আধ্যাত্মিক জগতে প্রাচীন ভারত যে কতদূর অগ্রসর হইয়াছিল তাহা বিদেশীর পক্ষে জানিবার সুবিধা হয় নাই। মোক্ষমূলর-প্রমুখ দুই একজন প্রত্ন-তাত্ত্বিক উপনিষদ ও বৌদ্ধ ধর্ম্ম-গ্রন্থের আংশিকভাবে ইংরাজি অনুবাদ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু রমেশচন্দ্র "প্রাচীন ভারতের গাথা"র যেভাবে আধ্যাত্মিক তত্ত্বের বিকাশ তৎ-কর্তৃক নির্ব্বাচিত ও ইংরাজি পদ্যে অনূদিত গাথার পর গাথার ভিতর দিয়া দেখাইয়াছেন তাঁহার পূর্ব্বে বা পরে সেভাবে কেহ দেখাইবার কল্পনা পর্য্যন্ত করেন নাই। বিদেশীর তুলনায় পাশ্চাত্যমোহী বাঙ্গালীর নিকট রমেশচন্দ্রের আলোচ্য "গাথা"র আদর বেশী হওয়া উচিত, কারণ আর্য্যগণের ধর্ম্ম-গ্রন্থে তাহাদের মধ্যে অনেকের অধিকার ছিল না, আর যাহাদের ছিল তাহারা সংস্কৃত ভাষায় অনভিজ্ঞ ছিল। রমেশচন্দ্রের "গাথা" যাঁহারা পাঠ করিবেন তাঁহারা প্রাচীনতম সময় হইতে এদেশে ধর্ম্মের গতি সম্বন্ধে এমন একটি উপাদেয় তথ্যের সন্ধান পাইবেন যাহা রমেশচন্দ্রের পূর্ব্বযুগে সংস্কৃত ভাষায় অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণও সহজে ধরিতে পারেন নাই। বাস্তবিক এদেশের চিন্তা-রাজ্যে রমেশচন্দ্রের যথার্থ স্থান, আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ এখনও নির্দ্দিষ্ট হয় নাই, যখন হইবে তখন আমরা বুঝিব যে, অনুবাদ-ক্ষেত্রে রমেশচন্দ্রের প্রতিভা বাঙ্গালা রামায়ণ ও মহাভারতের কবিদের প্রতিভাকেও অতিক্রম করিয়াছিল। কিশোরীমোহন গাঙ্গুলী ইংরাজিতে মহাভারত অনুবাদ করিলে কবি রাম শর্ম্মা তাঁহার উদ্দেশে যে কবিতা রচনা করিয়াছিলেন রমেশচন্দ্রের কীর্ত্তি সম্বন্ধেও তাহার শ্লোকগুলি প্রযোজ্য।

"Tis an Herculean task most nobly done,
My Kisori ! No heroism of Knight,
Fighting for country. truth, or trampled right
A higher praise e'er merited or won
Than you may claim ; for, like your sons of old,
By worldly cares and trials undepress'd
You've led, by lightsome ways, the wond' ring West
To matchless Vyasa's mine of Epic gold.
But where's the voice that breathes forth wealth and fame,
The hand that crowns with boys the scholar's brow ?
Oh ! will no Vikram, will no Akbar now
Reward your labours, dignify your name ?
Yes, England's noble, generous and just;
Bengala's scholar son ! put there your trust.

ইংরাজ সমালোচক শতমুখে রমেশচন্দ্রের প্রশংসা করিয়াছেন। বাঙ্গলার সাহিত্য-পরিষৎ "রমেশ-ভবন" প্রস্তুত করিয়া মৃতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন।

[ক্রমশঃ]

গল্প

মরু-তীর্থ

শ্রীতিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়

মেয়েটীর মুক্তার মত দাঁতের সারিতে ধরা-পড়ার হাসি ফুটিয়া উঠিল। বলিল,—"ভালবাসার কথা মুখে কখনো বলি নি,—অন্ততঃ তোমার কাছে তা বলবার প্রয়োজন কখনো হবে ব'লেও মনে হয় না।"

ঝড়ু এক মুহূর্ত্ত স্তব্ধ হইয়া রহিল। তার পর ঢোক গিলিয়া বলিল,—"জীবনটা যাদের নীবব কাব্য তাদের ভাষার প্রয়োজন তো নেই ইলা!"

ইলা তার সজল ডাগর চোখদুটী ঝড়ুর চোখের উপর বিঁধিয়া দিয়া বলিল,—"শুনেচ ঝড়ুদা? আমার বিয়ের কথা হচ্চে।"

শুনেচি।

কিন্তু—

ঝড়ু তাকে কথা শেষ করিতে না দিয়া বলিল, "তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হবে না—এই তো? তাতে কি হয়েচে? এতে তো কিন্তুর কিছু নেই ইলা!"

"ঝড়ুদা!" ইলার স্বর কাঁপিয়া উঠিল।

ঝড়ু কহিল, "ছিঃ—ওকি ইলা! তুমি কাঁদচ? একদিন তো তোমায় বলেচি—আর আমার বিয়ে হ'তে নেই। থাম—কি হচ্চে? তবু কাঁদচ?"

ইলা চোখের জল না মুছিয়াই বলিয়া উঠিল,—"আমি শুনতে চাই ঝড়ুদা, কেন—কি অপরাধে তোমার মত বিদ্যে বুদ্ধিতে গ্রামের সব চেয়ে সেরা মানুষটীকে সমাজ আজ এত অবজ্ঞা করচে!"

ঝড়ুর রোগ-শীর্ণ পাণ্ডুর মুখখানিতে পাতলা একটুখানি হাসি দেখা দিল। বলিল,—"অবজ্ঞা করবার যথেষ্টই রয়েচে ইলা। পাঁচটী বছর ধরে আমি যে জেল খেটেচি।"

"তাতে কি হয়েচে? সে তো তুমি দেশের জন্যে—"

ঝড়ু বাধা দিয়া বলিল, "সমাজের মানুষ দেশকে অত বড় ক'রে ভাবতে এখনো পারে না। দু' একজন যাঁরা পেরেচেন তাঁরা বাইরে তা স্বীকার করতে ভয় পান।"

ইলা মাথা তুলিয়া বলিল,—"কেন?"

"ইচ্ছা ক'রে নয় ভয়ে।"

ইলা তার বাপের ও পিতৃবন্ধু রাজনারায়ণবাবুর কথা ভাবিয়া খানিকক্ষণ মৌন হইয়া রহিল। সত্যই তাই। তাঁরা আজও ইলার কাছে শতমুখে ঝড়ুর সুখ্যাতি করেন। কিন্তু ঝড়ুর সঙ্গে যে একটা সম্বন্ধ স্থাপন করিবার ইচ্ছা আগে তার বাপ মনে মনে পোষণ করিতেন, আজ আর সেটা নাই। জেল হইতে ফিরিয়া আসিবার পর ঝড়ু যেন তাঁর কাছ থেকে অনেক দূরে সরিয়া গিয়াছে!

ঝড়ু হাসিয়া বলিল, "কি ভাবচ বল দিকিন্?"

ইলা হাঁপাইয়া উঠিয়া বলিল,—"তুমি চেয়েছিলে গ্রামের স্বাস্থ্য, কৃষি, আর্থিক ও সামাজিক উন্নতি ক'রতে কিন্তু মানুষ কেন তা উল্‌টো বুঝে—"

"ভুল বুঝচ। ওদের ধারণা এ থেকে যে বিপ্লবের আগুন—"

সহসা ঝড়ু চমকিয়া উঠিল। ঢং ঢং করিয়া বালিকা-বিদ্যালয়ে ছুটীর ঘণ্টা বাজিতেছে। ঝড়

বলিল,—"আজ আর থাক, আমি যাচ্ছি তা হ'লে। পাঁচটার ভেতর আমায় থানায় হাজির দিতে হবে।"

"তুমি কাঁপচ কেন?"

এই বলিয়া ঝড়ুর গায়ে হাত ঠেকাইয়া বিস্ময়ের স্বরে ইলা বলিয়া উঠিল,—"এ কি! জ্বরে যে তোমার গা পুড়ে যাচ্ছে!"

জ্বরের ধমকে ঝড়ুর ঠোঁট দুটী কাঁপিতেছিল। কষ্টে হাসিয়া বলিল,—"আজ জ্বরের পালা কি না! তা হ'ক, ও অমন হয়।"

"তা যেন হ'ল। কিন্তু এই নদী কেমন ক'রে তুমি পার হবে? ডোঙা সাল্‌তি কিছুই যে দেখতে পাচ্ছি না।"

"কিছুরই দরকার হবে না। আমি সাঁতরে যাব।"

"সে কি! তুমি কি বল্‌চ! এত জ্বর—মাঘ মাসের এই দারুণ শীত—আর তুমি সাঁতরে—না না তা হবে না। বাবাকে বলে এক-জন লোক বরং আমি থানায় পাঠিয়ে দিচ্ছি। সে তোমার খবর দিয়ে আস্‌বে।"

"তা হয় না ইলা। দারোগার হুকুম—যেমন ক'রে হ'ক ফি শনিবারে আমাকে স্বয়ং হাজির হ'তে হবে। আর না, বড্ড দেরী হয়ে গেছে।"

এই বলিয়া ঝড়ু মালকোঁচা বাঁধিয়া জলে ঝাঁপাইয়া পড়িতেছিল, ইলা অনিশ্চিতকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "তোমার পায়ে পড়ি ঝড়ুদা—একটা কথা শুনে যাও!"

ঝড়ু এক হাঁটু জলে দাঁড়াইয়া কহিল,—"কি বল?"

"জানি না বাবার উদ্দেশ্য কি? ঐ চণ্ডাল দারোগার ছেলের সঙ্গেই আমার বিয়ে হবে। আমি কিন্তু এখুনি বাবাকে গিয়ে বল্‌ব যে, কিছুতেই আমি—"

ঝড়ু বাধা দিয়া বলিল,—"না, তা ক'রো না। চণ্ডালের ঘরে তপস্বিনী যাচ্ছে—ফল ভালই হবে।"

ইলা তার ঝুলিয়া-পড়া মুখখানিকে অতিকষ্টে তুলিয়া দেখিল, ঝড়ু তার কথা শেষ করিয়া সাঁতার দিতে সুরু করিয়াছে। জ্বরাক্রান্ত রোগী বরফের মত ঠাণ্ডা এই জলে সাঁতার দিতেছে! ইলা আর সেদিকে চাহিয়া থাকিতে পারিল না। আঁচলে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ঘরে ফিরিল।

* * *

"ইলা!"

"কেন বাবা?"

"শরীরটা আজ কি তোর খারাপ হয়েচে?"

"না।"

"তবে?"

ইলা বালিশ হইতে মাথাটা একটু তুলিয়া বাপের মুখের উপর একবার চোখ বুলাইয়া লইল।

জ্ঞানবাবু তার চাহনি দেখিয়া চিন্তিতভাবে বলিলেন, "কেন মা, এমন অসময়ে শুয়ে?"

ইলা উঠিয়া বসিয়া বলিল,—"মনটা ভাল নেই বাবা!"

জ্ঞানবাবু কন্যার পাশে বসিয়া পড়িয়া তার পিঠে একটা হাত রাখিয়া সস্নেহে বলিলেন,—"কেন? কি হয়েছে? পাড়ার লোক জট্‌লা ক'রেচে বুঝি?"

ইলা কহিল,—"তা'তে আমার কিছু এসে যায় না বাবা! আজ একটা কাণ্ড দেখে ফেবলি আমি"—

ইলাকে হঠাৎ চুপ করিয়া যাইতে দেখিয়া জ্ঞানবাবু বলিলেন,—"আমি যে তোর মা-বাপ দুইই। আমার কাছে কোন কথা বল্‌তে যদি ইতস্ততঃ করিস্—আমার কিন্তু তাতে বড্ড দুঃখু হবে।"

ইলা কি বলিতে গিয়া বলিতে পারিল না। বাপের চোখের উপর তার সেই টানা ভাসা-ভাসা চোখ্ দুটী ফেলিয়া কেবল চুপ্ করিয়া রহিল।

"কৈ? বল্‌লি না? তা হ'লে কি নিতান্তই অপমান কর্‌বি আমাকে?"

ইলা বাপের কোলের উপর মুখ গুঁজিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। বলিল,—"বিয়ে আমি করব না বাবা, অন্ততঃ ঐ রাক্ষস দারোগার ঘরে নয়!"

জ্ঞানবাবু খানিকক্ষণ মৌন হইয়া রহিলেন। তার পর নিবিড় স্নেহের কণ্ঠে ডাকিলেন,—"ইলা!"

ইলা মুখ মুছিয়া উঠিয়া বসিল। জ্ঞানবাবু বলিলেন,—"তুই যে জন্যে এ কথা বল্‌ছিস্—আমি তা বুঝেচি। ঝড়ুর মঙ্গলের আশা ক'রেই আমি বাপ হয়ে তোকে সেই রাক্ষসের ঘরে পাঠাচ্ছি। তুই আর ঝড়ু এই দুটীকে নিয়েই যে আমার জগৎ মা! তার দুঃখ আমি আর দেখ্‌তে পারি না!"

ইলা উদ্বেলিত স্বরে কহিল,—"ভয়ানক জ্বর—তার ওপর নিদারুণ এই শীত! সে অবস্থায় আজ সে নদী ঝাঁপিয়ে"—

জ্ঞানবাবু বাধা দিয়া বলিলেন,—"সে খপর পেয়েই ডোঙা নিয়ে নদীর ধারে এতক্ষণ বসে-ছিলুম। বাড়ীতে তাকে পৌছে দিয়ে—ওষুধ ও পথ্যের ব্যবস্থা ক'রে—তবে আমি আস্‌চি।"

"আমি কিন্তু বুঝতে পার্‌চি না বাবা, আপনি কি জন্যে সেই পাষণ্ডের ঘরে আমায় পাঠাচ্ছেন।"

"চণ্ডালকে ঋষি কর্‌বার শক্তি তোর যে আছে মা! আমি যে জানি তা! তোর ঐ শক্তিটুকু আছে ব'লেই আমার স্বার্থ—তোর স্বার্থ সব আজ বলিদান দিতে যাচ্ছি।"

কথা বলিতে গিয়া ইলার কণ্ঠে বাধিয়া গেল।

জ্ঞানবাবু বলিলেন,—"সমাজের চক্ষে ঝড়ুকে পর করেচি। কিন্তু আমার অন্তরে তোর যেখানে ঠাঁই—সেইখানেই সে আছে। দারোগাকে নরম ক'রে যেমন ক'রে হ'ক, ঝড়ুকে বাঁচানো চাই। তাতেই তাকে আমাদের আপনার ক'রে পাওয়া হবে।"

উন্মত্তভাবে ইলা বলিয়া উঠিল,—"বাবা!"

"কি মা?"

"আমায় ক্ষমা কর বাবা। এতদিন তোমায় বুঝতে পারি নি।"

"অন্যে নেই বুঝুক। অন্ততঃ তোর এই বাপটাকে বোঝা উচিত। আমি যে আমার সমস্ত চেষ্টা দিয়ে তোকে গড়েচি!"

ইলা কাঁদিয়া ফেলিল। কহিল,—"তুমি বল্‌লে এবার আমি আগুনেও ঝাঁপ দেব!"

জ্ঞানবাবু গম্ভীরভাবে বলিলেন,—"বাপের আশীর্ব্বাদের যদি কোন মূল্য থাকে, তা হ'লে সেই আগুন, তোর পায়ের তলায় যেন ফুল হয়ে ওঠে।"

* * *

ইলা সেদিন ঝড়ুর বাড়ীতে আসিয়া হঠাৎ কহিল, "ওমা এ কি! আজ বুঝি বড্ড ক্ষিদে পেয়েচে? নিজেই রান্না চড়িয়ে দিয়েচ যে?"

ঝড়ু একখানা সংবাদ-পত্রের উপর হইতে দৃষ্টিটা টানিয়া তুলিয়া মুচকিয়া হাসিয়া ফেলিল। বলিল,—"তোমার সঙ্গে অসহযোগ কর্‌বার চেষ্টা করচি।"

ইলা প্রথমটা একটু দমিয়া গেল। তখনি সহাস্যমুখে বলিল,—"যা কখনো পার্‌বে না—সে রকম চেষ্টা কর্‌বার কি দরকার আছে বলতো?"

"বড্ড ছেলেমানুষ তুমি ইলা!"

"কেন? কিসের জন্যে? তুমি নিজেই না বলেছিলে যে, আমিই তোমার সহধর্ম্মিণী! জেল থেকে ফিরে এসে তুমি আমাকে বিয়ে"...

ঝড়ু সংরুদ্ধকণ্ঠে বাধা দিয়া সহসা একটু জোরে বলিয়া উঠিল,—"ছিঃ ছিঃ! মনে কর—সেটা স্বপ্ন —সেটা আমার পাগ্‌লামি!"

ইলা উত্তেজিতকণ্ঠে কহিল,—"না না, তা হবে না। নিছক সত্যটাকে আমি মিথ্যে ক'রে গ'ড়ে তুল্‌তে পার্‌ব না।"

ঝড়ুর শীর্ণ ঠোঁট দুটী কাঁপিয়া উঠিল। কহিল, —"অনুরোধ করচি ইলা,—সে-কথা ভুলে যাও!"

"তোমার অত ভয় কর্‌বার কিছু নেই ঝড়ুদা! সর্ব্বনেশে সমাজের জন্যে অপরের স্ত্রী আমি হব—কিন্তু সহধর্ম্মিণী হব না; হ'তে পার্‌ব না! তোমার ধর্ম্মই আমার ধর্ম্ম—তোমার সুখ গড়াই আমার সারা জীবনের ব্রত।"

ঝড়ু অস্থির হইয়া কহিল,—"আমার কথা রাখ ইলা! আর তিনটী দিন পরে তোমার স্বামীর ধর্ম্মই তোমার ধর্ম্ম হবে!"

"পুরাণের ও আদর্শটাকে আমি আর মান্‌ব না ঝড়ুদা! আমি বিদ্রোহিনী। সমাজকে ভেঙে গুঁড়ো কোরে আবার নতুন ক'রে গড়ব! এ জন্মে না পারি, মরে আবার ফিরে আস্‌ব এই বাংলায়!"

কান্নার সুরে ঝড়ুর শুষ্ককণ্ঠ হইতে বাহির হইল,—"তোমার কি মাথা খারাপ হ'ল ইলা?"

ইলা এবার হাসিয়া ফেলিল। কহিল,—"কাল যে ঝোলের কুট্‌নো কুটে রেখে গেলুম—সেগুলো কি হ'ল? ফেলে দিয়েচ না কি?"

ঝড়ু নির্ব্বাক্—নিস্পন্দ—ঠিক্ পাথরের মূর্ত্তির মত।

এই এক মুহূর্ত্ত আগেকার বিদ্রোহিনী ইলা আর যেন সে মানুষটী নাই।

ঝড়ুকে হাসাইবার জন্ত ইলা নিজে পুনরায় হাসিয়া বলিল,—"কইমাছগুলো জিয়ানো আছে—না, পুকুরে ছেড়ে দিয়ে এসেচ ?"

ঝড়ু চিন্তাহত হইয়া নীরবে ধীরে ধীরে নিজের শুইবার ঘরে চলিয়া গেল।

ইলা ঝড়ুর ঘরে আর না গিয়া রন্ধনের কাজে লাগিয়া গেল।

ঘণ্টাখানেক পরে ইলা ঝড়ুর ঘরে ভাত বাড়িয়া দিয়া বলিল,—"নাও ওঠ! আমাকে তো কেবল দুর্ব্বল দুর্ব্বল কর,—এবার বুঝিচি—তুমি কত বড় বীর!"

ঝড়ু চম্‌কিয়া উঠিয়া কহিল,—"সে জন্যে নয় ইলা! আমি কেবল তোমার দিক থেকে"—

হ্যাঁ গো—বুঝেছি! দয়া ক'রে এখন খেতে বস।

ঝড়ু জোরে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া নত মস্তকে খাইতে বসিল।

খাওয়া শেষ হইলে ইলা বলিল,—"কাল থেকে আর এ বাড়ীতে রান্না হবে না। আমার বিয়েতে তোমার নেমন্তন্ন—বুঝ্‌লে ?"

ঝড়ু কোন কথা না বলিয়া আঁচাইতে চলিয়া গেল। ফিরিয়া আসিতেই ইলা বলিল,—"কি যাবে তো ?"

ঝড়ুর বুকের তলায় তখন প্রলয়ের রুদ্র নৃত্য আরম্ভ হইয়াছে। কোন কথা কহিতে না পারিয়া কেবল তার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

ইলা হাসিয়া বলিল,—"না যাও—আমি তোমার ঠ্যাং ধরে হিড়্‌ হিড়্‌ ক'রে টেনে নিয়ে যাব, এ যেন মনে থাকে!"

কথা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই ইলা চলিয়া গেল।

ঝড়ু বিছানার উপর শুইয়া পড়িল। সজল চক্ষে মনে মনে বলিল,—ভগবান্‌!

* * *

তিনদিন পরে।

ইলার আজ জীবন-যজ্ঞ। বিবাহের শাঁখ বাজিয়া উঠিল। জ্ঞানবাবুর সংসারে গৃহিণী না থাকায় পাড়ার বর্ষীয়সীরা আসিয়া বিবাহ-বাড়ীতে সকলেই গৃহিণীপনা করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহাদের অনুরোধে জ্ঞানবাবু বাধ্য হইয়া বাড়ীতে নহবৎ বসাইয়াছেন। শানাই বাজে আর জ্ঞানবাবুর বুকের পাঁজর যেন দুম্‌ড়িয়া যায়। উলুধ্বনি ওঠে—আর তাঁর কাণে সেটা রোদনধ্বনি হইয়া বাজে। একটী মাত্র মেয়ে, তাকে আজ স্বহস্তে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিতে হইবে। মনে জাগিল, হায় ভগবান্‌! এর চেয়ে কেন আমি ঝড়ুর সঙ্গে ইলার বিয়ে দিলুম না! ঝড়ুর মৃত্যু হ'ত ? স্বামীর অসমাপ্ত কাজের জন্যে ইলার জেল হ'ত ? তা হোক একটা দিক থেকে তবু আমি তৃপ্তি পেতাম। হৃৎপিণ্ড ছেঁড়ার কাজ কেন আমি ক'র্‌তে গেলাম। জানি না—আমার এ অন্ধ অভিমানের কি ফল হবে!"

পাড়ার গিন্নীরা আড়ালে গা টেপাটিপি করিয়া ফুস্‌-ফুস্‌ ফিস্‌-ফিস করিতে লাগিল। মুখুয্যেদের বড়গিন্নী বলিল, "কলিতে আর কতই দেখ্‌ব! স্বদেশী-স্বদেশী ক'রে একেবারে দারোগার সঙ্গে কায়েমি কুটুম্বিতে। মুখে আগুন্‌! এতদিন ধরে এ ন্যাকামি তবে কেন ?"

বিরাজীর মা সুর টানিয়া কহিল,—"যা বলেচ দিদি! কাল আমাদের উনিও ঐকথা বল্‌ছিলেন।"

বড়গিন্নী চাপা অথচ উত্তেজিত স্বরে বলিল,—"তা তো বল্‌বেই। এবার যে সবাই বুঝতে পেরেচে মিন্‌সে ডুবে ডুবে জল খেত গো! কাল আমার সেজ ছেলেটাকে খুব একচোট্‌ বক্‌লুম। বাঁদরটা এই এদের কথায় ভিজে মিছিমিছি দু'দিন হাজত বাস ক'রে এলো!"

বিরাজীর মা বলিল,—"গোবরা কি বলে? তার মাথা ঠাণ্ডা হোল একটু?"

"ছাই হয়েচে! অত বকার পর কালও দেখি—সন্ধ্যার সময় সেই স্কুলে গেছে। চাষার ছেলে-গুলোকে পণ্ডিত না ক'রে সে ছাড়বে না।"

"তবেই তো! যাইই বল না কেন—যত নষ্টের গোড়া হচ্চে—ঐ ঝড়ু।"

"বড় কত্তা বলেচে ওটাকে এবার দেশছাড়া ক'রবো।"

"তা'তেই বা কি হ'বে? পোড়ার মুখোর যে লজ্জা মান ভয় কিছু নেই গো! এততেও একটু হেল্‌দোল্‌ নেই। মুখের গেরাস্‌ কেড়ে নিচ্চে তবু এ বাড়ীতেই ফ্যান্‌ চেটে মরচে। দেখ্‌চ না সকাল থেকে কি দৌড়-ঝাঁপ্‌টা ক'রচে! অন্যে হ'লে গলায় দড়ী দিত।"

মুখরা নীরদার মুখটা এতক্ষণ দোক্‌তা-দেওয়া পানে বদ্ধ ছিল। জানালা দিয়া পিচ্‌ ফেলিয়া বলিল, "বয়ে গেছে ওর গলায় দড়ী দিতে! জ্ঞান-কাকার চোখে ধুলো দেবার ফিকিরে ও আছে। সুবিধে পেলেই ইলাকে ফুস্‌লে নিয়ে যদি গা-ঢাকা না দেয় আমার নাম বদ্‌লে রেখো!"

বড়গিন্নী বলিল, "নাম বদ্‌লাতে হবে কেন? আমি তা জানি।"

সকলেই মুখ টিপিয়া নীরবে হাসিল।

গোধূলি লগ্ন। কন্যাকে পাত্রস্থ করিবার জন্য জ্ঞানবাবু আসন গ্রহণ করিয়াছেন। সমুখে ভাবী জামাতা। পার্শ্বে চেলীর কাপড়ে মোড়া ইলা।

বর ও কন্যাপক্ষীয় লোকেরা বিবাহ দেখিবার জন্য চারিদিকে ভিড় করিয়াছে। ভিড়ের সামনে জ্ঞানবাবুর ঠিক পাশেই ঝড়ু স্থির প্রশান্তভাবে দাঁড়াইয়া আছে। কি যেন একটা জয়-গৌরবের জ্যোতিঃ তার পাণ্ডুর মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

ঝড়ুর দিকে দৃষ্টি পড়িতেই হঠাৎ দারোগা বলিলেন,—"আপনি—আপনি যে এখানে?"

ঝড়ু মুচকিয়া হাসিয়া বলিল,—"আমার থাকাটা যদি অন্যায় হয়,—আমি চলে যাচ্ছি।"

"না না। তা কেন? আমি বলচি আপনার বাড়ীর কি?"—

ঝড়ু তাঁহাকে বাধা দিয়া বলিল, "যাবার আগে আমি জান্‌তে চাই, এই বিবাহ-মণ্ডপ যেখানে হিন্দুর নারায়ণশিলা উপস্থিত, সেটা কি থানা?"

দারোগা এক মুহূর্ত্ত তার দৃপ্ত মুখের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া স্তব্ধ ও মৌন হইয়া রহিলেন। তার পর কহিলেন, "অর্থাৎ?"

এই অর্থাৎ কথাটা তাঁর অন্তরের সঙ্গে পরামর্শ না করিয়াই যেন ঠেলিয়া বাহির হইয়া আসিয়াছে।

ঝড়ু কহিল,—"মানুষের খেয়ালে গড়া বিচার-স্থান যদি এটাকে বলেন, তা হ'লে এখনি আমি চলে যাচ্ছি, কিন্তু তার বাইরে যে কোন স্থান ব'লে যদি এটাকে স্বীকার করেন, তা হ'লে, কিছুতেই যাব না, কারণ এখানে থাকবার অধিকার আমার আছে।"

অধিকার? অধিকার! কি উগ্র, কি মধুর, কি অখণ্ড সত্য কথা। আলিপনা দেওয়া পিঁড়ির উপর হইতে আগুনের আকস্মিক ঝলক-লাগা লতার মত ইলা ঘরের মেজেতে ঢলিয়া পড়িল।

চারিদিকে হৈ চৈ পড়িয়া গেল। ইলা মূর্চ্ছা গিয়াছে। পাছে কন্যার অবস্থা প্রাপ্ত হন, সেই ভয়ে জ্ঞানবাবু আসন ত্যাগ করিয়া উঠিলেন না। তাঁহার মাথার ভিতর তখন যেন দাউ দাউ করিয়া আগুন জ্বলিতেছে।

ইলার চোখে মুখে জলের ঝাপটা দিয়া অনেক ক্ষণ বাতাস করা সত্ত্বেও যখন তাহার চেতনা

ফিরিয়া আসিল না, তখন ডাক্তার ডাকিতে লোক ছুটিল।

দারোগা এতক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া বসিয়াছিলেন। ঝড়ুর তেজঃদীপ্ত কথা আর ইলার সংজ্ঞা-হারানো এই দুটো যেন আজ ভয়ানক রহস্য হইয়া বিজ্ঞ প্রবীণ দারোগার মাথাকে গুলাইয়া দিয়াছে। প্রত্যেক রবিবারে এই হাড়-সার ঝড়ুকে তিনি দেখেন। নির্ভীক বলিয়াও ঝড়ুর উপর ধারণা তাঁর আছে। কিন্তু আজ তার এ কি মূর্ত্তি! জীবনে অনেক মানুষকে লইয়া তাঁহাকে নাড়াচাড়া করিতে হইয়াছে। আজ তাঁর মনে হইল এমন অদ্ভুত শক্তিসম্পন্ন রহস্যময় মানুষ তিনি কখনো দেখেন নাই। ঝড়ুর মুখের উপর আর একবার দৃষ্টি ফেলিয়া তিনি চুপ করিয়া রহিলেন।

মিনিট দুই পরেই ইলার পিতৃবন্ধু রাজনারায়ণ বাবুকে ডাকিয়া লইয়া তিনি আড়ালে চলিয়া গেলেন।

তখনো ডাক্তার আসে নাই। ভিড় ভাঙিয়া দিয়া জ্ঞানবাবুকে জোর করিয়া অন্য ঘরে সরাইয়া দেওয়া হইয়াছে। পাড়া-প্রতিবেশী কয়েকজন নারী ছাড়া, সেখানে বড় আর কেউ ছিল না। রাজনারায়ণ-বাবুর স্ত্রী ইলার মাথায় বাতাস করিতেছিলেন।

বড় গিন্নী মুখ ঘুরাইয়া চাপাস্বরে বলিল, "পাখা টেনে হাতটা যে খসে গেল! তোমারও যেমন পাপের ভোগ! ওসব ঢং ঢং!"

রাজনারায়ণবাবুর স্ত্রী মনে মনে বিরক্ত হইয়া উঠিলেন।

বিরাজীর মা বলিল,—"বাপ তো খিরিষ্টান। আগে তাকে বললেই পারতো, এত ঢলাঢলি কেন?"

বড় গিন্নী চিপটেন করিয়া বলিল,—"বাহাদুরী গো! ঝড়ুর গুপ্তলীলার কথা জানতে তো আর কারুর বাকী নেই। কেলেঙ্কারীটা ঢাকবার জন্যে এটা একটা ফিকির আর কি!"

বিরাজীর মা নেহাৎ গো-বেচারীর স্বরে কহিল, "কি জানি ভাই।"

সহসা রাজনারায়ণ বাবুর স্ত্রী পাখা ফেলিয়া দিয়া ইলার কপালে সস্নেহে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন,—"এই যে মা, আমি তোমার কাছে আছি।"

বিরাজীর মা বড়গিন্নীর মুখের দিকে চাহিতেই সে ক্রূর হাসি হাসিয়া কহিল, "মরব কবে তাই জানি না গো।"

একটু পরেই ইলা উঠিয়া বসিল। আবার সেই বিবাহের উৎসব-ধ্বনি—সেই মাঙ্গলিক উলু রব—সেই নহবৎ বাজ্‌না।

ঝড়ু জ্ঞানবাবুকে আনিয়া পুনরায় তাঁহার আসনে বসাইয়া দিল। বিনীতভাবে বলিল, "ক্ষমা করুন কাকা, আমার অপরাধ হয়েচে!"

উত্তরে কিছু বলিবার ভাষা জ্ঞানবাবুর যেন আর নাই। থাকিলেও—কণ্ঠ তাঁর রুদ্ধ—কি করিয়া বলিবেন? বৃদ্ধের চোখদুটী অশ্রুতে ভরিয়া উঠিল। বিবাহের আয়োজন সব ঠিক করিয়া দিয়া ঝড়ু নিজেই বরকর্ত্তাকে ডাকিতে 'গেল। কৃত-কর্ম্মের প্রায়শ্চিত্ত যে তাহাকেই করিতে হইবে!

দারোগা আসিয়া যাহা বলিলেন তাহাতে সকলেই বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া গেল। জ্ঞান-বাবুকে তিনি জানাইয়া দিলেন যে, রাজবন্দী ঝড়ুর সহিত ইলার বিবাহ দেওয়া হউক আর সেই মণ্ডপেই রাজনারায়ণবাবুর অবিবাহিতা নাতিনীর সহিত বিনাপণেই তিনি পুত্রের বিবাহ দেবেন।

জ্ঞানবাবু চম্‌কিয়া উঠিলেন। বিস্ময়-কম্পিত কণ্ঠে বলিলেন,—"কেন—কেন আপনি এমন কথা বল্‌চেন?

দারোগা গম্ভীর ভাবে বলিলন,—"যেখানে সত্যরূপী নারায়ণ আছেন—বয়েস হয়েচে—সেখানটায় পুলিশের জিদকে আমি বড় হ'তে দেব না।"

জ্ঞানবাবু উন্মত্তভাবে বলিয়া উঠিলেন,—"না, না, রাগ করবেন না!—ওটা পাগল—ওর মাথা খারাপ হয়েচে।"

দারোগা স্মিতহাস্যে কহিলেন,—"সত্যিই ও পাগল। উলঙ্গ সত্যকে ও যে জীবনের ব্রত করেচে। এ যুগের ধাতে তা সইবে কেন?"

জ্ঞানবাবু অস্থিরভাবে বলিলেন,—"ওকে ক্ষমা করুন দারোগাবাবু! ওর জীবনটুকু আমায় ভিক্ষা দিতে হবে!"

দারোগা হাসিয়া বলিলেন,—"অত বাড়াবাড়ি করলে কিন্তু চল্‌বে না। ওর বাপেব আসনটা চিরকাল আপনিই বা দখল করবেন কেন?"

জ্ঞানবাবু নির্ব্বাক্। তাঁর সমস্ত কথা যেন এই এক মুহূর্ত্তের মধ্যে কোথায় হারাইয়া গিয়াছে! অনেকক্ষণ পরে জড়িতকণ্ঠে বলিলেন,—"আপনি আপনি!"

দারোগা এবার, উচ্চহাস্য করিয়া বলিলেন,—"আমি মানুষ,—দারোগা ব'লে অদ্ভুত কোন একটা জীব নই!"

বিবাহের পরদিন।

দারোগা বরকনে লইয়া বিদায় লইতেছিলেন, এমন সময় ঝড়ু ও ইলা আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া ভক্তির সহিত পায়ের ধূলা লইল।

দারোগা ঝড়ুর দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, "এ রবিবারে তোমায় আর থানায় যেতে হবে না। সুবিধামত আমার সঙ্গে একদিন দেখা ক'রো বুঝ্‌লে?"

ঝড়ু সংরুদ্ধকণ্ঠে কহিল, "দারোগা বাবু!"

দারোগা হাসিয়া বলিলেন, "ও রকম সম্বোধন আর না ক'রে এবার না হয় কাকাবাবুটাই বল্‌লে, তা'তে আর ক্ষতি কি?"

কি বলিবে না বলিবে, কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া ঝড়ু হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

ইলার মাথায় হাত দিয়া দারোগা আশীর্ব্বাদ করিলেন। বলিলেন, "কিছু আর ভয় নেই মা! এই বুড়ো শ্বশুরটী আজ থেকে তোমার পতির পথে পাহারা দেবে। তবে একটা কথা আছে মা! বুড়োটীকে আর ঘৃণা করতে পাবে না—কেমন রাজী?"

সশ্রদ্ধ দৃষ্টিতে ইলা দারোগার মুখের দিকে চাহিতেই তাহার চোখ দিয়া টস্ টস্ করিয়া জল ঝরিয়া পড়িল।

উপন্যাস
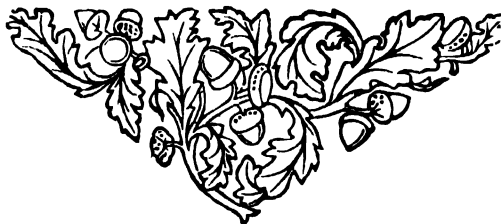
প্রত্যাবর্ত্তন

কবিশেখর শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

সহসা ভূমিকম্প হইলে যেমন গৃহস্বামী চমকিত ও বিস্ময়ান্বিত হইয়া উঠে, পত্রপাঠে মনোরমা তেমনই অধীরা হইয়া উঠিল। তাহার সর্ব্বাঙ্গ ঘর্ম্মাক্ত হইয়া কাঁপিতে লাগিল, তাহার দেহের প্রত্যেক শিরায় যেন তড়িৎসঞ্চার হইতে লাগিল। তাহার মাথা ঘুরিয়া গেল—সে ভূতলে বসিয়া পড়িল। সে কিয়ৎকাল স্তব্ধ হইয়া রহিল। ধৈর্য্যের জীবন্ত প্রতিমা, সহিষ্ণুতার সাক্ষাৎ মূর্ত্তি, ধীরতার বাস্তব চিত্র মনোরমা সহসা কেমন এক রকম হইয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে এই অবস্থা কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইলে, আশ্বস্ত হইয়া তাড়াতাড়ি চিঠিখানি বাক্সের মধ্যে লুকাইয়া রাখিল। কাহার নিকট সে হৃদয়ের গোপন ব্যথা অভিব্যক্ত করিবে? সে ব্যথা বুঝিবার সমব্যথী হৃদয় এ সংসারে তাহার আছে কি?

সেই দিনই সন্ধ্যার সময় মনোরমা পুত্র নলিনকে একান্তে ডাকিয়া কহিল, "বাবা নলিন, তোর মামার বাড়ীতে ত আমাদের অনেক কাল কেটে গেল, তুই যখন তিন বছরের শিশুটি ছিলি তখন তোর ভারি অসুখ হয়েছিল, তোর দাদামশাই ও মামা গিয়ে আমাদের নিয়ে আসেন। এখন তুই লক্ষ্মী-নারায়ণের কৃপায় বড় হয়েচিস্, আর এখানেও ত ঢের দিন থাকা হল; ঘর-বাড়ীর দশা যে কি হয়েছে, নিজের চোখে না দেখ্‌লে ত কিছু বলা যায় না। আমি বলি কি, চল্ মায়ে পোয়ে আস্তে আস্তে নিজেদের বাড়ী গিয়ে উঠি গে।"

নলিন এখন প্রায় দশমবর্ষীয় বালক, বেশ বুদ্ধিমান। মায়ের কথা শুনিয়া সে বিস্মিত হইল। জননী কেন যে পূর্ব্বে কোন কথা না বলিয়া, হঠাৎ আজ বাড়ী ফিরিবার সঙ্কল্প করিলেন, একথা সে কোন মতেই বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। সে সরলভাবে বলিল—"হ্যাঁ মা, তুমি আমাকে একদিন বলেছিলে যে, যখন আমরা বাড়ী যাব, তখন কালুও আমাদের সঙ্গে যাবে, তাকে নিয়ে যাবে ত মা?"

এই আত্মপরজন-প্রপীড়িত নিরীহ অবোধ বালকের প্রতি পুত্রের অন্তরের টান দেখিয়া মনোরমার নেত্র অশ্রুসিক্ত হইল; তাহার হৃদয় করুণায় ব্যথিত হইলেও সহানুভূতির চিরমধুর স্নিগ্ধ স্বরে বলিল, —"হাঁ তখন বলেছিলুম বটে, কিন্তু পরের ছেলেকে কেমন করে নিয়ে যাবি বাবা, আর তার মা-ই বা যেতে দেবে কেন? সেই বা যাবে কেন?"

নলিন কহিল,—"আমি বল্‌লেই যাবে, সে প্রায়ই আমাকে বলে, নলিন তোরা দেশে গেলে আমিও তোদের সঙ্গে যাব; আমি বল্‌লুম বলিস্ কিরে কালু, তোর মা কি কখন ছেড়ে দেবে যে, তুই আমাদের সঙ্গে যাবি? কালু কিন্তু মা আমার কথা শুনে কাঁদ্‌তে লাগল।"

মনোরমার অযাচিত স্নেহ ও যত্নের মধুর প্রলেপে তাহার উপেক্ষাতপ্ত বুক জুড়াইয়া গিয়াছিল। অবোধ মূর্খ বালকের সে তৃপ্তি ভাষায় ব্যক্ত করিবার শক্তি ছিল না। কিন্তু সে তাহার জড়ত্ব-বিজড়িত

মর্ম্মের প্রতি স্তরে অতি তীক্ষ্ণভাবে তাহা অনুভব করিত। গৃহপালিত পশুপক্ষীরও প্রচ্ছন্ন বোধ-শক্তি আছে; সে ত মানুষ। মনোরমা বেশ জানিত, কেলোর প্রাণ তাহার নিকটে পড়িয়া আছে। যে স্নেহের এতটুকু কণিকাও সে অপর কোথাও খুঁজিয়া পায় নাই, তাহার নিকট সে তাহা প্রচুর পরিমাণে পাইয়াছে। তাহাদের যাইবার সময় তাহার বক্ষে যে একটা বিষম বেদনা চাগিয়া বসিবে, একটি শুষ্ক মুখ আশ্রয়স্থল খুঁজিয়া বেড়াইবে, ইহা ভাবিয়া মনোরমার নেত্র অশ্রুসিক্ত হইল।

মনোরমা স্নেহার্দ্রকণ্ঠে কহিল,—"দেখ নলিন এবার যাবার কথা উঠলে কালুকে বলবি, তুই এখন ছেলেমানুষ, আর একটু বড় হ, তখন তোকে নিয়ে যাব; এখন সেখানে গিয়ে কি করবি।"

কথা শেষ না হইতেই কেলো সহসা সেখানে আসিল, তাহাকে দেখিয়াই নলিন বলিয়া ফেলিল,—"কালু আমরা শীগগির দেশে যাচ্ছি রে"—নলিনের কথা শুনিয়াই কেলো উল্লাসে লাফাইয়া বলিয়া উঠিল,—"আমিও তোদের সঙ্গে যাব রে, আমাকে নিয়ে যেতেই হবে। তুই যে বলেছিলি, তোর মা বলেছিল, তোদের সেখানে খুব বড় বাগান আছে, সেখানে গিয়ে গাছে উঠে পাখীর বাসা পাড়ব; বাগানের ফল খাব; নিয়ে চল আমাকে, বেশ থাকব অখন।"

তাহার আগ্রহ দেখিয়া নলিন বলিল, —"দূর মুখ্যু এখন কোথায় যাবি রে!"

মনোরমা গম্ভীর কণ্ঠে কহিল,—'নলিন'। জননীর ভাব বুঝিয়া নলিন চুপ করিয়া গেল। কেলোর দিকে ফিরিয়া মনোরমা স্নেহের স্বরে কহিল,—"বাবা কালু তুই এখন একরত্তি ছেলে, মাকে ছেড়ে ত থাকতে পারবি নি, একটু বড় হ, তখন নিয়ে যাব।"

কেলো আবেগের স্বরে বলিল,—"কেন পারবো না বড় দি, খুব থাকতে পারবো; তুমি থাকলে আমার ভাবনা কি? আমি আর কাউকে ত চাই নি। আমার মাকে ত চেন না বড় দি, যে যাই করুক না কেন, তাল এসে পড়বে আমার ঘাড়ে।"

কালুর কথায় মনোরমা ভীতা হইয়া বলিল,—"অত চেঁচিয়ে কথা কস্‌নে কালু, এখুনি কেউ শুনতে পেলে, তোর দুর্দ্দশার বাকী থাকবে না; আস্তে কথা কইতে পারিস্ নে বোকা ছেলে? এত মার খেয়েও একটু আক্কেল হ'ল না!"

"এবার থেকে আস্তে কথা কব বড় দি! আমাকে নিয়ে চল; তুমি গেলে এখানে আমার একটুও ভাল লাগবে না" বলিয়া কেলো কাঁদ কাঁদ হইল।

মনোরমা দ্রবীভূত কণ্ঠে বলিল,—"ছি কালু বাবা অমন করতে নেই; বলচি ত এর পরে নিয়ে যাব; কথা শোন্, অমন করিস্ নি।"

কেলো আর্ত্তকণ্ঠে কহিল,—"তুমি ত আর আসবে না বড় দিদি যে, আবার আমায় এসে নিয়ে যাবে।"

মনোরমা বিস্ময়-জড়িত স্বরে বলিল,—"সে কি রে! এ কথা তোকে কে বললে যে, আমি আর আসব না?"

কেলো ক্ষিপ্রস্বরে উত্তর করিল,—"বলবে আবার কে বড় দি, আমি ঠিক জানতে পাচ্ছি যে তুমি কখখনই আর এখানে আসবে না!"

কেলোর কথায় মনোরমা অবাক্ হইয়া গেল! কোন স্বাভাবিক দিব্য জ্ঞানে যে একটা নির্ব্বোধ বালক এরূপ উক্তি করিতে পারে, এ তাহার ধারণার অতীত। মনোরমা আবেশে অধীর হইয়া তাহাকে বক্ষে ধারণ করিল? নলিন নির্ব্বাত-নিষ্কম্প দীপ-শিখার ন্যায় নির্নিমেষনয়নে প্রস্তর,

মূর্ত্তিবৎ স্থির হইয়া জননীর মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

গিরীন্দ্রের নিকট হইতে স্বামীর সংবাদ পাওয়া অবধি মনোরমার চিত্ত নানা চিন্তায় উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছিল। পিত্রালয়ের কোন বিষয়েই চিত্ত আর স্থির করিতে পারিল না। তাহার স্বামিগৃহের শত সুখ-শান্তি-প্রদ স্মৃতি যেন সহস্রদলে বিকশিত হইয়া তাহার অন্তরতম প্রদেশের প্রতি অণু-পরমাণুকে স্তরে স্তরে ছাইয়া ফেলিল। ভাদ্রের ভরা নদীর প্রখর স্রোতে দণ্ডায়মান স্নাতকের ন্যায় সে স্বামিগৃহের স্মৃতি-তরঙ্গে আন্দোলিত হইতে লাগিল। তাহার চিরমার্জ্জিত গৃহকুট্টিম, ধূলিকণাহীন গৃহপ্রাঙ্গণ লতাগুল্মে সমাচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। তুলসীমঞ্চে তুলসীতরু গঙ্গাজলাভাবে শুষ্ককাষ্ঠে পরিণত। দেবতার সন্ধ্যারতি, সন্ধ্যার মঙ্গল শঙ্খধ্বনি-মুখরিত গৃহমন্দিরে হয় তো নিবিড় নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতেছে। তাহার সেই প্রভাতের শুক্রতারকার ন্যায় শুভ্রোজ্জ্বল, পতিদেবতার নিসেবিত চিরপুণ্যময়, চিরস্তব্ধ, হাস্যময় গৃহ ঘন অন্ধকারে ছাইয়া ফেলিয়াছে। অতীতের বহুবিধ স্মৃতির পীড়নে পতিব্রতা বিরহিণী অধীরা হইয়া উঠিল। সেই প্রীতিভরা পল্লীনিবাসের স্মৃতি-প্রবাহিনী লহরে লহরে স্ফীত হইয়া তাহার হৃদয়ের কূল ছাপাইয়া উথলিয়া উঠিতে লাগিল। দশহরার পুণ্য-পর্ব্বাহে জাহ্নবী-সৈকতে গঙ্গাপূজা, রথযাত্রার কোলাহল, ঝুলনযাত্রার মধু-উৎসব, জন্মাষ্টমী ব্রত, শারদীয়া উৎসবের হর্ষোচ্ছ্বাস, দীপান্বিতা নিশীথিনীর আলোকমালা, লক্ষ্মী-নারায়ণের জন্মতিথি, পৌষপার্ব্বণের হুলাহুলি, সরস্বতীপূজার গীতিধ্বনি, কোজাগর পূর্ণিমার আনন্দ-আলিপনা, শিবরাত্রির উপবাস ও নিশা-জাগরণ, বাসন্তীপূজার সুখস্মৃতি, ঘণ্টাকর্ণ পূজা, চড়ক পার্ব্বণ, বট-অশ্বত্থমূলে গ্রাম্য দেবতার অর্চ্চনা, গৃহসংলগ্ন উদ্যানে পুষ্পচয়ন প্রভৃতি নানা সুখোচ্ছ্বাস-ভরা স্মৃতি-হিল্লোলে মনোরমার হৃদয়-যমুনা উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। সেই অর্দ্ধাধিক যুগের অর্দ্ধবিস্মৃত, অর্দ্ধ জাগ্রত স্মৃতি-সম্ভার মূর্ত্ত হইয়া তাহার নয়ন-পথে প্রকটিত হইয়া তাহাকে উন্মাদনায় বিহ্বল করিয়া তুলিল। তাহার প্রদীপ্ত ললাট প্রখর চিন্তার কুঞ্চিত রেখাপাতে ছায়াচ্ছন্ন গোধূলির স্তিমিত সন্ধ্যার ন্যায় দেখাইতে লাগিল। একে সে স্বভাবতই গম্ভীরা; সেই শান্ত স্নিগ্ধ প্রশান্ত মুখমণ্ডলে এই অভাবনীয় ভাবের ব্যতিক্রম বাটীর অপর কেহ লক্ষ্য করিয়াছিল কি না বলা যায় না, কিন্তু জননী আনন্দময়ীর চক্ষে কন্যার এই আকস্মিক পরিবর্ত্তন কিছুতেই আত্মগোপন করিতে পারিল না। তিনি কন্যাকে নিভৃতে পাইয়া উদাস-বিষণ্ণ-নেত্রে তাহার পানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"মনু, আজকাল তোকে কেমন কেমন দেখছি কেন মা? শরীর কি ভাল নেই? কোন কাজেই আর তেমন ধরা ছোঁয়া দিচ্ছিস্ নে, এমন সরে সরে থাক্‌চিস্ কেন বল দেখি?"

মনোরমা বিমর্ষ করুণ-স্বরে-উত্তর করিল—"মা অনেক কাল হয়ে গেল বাড়ী ছেড়ে এসেছি। আজ ক'দিন থেকে মনটা কেমন কচ্চে। নলিনও এখন বড় হয়েচে, আর কতদিন ঘর-দোর ফেলে এখানে পড়ে থাকব? তাই ভাবছি এইবার আমরা বাড়ী যাই।"

সহসা কন্যার এই উত্তরে জননী বিস্মিতা হইলেন; কন্যার ব্যথা তাঁহার প্রাণে নিরন্তর বাজিত, মুখে কোন কথাই বলিতে পারিতেন না। স্বামী-বিরহিতা গৃহহারা যুবতী প্রাণে অহরহ প্রজ্জ্বলিত

কি নিদারুণ তুষানল লইয়া পিত্রালয়ে বাস করিতেছে তাহা তাঁহার অপরিজ্ঞাত ছিল না। জননী সান্ত্বনা দিয়া কহিলেন, "মনু তোকে আর আমি কি বুঝাব বল? সবই ত বুঝছিস। এখন আর সেখানে গিয়ে কি করবি? তোকে দেখলেও আমার মনটা জুড়োয়। হরিহরের সন্ধান ত এখনো কিছু কত্তে পাল্‌লুম না, তিনি ত খোঁজ করতে কিছু বাকী রেখে যান্ নি; সবই বরাত! আমিও আর ক'দিন বল; শরীরও দিন দিন ভেঙ্গে পড়চে, শেষের বাকী কটা দিন আর ও বিষয়ে রা কাড়িস্ নে।" এই বলিয়া তিনি অঞ্চলে চক্ষু মুছিলেন।

মনোরমা স্নিগ্ধস্বরে কহিল,—"মা তোমার জন্যেই আমি এতদিন নড়্‌তে পারি নি; এক ঠাকুর মশাইয়ের ওপরে বাড়ীর সমস্ত ভার ছেড়ে দিয়ে আর কতকাল এমন নিশ্চিন্ত হয়ে থাকা যায় বল? বড় কম দিনও ত এখানে কাটল না। এত কাল যে যাবে এ কথা আমি আগে মনেও আন্‌তে পারি নি। তাঁর আদেশ ছিল বাড়ী ছেড়ে এক পা না নড়া, দৈবচক্রে তাও হ'ল। এখন আর আমাকে মায়ায় জড়িয়ে রেখ না মা। ছুটি দাও।"

আনন্দময়ী সাধারণ স্ত্রীলোকের ন্যায় বিবেচনা-শূন্যা ছিলেন না; কন্যার কথার মর্ম্ম তিনি উপলব্ধি করিলেন; তথাপি মাতৃস্নেহসুলভ কারুণ্যে বিগলিতা হইয়া বলিলেন,—"তুই যে ধাতের মেয়ে, তা'তে তোকে আর এখানে আট্‌কে রাখ্‌তে প্রবৃত্তি হয় না; কিন্তু উপায় আর কি আছে বল্? তোর দেওর গিরীনও ত এখনও ফির্‌ল না; কোন খোঁজ খবর কর্‌তে পার্‌লে কি না, তাও জানালে না। সে সেখানে থাক্‌লে কোন কথা ছিল না; এ অবস্থায় কেমন কোরে প্রাণ ধরে তোকে পাঠাতে পারি বল্ দেখি?"

জননীর কাতরোক্তিতে চিরকোমলা দুহিতার করুণ হৃদয় ব্যথিত হইল; অশ্রু-উচ্ছল নয়নে বিষাদ-মথিত হৃদয়ে বলিল,—"মা আর সে জন্যে তুমি ভেব না; গিরীন ঠাকুরপোর খবর আমি পেয়েছি; তাঁর কথাও ঠাকুরপো লিখেছে; সম্প্রতি আমাকে জানিয়েছে যে, বৈদ্যনাথে তাঁর সন্ধান পেয়েছে; তাই আর আমার এখানে থাকা হবে না; আমাকে বাড়ী যেতেই হবে।" বহুদিন মেঘচ্ছায়ামণ্ডিত অন্ধকার নিরানন্দ দিবসের পর সহসা রৌদ্রালোক ফুটিয়া উঠিলে প্রকৃতি যেমন প্রফুল্ল-শ্রী ধারণ করে, হরিহরনাথের সংবাদে তেমনি আনন্দময়ীর গভীর দুঃখ-সন্তপ্ত চিত্ত আকস্মিক হর্ষে চকিত ও আত্মহারা হইয়া উঠিল। তিনি উদ্বেগ-বিস্ময়-জড়িত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন—'কি—কি! হরিহরের খবর পেয়েছিস্? এ কথা আমাকে এতক্ষণ বলিস্ নি কেন? আমি যে তার জন্যে মরে আছি। হরি কি বৈদ্যনাথে এসেছে? তুইও তবে বৈদ্যনাথে যাবি?"

মনোরমা ধীরকণ্ঠে কহিল, "না মা, আমি বাড়ী যাব।"

আনন্দময়ী বিচলিত স্বরে কহিলেন, "সে কি কথা বলিস্ মনু? হরি বৈদ্যনাথে এসেছে, সেখানে না গিয়ে বাড়ী গিয়ে কি কর্‌বি বল্?

মনোরমা কহিল, "না মা তুমি বুঝতে পাচ্চ না, আমার তাঁর ভিটে ভিন্ন অন্য কোথাও যাবার উপায় নেই। তিনি ঘরে ফিরুন আর নাই ফিরুন, তাঁর দেখা পাই বা না পাই, আমাকে ঘরে ফিরে যেতেই হবে; আমার আর কোথাও যাবার হুকুম নেই।'

জননী কন্যার কথায় স্তব্ধ হইয়া রহিলেন; ভাবিলেন, পাহাড় যদিও টলে তবুও তাহাকে তাহার সঙ্কল্প হইতে টলাইতে পারে, এ সাধ্য কাহারও

নাই ; কি অবস্থায় তাহাকে শ্বশুরালয় হইতে লইয়া আসা হইয়াছিল, তাহাও তাঁহার অপরিজ্ঞাত ছিল না। তবে আর বৃথা বাদানুবাদে ফল কি ? তিনি জানিতেন, কত দুঃখতাপ সহ্য করিয়া, সম্পূর্ণ ভোগস্পৃহাশূন্যা ব্রহ্মচারিণীর ন্যায় প্রসন্নমুখে সে এত কাল পিত্রালয়ে বসবাস করিতেছে ; তাহার গৃহ-প্রত্যাবর্ত্তনের বিপুল আগ্রহের জন্য সময় সময় সে তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সুরেন্দ্রের বিরাগভাজন হইয়াছে ; মধ্যে মধ্যে ভর্ৎসনা সহ্য করিয়াছে ; কখনও একটি কথারও উত্তর দেয় নাই ; তাহার আতঙ্ক-ব্যাকুল দৃষ্টিই নীরবে তাহার হৃদয়ের প্রচ্ছন্ন গভীর বেদনা জ্ঞাপন করিয়াছে। জননী ভাবিলেন, ইহাকে ত আর ধরিয়া রাখা যাইবে না, তাই বিষণ্ণ কণ্ঠে কহিলেন, "মনু, তোর কথার ওপর আর কথা কওয়া চলে না। তবে মনে আমার এই দুঃখ থাকল যে এই ছ'বছর এত কষ্ট সয়েও ত বাছা এ পর্য্যন্ত একটা কূল-কিনারা হ'ল না" —মনোরমা অধীর কণ্ঠে জননীর কথায় বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল, 'কূল-কিনারা কিসের মা ? আমি কি তাঁকে হারিয়েছি যে, তাঁকে পাবার কূল-কিনারা করবার জন্যে এরূপ ভাবে জীবন যাপন কচ্ছি ? তিনি আমার চক্ষে আগে যেমন ছিলেন, এখনও ঠিক তেমনি ভাবেই আছেন, একটি মুহূর্ত্তের জন্যেও আমি তাঁকে হারাই নি। সে কথা যেদিন আমার মনে উদয় হবে, সেই মুহূর্ত্ত থেকে মনে ক'রো মা যে, তোমার মেয়েও আর এ পৃথিবীতে নেই ; সে তার স্বামীর সঙ্গে সঙ্গেই হারিয়ে গেছে।" কন্যার কথায় জননী শিহরিয়া উঠিলেন। আর কোন কথা কহিলেন না। কন্যাকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া, তাহার মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া, মনে মনে অজস্র আশীর্ব্বাদ করিয়া তাহার মুখচুম্বন করিলেন।

পরদিন প্রভাতে জননী ও অন্যান্য গুরুজন-গণকে প্রণাম, কনিষ্ঠদিগকে আশীর্ব্বাদ ও শিশু-দিগকে চুম্বন করিয়া, নয়নাশ্রু মুছিতে মুছিতে নিঃশব্দে পুত্রের হস্ত ধরিয়া মনোরমা পিত্রালয় হইতে বিদায় গ্রহণ করিল। এই বিদায়-দৃশ্যে সকলেই ব্যথিত হইল। এমন কি মাসীমাতা মমতাময়ী পর্য্যন্ত অশ্রুরোধ করিতে পারিলেন না ; কালুর ত কথাই নাই !

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

মনোরমা স্বামিগৃহে পৌঁছিয়া প্রথমেই জীর্ণ-ভগ্ন প্রবেশ-দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দেখিল, গৃহ-প্রাঙ্গণ তৃণ-গুল্মে সমাচ্ছন্ন ; গৃহপ্রাচীর নিবিড় শৈবালে ঢাকা ; রোয়াকে উঠিবার সোপানের ইষ্টক খসিয়াছে ; দালানের স্তম্ভগুলি জীর্ণ-কঙ্কাল বাহির করিয়া একটা ম্লান বিবর্ণ বিশুষ্ক হাস্যে তাহাকে যেন সম্ভাষণ করিল। উপরের ঘুলঘুলিতে কপোত-কপোতী বাসা বাঁধিয়াছে ; তাহাকে দেখিবামাত্র ঝট্ পট্ করিয়া সশব্দে উড়িয়া গেল। লক্ষ্মী-নারায়ণের গৃহের কবাট তালাবদ্ধ নাই, কড়াদুটি রজ্জু দিয়া বাঁধা। গো-শালার চাল অর্দ্ধেকটা নাই, ঝড়ে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। ভাঁড়ার ঘরের অর্দ্ধোন্মুক্ত দ্বার খুলিবা মাত্র সে শিহরিয়া দশ পা পিছাইয়া আসিল ; একটা খোলসের পার্শ্বে শায়িত কুণ্ডলীকৃত কৃষ্ণকায় ভুজঙ্গম তাহাকে দেখিবামাত্র সর্ সর্ শব্দে গৃহকোণস্থ বিবরে প্রবিষ্ট হইয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। উঠানের কোণের পুরাতন সেফালী তরুটি জীর্ণ, সোপানের উপর ফুল ছড়াইয়াছে, যেন জরাগ্রস্ত সমাধির আসন্ন তিরোধান ভাবিয়া তাহাকে পুষ্প-সমাচ্ছন্ন করি-তেছে। হায়, এই কি তাহার বুকের রক্ত দিয়া গড়া গৃহশ্রী !

"স্বামী ! প্রভু ! প্রাণেশ্বর !" বলিতে বলিতে উন্মাদিনীর ন্যায় অধিকতর উচ্চৈঃস্বরে বিমলা কহিতে লাগিলেন "আজ আমি জগৎসমীপে বলিব, কে নিবারণ করিবে ? স্বামী ! কণ্ঠহার ! কোথা যাও ? আমাদের কোথা রাখিয়া যাও ?"—দুর্গেশনন্দিনী।

মনোরমা ভয়ার্ত্ত বক্ষে চারিদিকে হতাশ-বিরস দৃষ্টিতে কেবলই চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিল। নলিন দালানের এক পার্শ্বে জিনিসপত্র গুছাইয়া রাখিয়া জননীকে কহিল, "মা তুমি এখানে এসে অমন আন্‌মনা হয়ে গেলে কেন?" মনোরমা কাতরকণ্ঠে বলিল, "বাবা এই কি আমাদের ঘরের দশা! সাধে কি আমি কিছুতেই বাড়ী ছাড়তে চাই নি? তা ঠিকই হয়েচে, ভগবান আমার কর্ম্মের উপযুক্ত প্রতিফলই দিয়াছেন, আমি যেমন চণ্ডালিনী, তেমনি ফলভোগ করতে হবে ত!" নলিন কহিল, "মা দুঃখ ক'রে আর কি হবে, তুমি ঘরবাড়ী যেমন যত্নে রেখেছিলে, তেমন কি আর কেউ রাখ্‌বে আশা কর? তোমার জিনিসে তুমি যেমন যত্ন করবে অপরে তা পারবে কেন? দু'চার মাস তারা দেখ্‌তে পারে, কিন্তু একেবারে ছেড়ে দিলে সবার যে দশা হয়, আমাদেরও তাই হয়েছে; এখন আক্ষেপ করলে চল্‌বে কেন মা?" মনোরমা ধরা গলায় কহিল, "তুই ঠিক্ বলেছিস নলিন, সেখানে থাকাই আমার কাল হয়েছিল, কিন্তু—" নলিন বাধা দিয়া কহিল, "যাক্ সে সব কথা ভেবে আর কি করবে মা, যা হবার তা ত হয়েই গেছে। এখন এখানকার যা কিছু বিলি-ব্যবস্থা সব ত তোমাকেই করতে হবে।" মনোরমা ক্ষণকাল চুপ করিয়া শান্তস্বরে কহিল, "নলিন যে লোকটি আমাদের সঙ্গে এসেছে, তুই তাকে নিয়ে একবার তোর গিরীন কাকার বাড়ী যা ত; পাশেই তাঁর বাড়ী; তোর ঠাকুর-মাকে খবর দিয়ে আয় যে, আমরা ফিরে এসেছি।"

নলিন চলিয়া গেল; কিছুক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া ম্লানমুখে কহিল, "বাড়ীতে ত কেউ নেই মা, একজন বুড়ী ঝি দরদালানে শুয়েছিল, আমাকে দেখেই বল্‌লে কোত্থেকে আসছ বাবা, কাকে খুঁজছ,
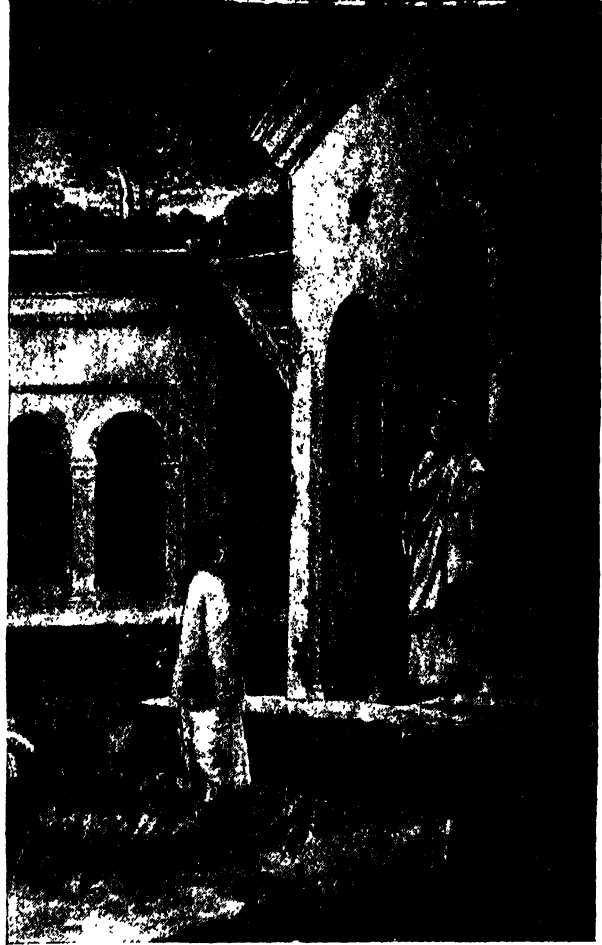
মা তুমি এখানে এসে অমন আন্‌মনা হয়ে গেলে কেন?

বাড়ীতে ত তাঁদের কেউ নেই।" আমি বল্লুম,—"পাশেই আমাদের বাড়ী, আমরা মুর্শিদাবাদ থেকে আসচি।" বুড়ী শুনেই কেমন হক্‌চকিয়ে গেল, বল্লে, "চল আমি যাচ্চি, দেখি গিয়ে কে এসেচে।" বলিতে বলিতে বৃদ্ধা ক্ষেমা আসিয়া উপস্থিত হইল।

মনোরমাকে দেখিবামাত্রই সে অধীর হইয়া 'মা মা' বলিয়া চীৎকার করিয়া তাহার পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া বলিল, "এতক্ষণে বুঝলুম মা, তোমার সোনার ছেলেটি আমায় ডাকতে গেছল, আহা বেঁচে থাক্, আমার চারগুণ বয়স পাক্। এতকাল কি এমন ক'রে আমাদের ভুলে থাকতে হয়? আহা তোমার সোনার সংসারের কি দশা হয়েচে দেখ মা!"

ক্ষেমা স্বপ্নেও ভাবে নাই তাহার কর্ত্রীঠাকুরাণী এমন হঠাৎ আসিয়া উপস্থিত হইবেন; তাই সে নিজেকে আর কোন মতেই সামলাইতে পারিতে ছিল না। তার কথার উপর কথা, হা-হুতাশ, চোখ-মোছা প্রভৃতি ব্যাপারে মনোরমাকে বিব্রত করিয়া তুলিল। অনেক চেষ্টায় তাহাকে থামাইয়া মনোরমা উৎকণ্ঠাকুলচিত্তে সংশয়-জড়িত-স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁ ক্ষেমা! কাকীমা" বলিতে বলিতে তাহার স্বর রুদ্ধ হইবার উপক্রম করিল। গৃহিণীর মুখের বিবর্ণতা দেখিয়া তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে চতুরা ক্ষেমার বাকি রহিল না, সে তখনই সহজ-স্বরে কহিল,—"তুমি কি ভেবে নিয়েছ মা, তেনারা ভালই আছে।" মনোরমার সংশয়-তাপে ঝলসিত প্রাণ যেন সাঁঝের ঠাণ্ডা বাতাস লাগিয়া জুড়াইয়া গেল। সে তাহর কথায় বাধা দিয়া বলিল, "আমায় বাঁচালি ক্ষেমা, তোর কথায় ধড়ে প্রাণ এল। ছেলে এসে যখন বল্লে, "বাড়ীতে কেউই 'নেই, তখনি আমার বুক ধড়াস ক'রে কেঁপে উঠ্‌ল, কিছুই বলতে পাল্লুম না; তার পর সঙ্গে সঙ্গে তুই এসে পড়লি; হ্যাঁ ক্ষেমা, তাঁরা কোথায় গেছেন রে?"

ক্ষেমা কহিল, "আজ দিন তিনেক হ'ল, তোমার কাকী ছোটবাবুকে নিয়ে তারকেশ্বরে গেছে, অনেক দিন তেনার বড় ছেলের চিঠি না পেয়ে বাবার মানত করেছিল, হালে চিঠি এয়েচে, তাই পূজো দিতে গেছে। হয় তো কালই তেনারা ফিরে আসবে। তোমার কথা ভেবে ভেবে আমার গতর ভেঙ্গে গেল, চোখের মাথাও খেয়েচি, রাতকাণা হয়ে গেছি, কোথাও নড়তে চড়তে আর পারি নে, তাই ওনাদের দুয়োর ধরে পড়ে আছি।"

মনোরমা ধীরকণ্ঠে বলিল, "তা ভালই করেছিস, আমাদের ছেড়ে আর তুই কোথায় থাকতে পারবি?"

সহসা যেমন বর্ষার ক্ষিপ্ত বাতাসে অনন্যাশ্রয়া বেতসীলতা দুলিয়া উঠে, তেমনি একটা কথা জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বেই মনোরমার বুকের ভিতরটা কাঁপিয়া উঠিল। সে অসহিষ্ণুভাবে আবেগ-কম্পিত-কণ্ঠে গভীর ঔৎসুক্যের সহিত জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁ রে ক্ষেমা! ঠাকুর-সেবাটি ত বন্ধ হয় নি? সেটি আমার চল্‌চে ত রে! সাঁজের পিদিম ও ঘরটিতে খানিকক্ষণ জ্বলে ত? সেটুকুও তোরা বজায় রাখতে পেরেছিস্ কি?" ইহাই তাহার অন্তরের অন্তরতম প্রদেশের প্রচ্ছন্ন উদ্বেগ! ইহারই চিন্তায় উদ্বেলিত আবেগে অধীরা হইয়া বৎসরের পর বৎসর কত বিনিদ্র রজনী সে যাপন করিয়াছে। ক্ষেমা ক্ষণকাল স্তব্ধ থাকিয়া জড়িতস্বরে কহিল,—"মা অছেদ্দায় দেবতাও বুঝি সদয় থাকেন না, সেবাটি কোন রকমে কায়ক্লেশে চল্‌ছে বটে; তা সে না চলারই মধ্যে।"

বৈশাখী অপরাহ্ণে নৌকাযাত্রী সহসা আকাশে বিদ্যুৎস্ফুরণ দেখিলে যেমন চমকিয়া উঠে, ক্ষেমার কথায় মনোরমা তেমনি উদ্বিগ্ন হইয়া ভয়-চকিত স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "ঠাকুর মশাই কোথায় গেলেন ক্ষেমা, তাঁরই ভরসায় এতদিন আমি মনে মনে আশ্বস্ত হয়ে ছিলুম; তিনি থাকতে আমার এমন সাজান ঘর ভেঙ্গে গেল!" বলিতে বলিতে তাহার

কণ্ঠ রুদ্ধ হইল; ক্ষণপরে আত্মস্থ হইয়া কহিল, "এখন সেবা কে কচ্ছেন ক্ষেমা?"

ক্ষেমা দুঃখের সহিত বলিল, "আহা মা, তেনার কথা তুল না, তিনি বেঁচে মরে আছেন; তিনি ভাল থাকলে তোমার লক্ষ্মীর ভাঁড়ার তেমনি বজায় থাকত। আজ তিন বছর থেকে তেনা মেলেরি জ্বরে সরু সল্‌তেটি হয়ে পড়ে আছেন; তেনার এক ভাগ্নে, ঐ যে কি নাম তার, আঃ দূর কর ছাই, পোড়া মনেও আসে না—হাঁ হাঁ ওই বাঞ্ছারাম ঠাকুর,—হতচ্ছাড়া বামুন মিন্সে, সকাল-সাঁজে দায় ঠেলার মত এক একবার এসে জল-তুলসী ঠেকিয়েই ছুটে পালায়—মিন্সেকে যেন বিচেয় কামড়াচ্চে—মা গো কি বল্‌ব তোমায়, একদণ্ডও বস্‌তে তর সয় না—এমনি তাড়াতাড়ি—হাঁক্‌পাকুনি!"

মনোরমা তাহার কথায় বাধা দিয়া কহিল,—"ছি ক্ষেমা, বামুন-সজ্জনকে অমন ক'রে বল্‌তে নেই, হাজার হোক্ তিনি পুরুত মানুষ।'

ক্ষেমা উত্তেজিত স্বরে কহিল, "তুমি বকুনি মা ঠাকরুণ, তেনার রকম-সকমে পিত্তি জ্বলে যায়; হক্ গে বামুন,—বামুন হয়ে—"

মনোরমা দৃঢ়কণ্ঠে বাধা দিয়া কহিল, "থাম্ বল্‌চি ক্ষেমা, তাঁর নিন্দে আমি শুন্‌তে চাই নি; তাঁর সম্বন্ধে কোন কথা আমাকে বলিস্ নি; তিনি আছেন ব'লে দুটো ফুল গঙ্গাজল ঠাকুরের অঙ্গে পড়্‌চে, এখন আমি সেইটেই পরম ভাগ্যি বলে মান্‌চি, তিনি না থাক্‌লে কি দশা হত বল্ দিকি।"

ক্ষেমা আর উত্তর করিতে ভরসা করিল না। চুপটি করিয়া থাকিল। মনোরমা দীর্ঘশ্বাস চাপিয়া বেদনা-ব্যথিত কণ্ঠে কহিল, "ক্ষেমা তোরা আমার এত সাধের তুলসীগাছটিও রক্ষা করতে পারিস্ নি, তার শিকড়টি যে আমার বুকের মধ্যে জড়িয়ে ছিল; সেটিও কসাইয়ের মত উপড়ে ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছিস্।"

ক্ষেমা কাঁদ কাঁদ মুখে বলিল, "আহা, মা, সে কথাটি বলো না, ঠাকুর মশাই নিজে গাছটিকে বড়ই যত্ন করতেন; এই হতচ্ছাড়া—"

মনোরমা বাধা দিয়া কহিল, "আবার সেই কথা! যা জিজ্ঞেস্ করচি তারই জবাব দে, তাঁর কথা তুলিস্ কেন? এই না তোকে তাঁর কথা কইতে বারণ ক'রে দিলুম।"

ক্ষেমা কহিল, "ঠাকুরমশাই অসুখে পড়ে আস্‌তে না পারায়, আর কেউ গাছটিকে দেখ্‌লে না।"

মনোরমা উত্তেজিত ভাবে কহিল, "তুই কি মরিছিলি, সকাল সন্ধ্যে দু'ঘটি জল দিয়ে যেতে পারিস্ নি।"

ক্ষেমা ক্ষুব্ধস্বরে কহিল, "আহা মা, আমি মরেছিলুমই সত্যি, বাতে পঙ্গু হয়ে দু'টি বছর বিছানা ছাড়ি নি; কবরেজ মশাই ওষুধপত্তর দিয়ে কত কষ্টে যমকে তাড়ালে, আমি কি আর আমাতে ছিলুম মা! দেখ্‌চ না আমার গতরের দশা! আমি ভাল থাক্‌লে কি আর তোমার ঘরের এমন হেনস্তা হ'ত!"

মনোরমা একটু নীরব থাকিয়া বলিল, "তুই কাল থেকেই জন খাটাবার বন্দোবস্ত কর্। সন্ধ্যের পরে ঠাকুরের শীতল দেওয়া হয়ে গেলে আমি বাঞ্ছারাম ঠাকুরের সঙ্গে গিয়ে ঠাকুর মশাইকে দেখে আসব। আজ রাত্তিরটা ও বাড়ীতেই থাক্‌তে হবে। ভাঁড়ার ঘরে সাপের আড্ডা হয়েছে, কালই সমস্ত সাফ্ শুধরো করে ফেল্‌তে হবে। তুই নলিনকে নিয়ে ও বাড়ী যা; পুরুতঠাকুর এলেই কাজ শেষ করে আমিও যাচ্ছি।"

তখন শরতের স্নিগ্ধ প্রশান্ত সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিয়াছে। চিত্তহারী ফুলের সুবাস মৃদুমন্দ সমীর বহিয়া আনিতেছে। গ্রামে কোন কোন দেবালয়ে আরতির কাঁসর-ঘণ্টা-ধ্বনি উত্থিত হইতেছে।

মনোরমা দেবগৃহের রুদ্ধদ্বারপ্রান্তে বসিয়া দেবতার উদ্দেশে কাতর-হৃদয়ে মনে মনে কতই আত্ম-ব্যথা নিবেদন করিল। পূর্ব্ব-স্মৃতি স্তরে স্তরে তাহার হৃদয় ছাইয়া ফেলিতে লাগিল। বকুল-সেফালী-আস্তীর্ণ তরুতলের ন্যায় হরিহর-নাথের পুণ্য-স্মৃতি তাহার হৃদয়-ভূমি সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল! এ যে তাহারই স্বামীর বাস-নিকেতন, এ যে তাঁহারই পিতৃপুরুষের প্রতিষ্ঠিত দেবমন্দির; এ যে তাঁহারই বিরাম-কুঞ্জ; তাঁহারই স্বদেশ-নিবাস—ইহার প্রত্যেক অণুপরমাণুতে তাঁহাব জীবনের সমস্ত সুখ ও তৃপ্তি বিজড়িত রহিয়াছে। আজ তিনি কোথায়?—তাঁহারই গৃহপুষ্পরূপিণী দয়িতা একাকিনী তাঁহারই উদ্দেশে তাঁহারই আদেশ পালন করিয়া রমণী-জীবনের পুণ্য-ব্রত উদ্‌যাপন করিতে আসিয়াছে; তিনি ত তাহাকে একাকিনী রাখিয়া গিয়াছেন। সে অবলা, অসহায়া, সে কি সেই মহা-সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবে? কে তাহাকে পথ দেখাইবে? কে তাহার সহায় হইবে? কে তাহার বিধি-নিয়মের নিয়ামক হইবে? কে যেন সহসা তাহার প্রাণের কবাটে আঘাত কবিয়া বলিল, যিনি প্রত্যেক নিয়মের নিয়ামক তিনিই নিয়ামক হইবেন। মনোরমা কাঁপিয়া উঠিল; বহুক্ষণ নীরবে দেবতার দ্বারপ্রান্তে বসিয়া বসিয়া ভাবিতে ভাবিতে হরিহরনাথে তাহার চিত্ত তন্ময় হইয়া মিশিয়া গেল। তাহার পিত্রালয়ে অবস্থান-কালে একটি মর্ম্মস্পর্শী কবিতা তাহার স্বামীর উদ্দেশে অহরহঃ তাহার হৃদয়-কন্দরে ঝঙ্কার দিয়া উঠিত—আজ এই নিভৃত-নীরব গৃহে নিস্তব্ধ সন্ধ্যায় সেই কবিতাটি সেই সুরেই তাহার প্রাণে বাজিয়া উঠিল,—

"জনম জনম আমি, তোমায় হেরিনু স্বামী,
আঁখি না জুড়াল!
লাখ লাখ যুগে যুগে, বঁধু হে ধরিনু বুকে,
আকুলি ব্যাকুলি মোর তবু না ফুরাল!—

জনম জনম আমি, জান হে অন্তরযামী,
করিলাম মান!
তোমার দর্শন পাই', মান, রোষ ভুলে যাই,
হে নাথ, তোমার প্রেমে নাহি অকল্যাণ!

জনম জনম আমি, তোমারেই পাই স্বামী,
এই দাও বর!
হে বঁধু যে কাজ কর, তাই হয় মনোহর,
হে বঁধু যে সাজ ধর, তাহাই সুন্দর!

জনম জনম আমি, পেয়েছি হৃদয়-স্বামী,
কতই যাতনা!
সুখ দাও সেও ভাল, দুঃখ দাও তাও ভাল,
আমার স্বভাব শুধু ও পদ-বাসনা!

জনম জনম আমি, করি গো হৃদয়-স্বামী,
এই সে কামনা,—
আমি থাকি ক্রোড়ে ধবি, সর্ব্বসাধ পরিহরি,
আমি হেরি ওই মুখ হইয়ে মগনা!

জনম জনম আমি, চাহি না হৃদয়-স্বামী,
কোন পুরস্কার!
দূর হোক্ ভুল ভ্রান্তি, হেরি' ও দেবতা-কান্তি,
তুমিই প্রাণের শান্তি—সর্ব্বস্ব আমার!"

মনোরমার কোমল-বক্ষ চক্ষের জলে ভাসিয়া গেল, অঞ্চলে তাহা মুছিতে যাইবে, এমন সময় দ্বার হইতে উচ্চকণ্ঠে কে ডাকিয়া কহিল, "কে ওখানে বসে গা?"

তাঁহার গলার আওয়াজেই মনোরমা বুঝিল যে, পূজারী মহাশয় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ; মনোরমা উঠিয়াই গলবস্ত্র হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। বাঞ্ছারাম বিস্মিত হইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন; 'তুমি কে গা? কি জন্য এখানে এমন সময় বসিয়া আছ?" মনোরমা ধীর-স্বরে কহিল, 'ক্ষেমা কি আপনার কাছে যায় নি? আমি ত তাকে সব কথা বলে দিয়াছিলাম।' বাঞ্ছারাম কহিলেন,—'কই? তার সঙ্গে ত আমার দেখা হয় নি, আমি বৈকালেই বাড়ী থেকে বেরিয়েছি, কাজ সারতে সারতে এখানে আসচি; তুমি কোথা থেকে এলে, আর এই রাত্রে এই পোড়ো বাড়ীতে একলা কি জন্য? বিশেষ দেখচি তুমি স্ত্রীলোক, তোমার এখানে প্রয়োজন? ক্ষেমাকে তুমি কি বল্‌তে বলেছিলে?" মনোরমা ধীরে কহিল, 'বলেছিলুম যে এখানকার কাজ সারবার পর, আপনি আমাকে ঠাকুর মশাইএর কাছে নিয়ে যাবেন? আরতির পর আমি আপনার সঙ্গে তাঁর নিকটে যাব।' বাঞ্ছারাম বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "ঠাকুর মশাই! কে মামা? তিনি ত এ বাড়ীর কুলগুরু! মামাকে তোমার প্রয়োজন?' মনোরমা স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিল, "তাঁকেই আমার বিশেষ প্রয়োজন?" বাঞ্ছারাম কহিলেন, "প্রয়োজনটি আমি শুন্‌তে পাই না।" মনোরমা কহিল, "আপনি ত সেখানে থাক্‌বেন, সব কথাই জান্‌বেন, তখন আর আরতির দেরি করে লাভ কি? রাত হয়ে গেছে।" বাঞ্ছারাম ঈষদ্ রুক্ষ-স্বরে কহিলেন,—'তোমার পরিচয় না পেলে, আমি কেমন কোরে তোমায় সেখানে নিয়ে যেতে পারি? তুমি কে, কি বৃত্তান্ত আগে শুনি; আর তাই বা তোমার বল্‌তে আপত্তি কি?' বাঞ্ছারাম ঠাকুরের কথাবার্ত্তার ভঙ্গী ও ধরণ-ধারণে প্রথম হইতেই মনোরমা বিরক্তি বোধ করিয়াছিল। কথাগুলা কেমন চড়া চড়া, নীরস ও ভদ্রতাবিরহিত। অপরিচিতা ভদ্র-কুল-কামিনীর মর্য্যাদা ও সম্ভ্রম রক্ষা করিয়া তাহার সহিত যেরূপ ধীরতা ও বিনয়ের স্বরে কথোপকথন করিতে হয়, বাঞ্ছারামের কোষ্ঠী-পত্রে তাহার এতটুকু রেখাপাত করিতে বিধাতা-পুরুষের একদম ভুল হইয়া গিয়াছিল।

বাঞ্ছারামের সামান্য একটু পরিচয় দিলে বোধ হয় পাঠক-পাঠিকার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিবে না। তাঁহার বয়স যখন ষোল বৎসর তখন তাঁহার পিতামাতা বিগত হন। একটা অজ পাড়াগাঁয়ে তাঁহার জন্ম হয়; ছেলেবেলা থেকেই পরের পুকুরে মাছধরা, পরের বাগানের ফল-পাকড় লোপাট করা, দুপুর বেলায় পাঁচিলে উঠে অন্যের দাওয়ায় ঢিল ছোঁড়া প্রভৃতি কার্য্য এবং গ্রাম্য পূজাপার্ব্বণে প্রসাদ কাড়াকাড়ি করিয়া তাঁহার সুখের বাল্যজীবন অতিবাহিত হইয়াছিল। যৌবন অতীত হইলে তিনি অনন্যোপায় হইয়া সোমড়ায় মাতুলের নিকট আগমন করেন। তাঁহার মাতুল অতিকষ্টে নিত্য-কর্ম্ম-পদ্ধতির কতকগুলি নিতান্ত প্রয়োজনীয় বিষয় তাঁহার গলাধঃকরণ করাইয়া শালগ্রামের নিত্যপূজা, গঙ্গাপূজা, গণেশপূজা, ষষ্ঠীপূজা, মনসাপূজা, ইতু-পূজা, সুবচনীপূজা, ঘেটেরাপূজা, ঘেঁটুপূজা, সত্য-নারায়ণ, শিব-চতুর্দ্দশী, সাবিত্রী চতুর্দ্দশী, অনন্ত চতুর্দ্দশী, অশোক ষষ্ঠী, মাকাল ষষ্ঠী, দূর্ব্বাষ্টমী, অক্ষয়তৃতীয়া প্রভৃতি পূজা ও বারব্রতাদি কাজ চালাইবার মত শিখাইয়া দিয়াছিলেন। সেই শিক্ষার ফলে এবং মাতুলের অনুগ্রহে তিনি গ্রাম্য-পুরোহিতের কার্য্যে ব্রতী ছিলেন। কিন্তু তাঁহার রুক্ষ স্বভাবের পরিবর্ত্তন ঘটে নাই; বরং সেটা মিশির কালো দাগের মতন সনাতন হইয়াছিল।

বাঞ্ছারামের উপরিউক্ত কথা শুনিয়া মনোরমা একটু তীব্রকণ্ঠে জবাব দিল,—'আমার পরিচয় না পেলে যদি আপনি আমাকে নিয়ে যেতে অসম্মত হ'ন ত আমি আপনার সঙ্গে যেতেই চাইনি। আর ভদ্র-মহিলার পরিচয়ের জন্য আপনি এত ব্যস্ত কেন? একটু পরে ত সবই জানতে পারতেন।' বাঞ্ছারামও মনে মনে চটিলেন। কে এ অপরিচিতা, তাঁহার মুখের উপর এমন সজোরে প্রত্যুত্তর করিল? তিনি একটু স্তম্ভিত হইলেন বটে কিন্তু স্বভাবের ধর্ম্ম কোথায় যাইবে। তিনি বিরক্তির স্বরে কহিলেন, "আমাকে এখনও তিনচার জায়গায় ঘুরে যেতে হবে, আমি রাত্রে এক অজানা অচেনা স্ত্রীলোককে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারবো না; কোথাকার কে তার ঠিকানা নেই, ভাল আপদে পড়লুম দেখচি।' তিনি প্রদীপ জালিয়া ঠাকুর ঘরের দরজার কড়ার দড়ীটা টানিয়া খুলিয়া ফেলিলেন; দ্বার খুলিবা মাত্রই চারি পাঁচটা চর্ম্মচটিকা বাদুড় পটাপট শব্দে তাঁহার মাথার উপর দিয়া উড়িয়া বাহির হইয়া গেল। সে শব্দে মনোরমা শিহরিয়া উঠিল।

প্রজ্জলিত দীপ-রশ্মির আলোকে মনোরমাকে দেখিবামাত্র বাঞ্ছারামের চক্ষু ঝলসিয়া গেল, তাহার সেই পথশ্রম-পরিক্লান্ত নিদাঘ-অপরাহ্নের নলিনীনিভ মুখকান্তি, যোগিনীজটাবৎ আলুলায়িত কেশরাশি, বিলোল নয়ন-দীপ্তি দেখিয়া বাঞ্ছারাম নির্ব্বাক বিস্ময়ে বিমোহিত হইয়া গেলেন। শুভ্রোজ্জল হীরকখণ্ডে রশ্মিসম্পাতের ন্যায় তাহার রূপরাশির চন্দ্রিকাছটা চতুর্দ্দিকে ঠিকরাইয়া পড়িতে লাগিল। যখন সেই বিদ্যুৎ-রূপিণী, শুদ্ধশরীরা দেবীকল্পা রমণী দেবতাকে প্রণিপাত করিয়া অশ্রুবাহিত নয়নে উঠিয়া দাঁড়াইল, তখন বাঞ্ছারাম আর নীরবে থাকিতে পারিলেন না। শ্রদ্ধায় ও ভক্তিতে অভিভূত হইয়া অশ্রুপূর্ণনেত্রে প্রীতিগদগদকণ্ঠে কহিলেন,—'আর পরিচয় দিতে হবে না মা! চিনেছি! চলুন, মামার নিকটে আপনাকে আমি নিয়ে যাচ্ছি।'

আরতি শেষ হইয়া গেল। পুরোহিত দেবদ্বার রুদ্ধ করিয়া বহির্গত হইলেন। মনোরমাও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল।

(ক্রমশঃ)

গল্প

নারীর মূল্য

শ্রীমতী সুবাসিনীবালা বসু

সে দিন একে গুমট্ গরম, তাহার উপর আবার আমার শরীরটা ভাল ছিল না। সন্ধ্যা হইবার একটু আগেই বেড়াইতে বাহির হইলাম। মনে করিলাম, ঠাণ্ডা বাতাসে হয় ত শরীরটা ভাল হইবে। চলিতে চলিতে কৈসরবাগে উপস্থিত হইলাম। পার্কে অনেক লোক। এত লোকের মধ্যে আমার কেমন যেন অস্বস্তি বোধ হইতে লাগিল। আমি ধীরে ধীরে সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই পার্কের পাশে 'হৌজে'র ধারে পৌঁছিলাম। হৌজ বা জলাধারের চারি ধার বহুমূল্য প্রস্তর দিয়া বাঁধানো। উহার স্ফটিক-জলে লাল হলদে নানা-রঙ্গের মাছ খেলিয়া বেড়াইতেছে।

আমি শুনিয়াছিলাম, লক্ষ্ণৌয়ের কোনও নবাব তাঁহার তিন শত পঁয়ষট্টি বেগম লইয়া এই 'হৌজে' জলক্রীড়া করিতেন। তখন না কি এই 'হৌজ' প্রত্যহ গোলাপজলে পূর্ণ করা হইত। আমি আরও শুনিয়াছিলাম যে, নবাব না কি বেগমগণকে 'হৌজে'র এক পার্শ্বে দাঁড় করাইয়া বলিতেন,—যিনি সর্ব্ব প্রথমে তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারিবেন, তাঁহার কক্ষে তিনি সে দিন রাত্রিযাপন করিবেন। এই বলিয়া তিনি জোরে জোরে তাঁহার ক্ষুদ্র পানসি খানি বাহিতেন। বেগমগণের মধ্যে হুড়াহুড়ি পড়িয়া যাইত—কে নবাবকে আগে ছুঁইতে পারে। তাঁহাদের হস্ত সঞ্চালনে জলরাশি নাচিয়া নাচিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিত। যিনি সর্ব্ব প্রথমে নবাবকে স্পর্শ করিতে পারতেন, তিনি সেদিনকার মত প্রধানা বেগম বলিয়া গণ্য হইতেন। নবাব সেই বিজয়িনীকে সঙ্গে লইয়া সম্মুখের বিশাল প্রাসাদে প্রবেশ করিতেন। অন্যান্য বেগমও নতমস্তকে নবাবের অনুসরণ করিতেন। পরে নৃত্য-গীত উপ-ভোগ করিয়া নবাব বিজয়িনীর সঙ্গে তাহার কক্ষে গমন করিতেন ও সেখানে নিশা-যাপন করিতেন।

হৌজের ধার হইতে উঠিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলাম। পার্কের পাশে প্রায় দশ হাত চওড়া একটি রাস্তা আছে। রাস্তা হইতে প্রায় ১৩।১৪ হাত দূরে তিনটি কবর; একটি লক্ষ্ণৌয়ের নবাবের, অপরটি তাঁর বেগমের, আর মধ্যের ক্ষুদ্র কবরটি বোধ হয় তাঁহাদের শিশু পুত্রের। কবরের উপর স্মৃতি মন্দিরের গুম্বজ আকাশ চুম্বন করিয়াছে। এই স্থানটি বেশ নির্জ্জন। এখানে প্রায় কেহ আসে না। আমি কবরের পাশে একটু উচ্চ স্থান দেখিয়া ঘাসের উপর শুইয়া পড়িলাম।

হঠাৎ আমি যেন শুনিতে পাইলাম—কোনও রমণী অব্যক্ত যন্ত্রণায় গুমরিয়া গুমরিয়া কাঁদিতেছে। সেই রোদনশব্দে আমার হৃদয় আকুল হইয়া উঠিল। আমি উঠিয়া বসিলাম। তার পর ধীরে ধীরে সেই শব্দ অনুসরণ করিয়া চলিতে লাগিলাম। 'হৌজে'র কাছে আসিয়া দেখিলাম,—এক পরম সুন্দরী তরুণী 'হৌজে'র সোপানে বসিয়া, জলে পা ডুবাইয়া হাতে মাথা রাখিয়া কাঁদিতেছে। তাহার ঘন-কৃষ্ণকুঞ্চিত কেশরাশি বাতাসে উড়িতেছিল। আমি অদি

নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলাম। কতক্ষণ দাঁড়াইয়া ছিলাম বলিতে পারি না! তরুণী চোখ মুছিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার ভাব দেখিয়া মনে হইল সে ভীত হইয়াছে। আমি তাহাকে আশ্বাস দিয়া বলিলাম, "তোমার কোনও ভয় নাই। আমার দ্বারা তোমার কোনও অনিষ্ট হইবে না। আমি কেবল জানিতে চাই, তুমি কেন এই নির্জ্জন রাত্রিতে একাকিনী এখানে বসিয়া কাঁদিতেছ?"

তরুণী আশ্বস্ত হইয়া তখন সোপান বাহিয়া উপরে উঠিল। আমাকে ইঙ্গিতে তাহার অনুসরণ করিতে বলিল। আমিও অনুসরণ করিলাম। সে ধীরে ধীরে একটি প্রাসাদের নিকট উপস্থিত হইল। প্রহরী অভিবাদন করিয়া সরিয়া দাঁড়াইল। আমি তাহার সহিত সেই বিশাল প্রাসাদের ছাদে গিয়া উঠিলাম। তখন সেই তরুণী বীণাবিনিন্দিতকণ্ঠে বলিল,—"আমি কেন কাঁদছিলাম তুমি জানতে চাও? কিন্তু তার আগে আমি কে—তার একটু পরিচয় দেওয়া উচিত।"

২

তরুণী কিছুক্ষণ আলিসা ধরিয়া বহুদূরে তাহার দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ক্রমে ক্রমে তাহার চক্ষু সজল হইয়া উঠিল। ওড়নার প্রান্তে চোখ মুছিয়া দূরে অঙ্গুলি সঙ্কেত করিয়া সে বলিল, "দেখ।"

আমি দেখিলাম,—বহুদিনের পুরাতন একটা এক তালা বাড়ী। আমি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলাম। আলিসার যে স্থান খানিকটা উঁচু ছিল, ঠিক তাহারই নীচে একটি গালিচা পাতা ছিল। তরুণী সঙ্কেতে আমাকে সেই গালিচার উপর বসিতে বলিল এবং নিজেও তাহার এক প্রান্তে বসিয়া বলিতে আরম্ভ করিল—

তুমি আমাকে যে বেশে দেখছো আমি ঠিক তা নই। আমি হিন্দুনারী; ঐ যে ভাঙ্গা বাড়ীটা এই মাত্র দেখলে, ওঠা ছিল আমাদের বাড়ী! দশ বৎসর বয়সে, বৌ হয়ে এসেছিলাম ঐ বাড়ীতে। আমার শ্বশুরশাশুড়ী আমাকে প্রাণের অধিক ভাল বাসতেন। আমার শ্বশুরেরা পূজারী ব্রাহ্মণ ছিলেন। যজমানের নিকট থেকে যা পেতেন, তাতে আমাদের ভালই চল্‌ত।

আমাদের বিবাহ হবার পর শ্বশুরমশাই আমার স্বামীকে ক্রিয়া-কর্ম্মে সঙ্গে নিয়ে যেতে লাগলেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল যে, পুত্রকে ভাল করে কাজ-কর্ম্ম শিখিয়ে নিজে কোন তীর্থস্থানে গিয়ে বাস করবেন। দু'বৎসরের মধ্যেই আমার স্বামী প্রায় কাজকর্ম্ম এক রকম শিখে ফেল্‌লেন। তখন তিনি আমার স্বামীর হাতে কাজকর্ম্ম ছেড়ে দিয়ে ঈশ্বর আরাধনায় ব্রতী হলেন। আমার শাশুড়ীও ঘরকন্নার সমস্ত ভার আমার উপর ছেড়ে দিলেন। তাঁরা দু'জনে প্রাতঃকালে গোমতী-স্নান ও পূজার্চ্চনা নিয়ে থাকতেন। আমার দেবর সংসারের কোন বিষয়ে থাকতো না। সে কেবল আপন মনে কুস্তি লড়ে বেড়াতো। মাত্র আহার করবার সময় গৃহে আসতো। কুড়ি বৎসর বয়সে সে লক্ষ্ণৌয়ের বিখ্যাত পলোয়ান হয়েছিল।

একদিন শাশুড়ীঠাকরুণ আমাকে বল্‌লেন মা, কর্ত্তা ঠিক করেছেন যে আমরা এই বৃহস্পতিবারে তীর্থ যাত্রা করবো।

আমি কেঁদে তাঁর পা জড়িয়ে ধরে বল-লাম, মা আমি তোমাকে ছেড়ে কেমন করে থাকবো?

শাশুড়ী আমার গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে বল্‌লেন, ভয় কি মা! এখন তো তুমি কাজকর্ম্ম এক রকম শিখে নিয়েছ, ছেলেরাও বেশ বড় হয়ে

উঠেছে। এখন আমরা একটু তীর্থ-ধর্ম করিগে। এতে মা আর অমত করো না।

আমি আর কিছু বলতে পারলাম না।

সে রাত্রে আমার মোটেই নিদ্রা হল না। কেবল মনে হতে লাগলো, শাশুড়ী ঠাকরুণ চলে গেলে, আমি একলা এ বাড়ীতে কেমন করে থাকবো ?

সেদিন সকাল সকাল উঠে গৃহের কাজকর্ম্ম করতে লাগলাম। কিছুক্ষণ পরে আমার শাশুড়ী ঠাকরুণ নিজের কক্ষের দ্বার খুলে বাইরে এসে আমাকে দেখে বললেন,—কি মা এত সকালে উঠেছ যে ? মুখ এত শুকনো কেন—পাগলী মেয়ে আমার ?

আমি তাঁর পায়ের কাছে ভূমিতে মাথা পেতে প্রণাম করে তাঁর পায়ের ধূলা নিলাম। কিছুক্ষণ পরে আমার শ্বশুর-শাশুড়ী স্নান করতে বার হচ্ছিলেন। আমি শাশুড়ী-ঠাকরুণকে বললাম, মা আমিও আজ তোমাদের সঙ্গে স্নান করতে যাবো। আমার শাশুড়ী-ঠাকরুণ বললেন, বেশ তো,—চল না মা। শ্বশুরমশাই হাসতে লাগলেন।

আমরা যখন স্নান শেষ করে ফিরছিলাম, তখনো ভাল করে উষার আলোক ফুটে ওঠে নি। পথ প্রায় জন-মানবশূন্য। শ্বশুরমশাই স্তোত্র আবৃত্তি করতে করতে আগে আগে চলেছেন, আমি ও শাশুড়ী-ঠাকরুণ পাশাপাশি হয়ে তাঁর পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলেছি। হঠাৎ ঘোড়ার খুরের শব্দে আমরা চমকিত হলাম। মুহূর্ত্তমধ্যে একজন অশ্বারোহী বিদ্যুৎবেগে আমাদের সমুখে উপস্থিত হলেন। আমি তাড়াতাড়ি ঘোমটা টেনে দিলাম। ঘোড়াটি বোধ হয় আমাদেরকে পথের মাঝে দেখে ভীত হল। সে তার পিছনের দুপায়ে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ালো। আরোহী নিমেষে ভূতলে লাফিয়ে পড়লেন। ঘোড়াটা ছাড়া পেয়ে তীরবেগে আমার পাশ দিয়ে ছুটে পালালো।

লোকটি ক্রুদ্ধ হয়ে আমার শ্বশুরমশাইকে হাতের চাবুক দিয়ে মারতে উঠলেন। তিনি করযোড়ে তাঁর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করলেন। আমি ভীত হয়ে চীৎকার করে কেঁদে উঠলাম। লোকটা আমার ক্রন্দন-শব্দে আকৃষ্ট হয়ে ফিরে দেখলেন ও চাবুক নামিয়ে নিলেন। শ্বশুরমশাই তাঁকে আশীর্ব্বাদ ক'রে অগ্রসর হলেন। আমরা যখন গৃহে প্রবেশ করছিলাম,—দেখলাম সেই লোকটা আমাদের নিকট থেকে কিছু দূরে দাঁড়িয়ে আমার দিকে চেয়ে আছে। গৃহে প্রবেশ ক'রে শ্বশুরমশাই বললেন—উনি নবাব।

৩

দুপুর বেলা আহারাদি হয়ে গেছে। শাশুড়ী-ঠাকরুণ বৃন্দাবন যাবেন ব'লে পাড়ায় বিদায় আনতে গেছেন। শ্বশুরমশাই আপনার ঘরে নিদ্রা যাচ্ছেন। আমি রামায়ণ পাঠ করছিলাম। এমন সময় ফুল-ওয়ালী আসল। সে আমাকে দেখে একগাল হেসে বললে, "তোর বৌ কি কপাল! তোর হবে না তো কি আমার হবে ? আজ তোর রূপ-যৌবন সার্থক।"

আমি লজ্জিত ও বিস্মিত হলাম। সে বলতে লাগলো, দেখিস বৌ যখন বেগম হবি, তখন এ মাসীকে একটু মনে রাখিস।

আমি বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম,—তুমি কি বলছো ফুলওয়ালী মাসী, আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।

সে আমার অতি নিকটে সরে এসে বলতে লাগলো, আমি আজ যখন বেগম মহলে ফুল দিয়ে ফিরে আসছিলাম, সেই সময় নবাবের সঙ্গে আমার

পথে দেখা। আমি তো ভয়ে মরি। নবাব সাহেব আমায় তাঁর গুপ্ত ঘরে নিয়ে গিয়ে বল্লেন, ফুল-ওয়ালী তুমি তো ফুল বেচতে সব বাড়ী যাও?

আমি ভয়ে ভয়ে বল্লাম, হাঁ হুজুর।

নবাব সাহেব বললেন, একটা কাজ কর। ঐ যে আমার বেগম মহলের পাশে এক ঘর ব্রাহ্মণ বাস করে, তাদের বাড়ীর বৌকে বলে এস যে, আমি তাকে বেগম করতে চাই।

আমি তো প্রথমটা শুনে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। ধীরে ধীরে বল্লাম—হুজুর বাঁদীর সঙ্গে একি ঠাট্টা!

নবাবসাহেব বল্লেন, না ফুল-ওয়ালী, আমি তোমার সঙ্গে ঠাট্টা করছি না। তাকে আমি আজ সকালে দেখেছি। ও রকম রূপসী আমার মহলে আর একটিও নেই।

তাঁর ব্যাকুলতা দেখে তবে তো আমার বিশ্বাস হল। আমি বল্লাম —এ তো তার সৌভাগ্য। তা হলে আজ রাতে সকলে ঘুমিয়ে পড়লে আমার সঙ্গে যাস্।

আমার মুখের দিকে চেয়ে সে চুপ করলে। আমি বললাম, দেখ মাসী তুমি আর আমাদের বাড়ী এস না।

মাসী ক্রুদ্ধ হয়ে বললে, কেন লা ছুঁড়ি বড় যে দেমাক দেখছি,—ওরে ও দেমাক থাকবে না।

আমি বল্লাম—এবার যদি তুমি এস, তা হলে শাশুড়ীকে ব'লে ঝাঁটা মেরে দূর করে দেব।

বটে! আমি তোর ভালোর জন্তেই বললাম—তা একটা কলহ না হলে বুঝি হবে না। আমি দেখতে পাবি—

মাসী রাগ ক'রে চলে গেল, আমি স্তব্ধ হয়ে বসে রইলাম।
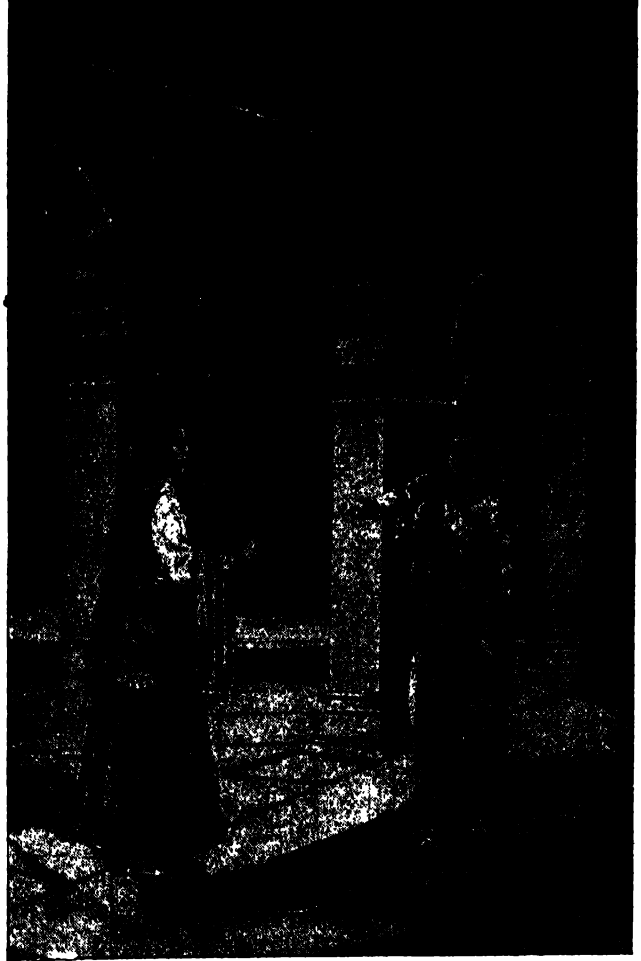
শাশুড়ীকে ব'লে ঝাঁটা মেরে দূর করে দেব।

ঘরে ঘরে প্রদীপ জ্বালা হচ্ছিলো। তারাগুলি আকাশের বুকে একে একে ফুটে উঠছিলো। সন্ধ্যার শঙ্খ-ধ্বনি বাতাসে ভেসে আসছিল। এমন সময় বাইরের দ্বারে করাঘাত ক'রে আমার শশুরের নাম

হ'য়ে কে ডাকলো। বহুক্ষণ বাদে শ্বশুরমশাই বার থেকে ফিরে এলেন। তাঁর মুখখানি তখন শবের মুখের মত শাদা হয়ে গিয়েছিল।

শাশুড়ী-ঠাকরুণ জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার কি কোন অসুখ করেছে? তিনি কোন উত্তর দিলেন না। কেবল ইঙ্গিতে তাঁকে তাঁর অনুসরণ করতে আজ্ঞা দিলেন। ঘরে গিয়ে শ্বশুরমশাই কেঁদে ফেল্‌লেন। শাশুড়ী-ঠাকরুণ কিছু বুঝতে না পেরে শুধু বল্‌লেন, ও-কি-গো!

তিনি কাঁদতে কাঁদতে বল্‌লেন, সর্ব্বনাশ হয়েছে।

শাশুড়ী-ঠাকরুণ কাঁদতে কাঁদতে বল্‌লেন, আমার বাছারা সব ভাল আছে তো?

আমি স্পন্দিতবক্ষে রুদ্ধদ্বারের কাছে এসে দাঁড়ালাম। শ্বশুরমশাই বল্‌লেন, নবাবের লোক এসেছিল—

শাশুড়ী বিস্মিত হয়ে বল্‌লেন, নবাবের লোক!

শ্বশুরমশাই বল্‌লেন, তিনি আমাদের বৌমাকে চান,—তার বদলে তিনি আমাদিগকে একটি জায়গীর দেবেন। তিনি এবার কাঁদতে কাঁদতে বল্‌লেন, জাত-ধর্ম্ম আর রইল না।

আমি কাঁপতে কাঁপতে সেখানে বসে পড়লাম।

আমার শাশুড়ী-ঠাকরুণ কাঁদতে কাঁদতে বল্‌লেন, তা হলে এখন কি হবে?

শ্বশুরমশাই বল্‌লেন, কি কুক্ষণে যে বৌমা স্নান করতে গিয়েছিল! বেটা কি চোখে যে তাকে দেখলে—

শাশুড়ী-ঠাকরুণ কাঁদতে কাঁদতে বল্‌লেন, কি সর্ব্বনাশ! শেষে কি আমাদের কপালে এই ছিল?

শ্বশুরমশাই কোন উত্তর দিলেন না। বোধ হয়, তিনি তখন চিন্তা করছিলেন। কিছুক্ষণ বাদে তিনি বল্‌লেন, যখন বেটা মনে করেছে, তখন সর্ব্বনাশ না করে নিশ্চয় শান্ত হবে না। আমরা শত চেষ্টা করলেও বৌমাকে বাঁচাতে পারবো না। আবার কিছুক্ষণ স্তব্ধ থেকে বলতে লাগলেন, এখন আমি কি ঠিক করেছি জান?—চল আজি বৌমাকে নিয়ে বৃন্দাবনধামে পালিয়ে যাওয়া যাক। সেখানে গিয়ে ছেলেদের খবর দেওয়া যাবে।

শাশুড়ী-ঠাকরুণ বললেন, তা হ'লে আর ভিটেয় প্রদীপ দেখানো হবে না?

শ্বশুরমশাই উত্তর দিলেন, কি করে আর হবে বল?

সে দিন তাঁরা আর আহার করলেন না। আমাকে আহার করবার জন্য অনেক অনুরোধ করলেন, কিন্তু আমিও আহার করতে পারলাম না।

আমার স্বামী তখন দূরে কোন যজমানের বাড়ীতে গিয়েছিলেন। দেবর কুস্তি লড়তে বাইরে গিয়েছিল। ভোর রাত্রে যাত্রা করা ঠিক হ'ল। তখন রাত্রি প্রায় তৃতীয় প্রহর। আমরা যাত্রা করার মত জিনিষ-পত্র বেঁধে নিচ্ছিলাম। হঠাৎ যেন বাইরে মানুষের লাফিয়ে পড়ার মত শব্দ হ'ল। মুহূর্ত্তমধ্যে শ্বশুরমশাই আলো উঠিয়ে বাইরের দিকে দেখলেন। আমরাও ভীতচিত্তে বাইরের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলাম। দেখলাম, দু'তিনজন লোক অঙ্গনে দাঁড়িয়ে আছে। দেখতে দেখতে আরো দু'তিনজন লোক বাইরের পাচিল থেকে অঙ্গনে লাফিয়ে পড়লো। আরো কয়েকজন লোক তখনো পাচিলের উপর দাঁড়িয়েছিল। শ্বশুরমশাই মুহূর্ত্তমধ্যে ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন। তিনি পলকে ঘরের মধ্যের দেওয়ালে হেলান দেওয়া লাঠিগাছটি উঠিয়ে নিলেন ও দ্বার রোধ করে দাঁড়ালেন। শাশুড়ী-ঠাকরুণ ভয়ে কাঁদতে কাঁদতে আমাকে দু'হাত দিয়ে বুকে চেপে ধরলেন। আমি তাঁর বুকে মুখ রেখে শুনতে পেলাম, লাঠিতে

লাঠিতে ঠক্ঠক্ শব্দও সঙ্গে সঙ্গে মরণোন্মুখ লোকগুলার কাতর ক্রন্দন নিশুতি রাতের গভীর নিস্তব্ধতা ভেদ করে বাতাসের বুক চিরে শূন্যে মিলে যেতে লাগলো। এই ভাবে কতক্ষণ কেটে ছিল বলতে পারি না। হঠাৎ শ্বশুরমশায়ের গলার শব্দ পেলাম। তিনি বলে উঠলেন, আর বুঝি রক্ষে করতে পারলাম না! আমি মুখ তুলে চাইলাম। তখন তিনি টলতে টলতে পড়ে যাচ্ছিলেন। শাশুড়ী-ঠাকরুণ আরো জোরে আমাকে বুকে চেপে ধরে কেঁদে উঠলেন। আমি তাঁর বুকে অজ্ঞান হয়ে পড়লাম।

যখন আমার জ্ঞান হ'ল, তখন আমি এই মহলে শুয়ে আছি। শয্যা-পার্শ্বে নবাবসাহেব, বাঁদীরা আমার সেবা করছে। আমি নবাবসাহেবকে দেখে অস্ফূটস্বরে চীৎকার করে আবার অজ্ঞান হয়ে পড়লাম।

৪

তার পরদিন আমি কিছু আহার করি নি। বাঁদীরা আমাকে আহার করাবার জন্য অনেক চেষ্টা করেছিল, কিন্তু পারে নি। রাত্রে নবাবসাহেব যখন শুনলেন, তখন তিনি বাঁদীদের সাহায্যে আমাকে জোর করে কি সব খাইয়ে দিলেন। জলের বদলে অন্য কিছু আমাকে খেতে দেওয়া হয়েছিল। ও! কি বিশ্রী দুর্গন্ধ তাতে, আমার মাথা ঝিম্ ঝিম্ করতে লাগলো। আমি যেন কেমন অচৈতন্য হয়ে পড়লাম।

সকালে যখন জ্ঞান হল, তখন দেখলাম—আমি একটি শয্যায় শায়িতা এবং আমার পার্শ্বে নবাব নিদ্রিত। তাড়াতাড়ি উঠতে গেলাম কিন্তু তখন এতই দুর্ব্বল হয়ে পড়েছিলাম যে, মাথা ঘুরে খাট থেকে নীচে পড়ে গেলাম। আমার পতনের শব্দে নবাবসাহেব উঠে বসলেন। বাঁদীরা সব দৌড়ে এল। তারা আমাকে জোর ক'রে তুলে বিছানায় শুইয়ে দিল। আমার তখন একটু একটু জ্ঞান ছিল। একজন বাঁদী একটা গন্ধ-ধূপ আমার নাকের কাছে ধরলে এবং সেই গন্ধ নাকে যেতেই আমি আবার জ্ঞান হারাইলাম।

তার পর কেমন ক'রে কতগুলা দিনরাত কেটেছে তা জানি না। একটু আধটু অস্পষ্ট জ্ঞান সময় সময় হ'ত, কিন্তু মাথা তোলবার ক্ষমতা আমার ছিল না।

আমি মরবার জন্যে অনেক চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু বাঁদীরা আমাকে এতই ঘিরে থাকতো যে, আমি মরবার কোন পথ খুঁজে পেলাম না।

দু'বৎসর কেটে গেল। সেদিন সকালে ফুলওয়ালী এসে বললে,—আহা! বুড়ী বেচারী বড় দুঃখ পেয়ে মল। শুনলাম তোমার জন্যে কেঁদে কেঁদে বেচারী প্রায় একরকম অন্ধ হয়ে গিয়েছিল। মরবার সময় পর্য্যন্ত তোমার নাম ক'রে কেঁদেছিল। আর পোড়া সমাজকে দেখ, যখন বুড়োটা নবাবের লোকের লাঠিতে ম'ল, তখন তাকে কত ধুমধাম করে পুড়িয়ে এল। তার পর পোড়ার মুখোরা বলে কি না, আমরা তখন জানতাম না, মনে করেছিলাম ডাকাতে মেরে ফেলেছে—তাই ছুঁয়ে ছিলাম। এখন তো জানতে পেরেছি আর ওদের ঘরের মড়া ছুঁচ্ছি না! আহা! দু ভায়ে সকলের বাড়ীতে বাড়ীতে গিয়ে, সকলের হাতে পায়ে ধরলো, কিন্তু কেউ ঘর থেকে বার হল না!

আমি আর শুনতে পারলাম না। নিজের ঘরে চলে গেলাম, কাঁদলাম,—অনেকক্ষণ ধরে কাঁদলাম। তার পর ছাদে উঠে বাড়ীটার দিকে চেয়ে রইলাম। অনেকক্ষণ কেটে গেল। হঠাৎ দেখলাম, আমার স্বামী ও দেবর মায়ের শব কাঁধে ক'রে বাড়ী থেকে বার হলেন। তাঁদের সঙ্গে আর আর কেউ নেই।

কয়েকদিন কেটে গেছে। সে দিন বাঁদীরা আমার চুল বেঁধে দিচ্ছিল। নবাবসাহেবের মহলে আসার সময় হয়েছে। হঠাৎ নীচে একটা ভীষণ গোলমাল শুনে আমি দোতালার রকে এসে দাঁড়ালাম। দেখলাম নবাবসাহেব একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছেন। আর কতকগুলো প্রহরী একটি লোককে ঘিরে হত্যা করবার জন্ত অসি চালনা করছে। দেখতে দেখতে লোকটার অব্যর্থ আঘাতে কয়েকজন প্রহরীর মস্তক স্কন্ধচ্যুত হল। হঠাৎ লোকটি যুদ্ধ করতে করতে আমার দিকে ফিরলো। আমি চমকে উঠলাম এবং আমার মুখ থেকে বার হ'ল—কে তুমি!

সে সেই শব্দে চমকে উঠ্‌লো ও উপরের দিকে চাইলো, সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলো, বৌদি তুমি এখনো বেঁচে আছ,—মরতে পার নি? আমি আজ অনেক দিনের অনেক চেষ্টার পর নবাবের দেখা পেয়েছি—বোধ হয় তার প্রাণ নিতে পারতাম কিন্তু হল না।

মুহূর্ত্ত মধ্যে একজন প্রহরীর তরবারির আঘাতে তার মস্তক ভূমিতলে খসে পড়লো। রক্ত ফিন্‌কি দিয়ে বেরুতে লাগলো। দেওয়াল, অঙ্গন তার উষ্ণ রক্তে লালে লাল হয়ে গেল। আমি মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে গেলাম।

নবাবসাহেব তখনি হুকুম দিলেন যে, আমার শ্বশুরকুলের আর কাউকে রাখবেন না। আমার স্বামীকে ধরবার জন্তে লোক ছুটলো। কিন্তু তাঁকে আর তারা খুঁজে পেল না।

৫

আরো তিন বৎসর কেটে গেল। এখন নবাব সাহেবের যাওয়া আসা ধীরে ধীরে আমার মহলে কমে আসতে লাগলো। তার পর আর মোটেই আসতেন না। ক্রমে ক্রমে আমার দাসী বাঁদী; আহার ও সাজ-পোষাকের সংখ্যা কমে আসতে লাগলো। এইবার আমি প্রাণভরে কাঁদবার সময় পেলাম। আর ঘরে থাকতে পারতাম না। তখন ঐ 'হৌজে'র ধারে বসে বসে কাঁদতাম। কখন কখন ছাদের উপর উঠে বাড়ীটার দিকে চেয়ে থাকতাম ও কাঁদতাম।

হঠাৎ একদিন শুনলাম, নবাবের বিপক্ষে তাঁর ছোট ভাই বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন। যুদ্ধের খবরের জন্তে আমরা উন্মুখ হয়ে থাকতাম। কয়েক দিন বাদে সংবাদ এল, নবাবসাহেব নিহত হয়েছেন! নূতন নবাবসাহেব কাল বেগমমহল দেখতে আসবেন। আমরা ভীত হলাম।

পরদিন নূতন নবাবসাহেব সেনাপতিকে সঙ্গে করে মহলে এলেন। তিনি সমস্ত বেগমের ঘরে গিয়ে সবাইকে ভাল করে দেখলেন। তার পর তিনি কুড়ি বছরের নীচে কয়েকজন সুন্দরী বেগমকে নিজের জন্ত বেছে নিয়ে তাঁর সেনাপতিকে পুরস্কার স্বরূপ মহল শুদ্ধ দান করলেন। আমরা যেন কুকুর-বেড়ালেরও অধম। অন্তান্ত বেগমের সঙ্গে আমিও সেনাপতির ভাগে গিয়ে পড়লাম।

আবার দীর্ঘ পাঁচ বৎসর কেটে গেল। সে দিন বড়ই গরম পড়েছিল। আমি নিজের ঘরে শুয়ে ছিলাম। এই সময় শুনতে পেলাম বাইরে কে গান গাইছে। আমি চমকে উঠলাম। এ স্বর আমার বহু দিনের পরিচিত। তাড়াতাড়ি নীচে নেমে এলাম। তখনো গান শেষ হয় নি। আমি দোরের পাশ থেকে শুনতে লাগলাম।

গায়ক গাইতে গাইতে যেন ভিতরে কিছু দেখবার জন্ত বার বার সতৃষ্ণ-দৃষ্টি নিক্ষেপ করছিলেন। গান থেমে গেল। আমি যন্ত্রচালিতবৎ তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালাম। তিনি, প্রথমে চমকে উঠলেন, তার পর ধীরে ধীরে বলতে লাগলেন,—ভাল আছ তো? আমি শুধু তোমাকে দেখবার জন্তে ফকির বেশ নিয়েছি।

তাঁর চোখ থেকে ঝর্ ঝর্ ক'রে অশ্রু ঝরে পড়তে লাগলো। আমার বুকের মধ্যে যেন কেমন করে উঠলো, আমি আর সহ্য করতে পারলাম না, কেঁদে ফেললাম।

তখন প্রহরী এসে তাঁকে গলা ধাক্কা দিয়ে বল্‌লে —এই তুই এখানে কি করছিস্? প্রহরী তাকে টেনে নিয়ে গেল।

হঠাৎ অসময়ে সেনাপতিসাহেব আমার ঘরে উপস্থিত হলেন। তাঁর চক্ষু রক্তবর্ণ। তিনি ঘূর্ণিতনয়নে, মুষ্টি বদ্ধ করে, কর্কশকণ্ঠে বললেন,—আজ তোমার কোন নাগরের সঙ্গে পীরিত করা হচ্ছিল, শুনি?

আমার শরীর যেন জ্বলে উঠলো কিন্তু জবাব দিলাম না।

সেনাপতিসাহেব আবার বললেন,—তোমার সে নাগর ধরা পড়েছে। আর কসবিনী তোমার শাস্তি কি জান?

আমি রাগে চীৎকার করে বল্‌লাম—আমি কসবিনী নই,—কসবিনী তোমার মা—

সেনাপতি সাহেব বল্‌লেন, বটে শয়তানী!

তার পর চলে গেলেন।

পরদিন সেনাপতির আদেশে একজন বাঁদী এসে আমাকে ডেকে নিয়ে গেল। আমি বাঁদীর সঙ্গে সঙ্গে মহলের ছাদে উপস্থিত হলাম। সেনাপতিসাহেব আমাকে দেখে বল্‌লেন, তোমাকে কেন এখানে ডাকা হয়েছে জান? তোমার সেই নাগর আজ সশরীরে বেহেস্তে যাচ্ছে—তুমি দেখে বোধ হয় [illegible]। হা—হা—

সে কি [illegible]! আমার বুক কেঁপে উঠলো। কিছুক্ষণের [illegible] ফকিরকে নিয়ে আসা হ'ল। তিনি আমার [illegible] চোখ নীচু করে নিলেন। সেনাপতি-সাহেব [illegible] তাঁকে দেওয়ালের মধ্যে গেঁথে ফেলতে হুকুম দিলেন।

ভৃত্যগণ তাঁর আজ্ঞামত কাজ করতে লাগলো। আমি আর দেখতে পারলাম না। চলে যাচ্ছিলাম, সেনাপতিসাহেব আমাকে ধরে রাখবার জন্য প্রহরীগণকে আদেশ দিলেন।

ওগো, আমার চোখের সামনে আমার স্বামীকে, আমার দেবতাকে দেওয়ালের সঙ্গে গেঁথে ফেল্‌লে! আর দেখতে না পেরে চোখ বুজলাম।

নারী এবার চীৎকার করিয়া উঠিল, "ওগো— সে এই দেওয়ালে—এই দেওয়ালে তাকে"—

নারী আলিসার গায়ে ঢলিয়া পড়িল। আমি আর কিছু জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিলাম না।

কিছুক্ষণ পরে নারী ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিয়া বলিতে লাগিল, "হাঁ, তার পর শোন আমার স্বামীকে দেওয়ালের মধ্যে গেঁথে ফেলা হ'লে সেনাপতিসাহেব আমাকে বললেন—শোন কসবিনী তোর শাস্তি কি? তোকে এই পাঁচ তোলার ছাদ থেকে নীচে পাথরের উপর ফেলে দেওয়া হবে। তা হলে তুই তোর প্রিয়তমের কাছে নির্বিঘ্নে পৌঁছতে পারবি।

মুহূর্ত্তমধ্যে তার ইঙ্গিতে চার পাঁচজন প্রহরী আমাকে ধরাধরি ক'রে আলিসার ওপরে উঠে দাঁড়ালো। তখন সকলে হাতে হাতে করে আমাকে শূন্যে তুলে ধরলো। তার পর তারা সকলে এক সঙ্গে আপন আপন হাত সরিয়ে নিল। আমি ঘুরতে ঘুরতে নীচের দিকে পড়তে লাগলাম। তখন সেনাপতিসাহেবের সেই বিকট অট্টহাসি আমার কাণে প্রবেশ করছিল।

উঃ! পিঠে একটা কিসের আঘাতে আমার তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। আমি চোখ মুছিয়া উঠিয়া বসিতেই শুনিতে পাইলাম—"এ বাবু কাহে এতনা রাততক্ হিঁয়া লেটে হো?" দেখিলাম একজন পুলিশ-প্রহরী আমার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

গল্প

গ্রহের ফের
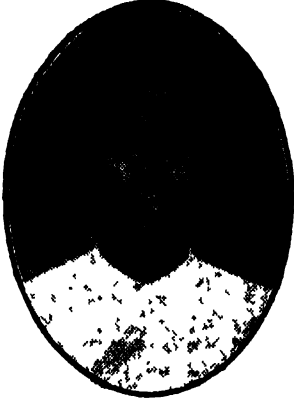
শ্রীজীবনভূষণ গঙ্গোপাধ্যায় কাব্যালঙ্কার

১

ক্ষীণকণ্ঠে সুরপতি বলিল, "নীর! একবার আমার মাথার কাছে এস, তোমায় দুএকটা কথা বলবো।" রোগশয্যায় শায়িত পতির পদ-প্রান্ত-স্থিতা নীরদা, অঞ্চলে চোখের জল মুছিয়া স্বামীর মস্তক সন্নিধানে আসিয়া বলিল, "আমি মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্চি, তুমি একটু ঘুমোবার চেষ্টা কর। যা বলবার কাল বোলো।"

শুষ্ক অধর প্রান্তে একটু ক্ষীণ হাসির রেখা অঙ্কিত করিয়া সুরপতি বলিল, "কাল পর্য্যন্ত যে টেক্‌বো না নীর! আজ ভোরেই আমার ইহলোকের সব সম্বন্ধ শেষ হয়ে যাবে। রাস্তায় গ্যাসের আলোও যেমনি নিববে সঙ্গে সঙ্গে আমার জীবন-দীপও চিরদিনের জন্য নিবে যাবে। তাই এখুনি বলতে চাইছি। নীর! ঐ না আমার রমু ঘুমোচ্চে, একবার ওকে আমার কাছে আন না, একবার ওকে জন্মের শোধ দেখেনি? কিন্তু দেখো ওর যেন ঘুম না ভাঙে। বালকের শান্তির ব্যাঘাত করে যেতে চাই নি।"

নীরদার শত সাবধানতার মধ্যেও তাহার এক বিন্দু অশ্রু রোগীর গাত্র স্পর্শ করায়, সে বলিল, "খানিকক্ষণের জন্য তোমার কান্নাটা চেপে রাখ নীর! আমার কথাগুলো মন দিয়ে শোন, এর পর যত পার কেঁদো। কান্না তো তোমার জীবনের চির সাথী হয়ে রইল। তবে তোমার রমু যদি কখনও মানুষ হয়ে তোমার ঐ চোখের জল মুছিয়ে দিতে পারে তা হলেই ওটা ঘুচবে। আজ বারো বছর আমার হাতে পড়েছ কিন্তু আমি একদিনের জন্যও তোমায় সুখী করতে পারি নি, তাই আজ শেষ বিদায়ের দিনে তোমার কাছে মাপ চাইচি।"

স্বামীর কথায় নীরদা ধৈর্য্য হারাইল, অবরুদ্ধ অশ্রুবেগ শ্রাবণের প্লাবন-ধারার মত বর্ষিত হইতে লাগিল। হৃদয়ের পুঞ্জীভূত বেদনারাশি, উৎসের মত বুক ছাপাইয়া উঠিল। নীরদা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "ওগো! ওসব অলুক্ষণে কথা তুমি মুখে এনো না, তুমি দয়া করে চরণে স্থান দিয়েছ বলেই আমার নারীজন্ম সার্থক হয়েছে। এই হতভাগিনীর জন্যেই তোমার এত কষ্ট, নইলে আজ অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি তুমি, তোমার কি না বিনা চিকিৎসায় রোগযন্ত্রণা ভোগ করতে হচ্চে! এখন একটু ঘুমোও, ভয় কি ভাল হয়ে যাবে, ভগবান তোমায় রোগমুক্ত করবেন।"

বিলয়-ভূয়িষ্ট-বিদ্যুৎরেখার মত সুরপতির অধরপ্রান্তে পুনরায় একবার হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল। সে বলিল, "সে বিশ্বাস আছে নীরদা, ভগবান আমায় রোগমুক্ত করবেন—এ বিশ্বাস আমি হারাই নি। তবে সে আরোগ্য ভোগ করবার জন্যে আমায় লোকান্তরে যেতে হবে। বাবা, কোথায় আছেন জানি নে, অধম সন্তান এইখান থেকে তাঁর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করে নিলে।" এই বলিয়া সুরপতি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া নীরবে রহিল। নীরদা

ঘুমন্ত পুত্রকে ধীরে ধীরে আনিয়া স্বামীর পার্শ্বে শয়ন করাইয়া দিয়া বলিল, "রমুকে এনেছি।"

সুরপতি নিদ্রিত পুত্রের মুখ পানে চাহিয়া বলিল, "আহা! বাছা আমার শান্তিতে ঘুমুচ্ছে, সংসারের কিছুই সে জানে না। জগদীশ্বর এই অনাথ শিশুকে তোমার চরণে সমর্পণ করে চললাম, তুমি একে দেখো প্রভু।" তাহার পর নীরদার প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিল, "আর রইল এই চিরদুঃখিনী নিরাশ্রয়া নারী, দয়াময়! তুমি ওর আশ্রয় হ'য়ো!" পরে তন্দ্রার আবেশে সে যেন নীরব হইয়া পড়িল।

প্রভাতে বিহঙ্গমকুলের সুমধুর ভগবৎ-বন্দন-গীতির সহিত সুরপতির গৃহে তাহার স্ত্রী পুত্রের মর্ম্মভেদ বিলাপ-গীতি শ্রুত হইল। পল্লীস্থ যুবক-বৃন্দের সহায়তায় অল্পক্ষণ মধ্যেই সুরপতির শবদেহ সৎকারার্থ শ্মশানে নীত হইল এবং যথাসময়ে তাহার শেষকৃত্য সম্পন্ন হইয়া গেল।

সুরপতি রতনপুরের প্রসিদ্ধ ধনী প্রসন্নকুমার মুখোপাধ্যায়ের একমাত্র পুত্র। মাতৃহীন সুরপতিকে প্রসন্নবাবু বহুযত্নে মানুষ করিয়া তুলিয়াছিলেন। মেধাবী সুরপতি বাল্যাবধি লেখাপড়ায় অত্যন্ত যত্নশীল ছিল। ধনীর পুত্র হইলেও কেহ একদিনের জন্যও তাহার ধন-মদের পরিচয় পায় নাই। পিতার প্রতি তাহার অকপট ভক্তি ছিল। প্রসন্নবাবু বরাবরাই ছিলেন অত্যন্ত একরোখা লোক। তিনি যেটা ধরিতেন কেহই তাহাকে সে বিষয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারিত না। প্রসন্নবাবুর চরিত্রের ইহাই ছিল বৈশিষ্ট। নতুবা তাঁহার মত অহমিকা-শূন্য, পরোপকারী, সদাশয় ব্যক্তি, ধনী সমাজে একান্ত বিরল।

বারবৎসর পূর্ব্বে কে জানে কোন্ গ্রহের ফেরে, সুরপতি যে দিন সুদূর পল্লীগ্রামে কোন এক বন্ধু-গৃহে নিমন্ত্রণ রক্ষার্থ গমন করিয়া পিতৃ-মাতৃহীনা নীরদাকে সমাজের উৎপীড়ন হইতে রক্ষার জন্য বিবাহ করিয়া লইয়া আসে, তখন নীরদার পিতৃ-শত্রুগণ নানাবিধ মিথ্যা কুৎসাপূর্ণ একখানি পত্র প্রসন্নবাবুকে পাঠাইয়া দেয়। কোনও দুষ্ট গ্রহ নিশ্চয়ই সেই সময় পিতা পুত্রের মধ্যে মিলনের অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। নতুবা বিচার-বুদ্ধি সম্পন্ন প্রসন্নকুমার পুত্রের মহৎকার্য্যের জন্য পুত্রের উপর প্রসন্ন হইবার পরিবর্ত্তে ক্রুদ্ধ হইতেন না। সুরপতি পত্নীসহ গৃহে প্রত্যাগত হইলে, প্রসন্নবাবু পুত্রকে তৎক্ষণাৎ পত্নী ত্যাগ করিবার আদেশ দেন। সুরপতি পিতাকে নিজের বিবাহের কারণ সবিস্তারে বুঝাইয়া বলিলেও, প্রসন্নবাবু আপনার জিদ্ ছাড়িলেন না এবং পুত্রকে স্পষ্টই বলিলেন যে, যদি সে এই মুহূর্ত্তে পত্নী ত্যাগ না করে তাহা হইলে তিনি তাহাকে নিজের সম্পত্তির এক কপর্দ্দকও দিবেন না, আর পুত্রের মুখদর্শনও করিবেন না। সুরপতি যখন পিতাকে সমস্ত ব্যাপার বুঝাইয়া বলিয়াও তাঁহার মতের পরিবর্ত্তন করিতে পারিলেন না, তখন পত্নীকে লইয়া কলিকাতার উপকণ্ঠস্থিত এক বন্ধুগৃহে গমন করিলেন, এবং তথাকার কোনও বিদ্যালয়ে একটী শিক্ষকের পদ গ্রহণ করিয়া সস্ত্রীক তথায় বাস করিতে লাগিলেন। প্রসন্নবাবু প্রথম কয়েক বৎসর পুত্রের সম্বন্ধে কোনও অনুসন্ধান করেন নাই কিন্তু স্নেহকাতর পিতা পরে বহু অনুসন্ধান করিয়াও সুরপতির কোনও খোঁজ পান নাই। বিবাহের চারিবৎসর পর রমুর জন্ম হয়।

২

আজ প্রায় বিশবৎসর হইল, সুরপতির মৃত্যু হইয়াছে। সুরপতির মৃত্যুর পর, তাহারই কোনও ছাত্রের সাহায্যে, নীরদা রংপুরের কোনও ধনীর গৃহে আশ্রয় লাভ করে এবং তথায় পাচিকাবৃত্তি

করিয়া পুত্র রমেশকে মানুষ করিয়া তুলিয়াছে। রমেশ এখন ডাক্তার হইয়া বেশ দু'পয়সা উপার্জ্জন করিতেছে। রমেশ মাতাকে অত্যন্ত ভক্তি করিত।

রমেশ বড় হইয়া মাতার নিকট তাহার পিতার সম্বন্ধে সমস্ত বিষয়ই অবগত হইয়াছিল। কলিকাতায় ডাক্তারি করিয়া অর্থোপার্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে রমেশ মাতার সর্ব্ববিধ ক্লেশ নিবারণের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিল। অনতিকালমধ্যে সে কলিকাতায় একখানি প্রাসাদোপমবাড়ী ক্রয় করিল এবং মাতা পুত্র তথায় বাস করিতে লাগিল। নীরদা যে দিন পুত্রের সহিত নব গৃহে প্রবেশ করিল, সে দিন সে স্বামীর উদ্দেশে অজস্র অশ্রু বর্ষণ করিয়া বলিল,—"হে আমার হৃদয়দেবতা। জানি না তুমি কোন্ সুরলোকে বাস করিতেছ। কিন্তু তুমি যেথায় থাক না কেন, আজ একবার সেই স্থান হইতে দেখ হৃদয়বল্লভ। তোমার রমু মানুষ হইয়া তোমারই আশীর্ব্বাদে তোমার এ দাসীর অশ্রু মুছাইতে প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে।"

আজ প্রায় চারিবৎসর হইতে চলিল প্রসন্নবাবু রতনপুর ত্যাগ করিয়া কাশীবাস করিতেছেন। বিষয় সম্পত্তির ভার তাঁহার পুরাতন সুযোগ্য কর্ম্মচারী গোপালকৃষ্ণ বসুর হস্তে অর্পণ করিয়া, জীবনের অবশিষ্টাংশ বিশ্বেশ্বর ও অন্নপূর্ণার ক্ষেত্র বারাণসীতে কাটাইবার জন্য গঙ্গাতীরে একখানি সুরম্য হর্ম্ম্য নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহার বিশ্বস্ত ও প্রভুভক্ত ভৃত্য সনাতনের সহিত বাস করিতেছেন। নানাবিধ জনহিতকর প্রতিষ্ঠানাদির প্রতিষ্ঠা ও সাধারণের হিতার্থ বহু অর্থ ব্যয় করায় বারাণসীতে তাঁহার নাম হইয়াছিল বাঙ্গালীবাবু। সনাতন ভৃত্য হইলেও প্রসন্ন কিন্তু তাহাকে অন্য চক্ষে দেখিতেন, সে ছিল তাঁহার ভ্রাতা, সচিব ও সখা।

৩

নীরদার বহু দিন হইতে ইচ্ছা যে একবার সে অন্নপূর্ণা ও বিশ্বেশ্বর দর্শন করিয়া আসে। একদিন সে তাহার মনের ইচ্ছা রমেশকে প্রকাশ করিয়া বলিলে রমেশ বলিল, "এ আর বেশী কথা কি মা! আমি শীগ্‌গিরই তোমার কাশীযাত্রার বন্দোবস্ত করচি।" এই ঘটনার একমাস পরে রমেশ একদিন হাঁস তাল হইতে ফিরিয়া আসিয়া জননীকে বলিল, "কালই তোমার কাশী যাবার সব ঠিক করে এলুম্ মা! আমার তিন মাস ছুটী মঞ্জুর হয়ে গেছে। তুমি আজ সব গোছগাছ করে নাও। হরেনবাবু আমাদের বাড়ীর তদারক এই তিন মাস করবেন। আর দরওয়ান বজ্রীসিংকেও রেখে যাচ্ছি, সেও বাড়ী-ঘর দেখবে এখন। আমি তোমার জন্যে একখানা সেকেণ্ড ক্লাস গাড়ী রিজার্ভ করে এসেছি। তোমার কোনও কষ্ট হবে না, আর আমার একজন হিন্দুস্থানী বন্ধু আজ প্রায় ছমাস হ'ল কাশীতে গিয়ে রয়েছেন, তাঁকে আমাদের জন্যে একখানা বাড়ী তিন মাসের জন্যে ভাড়া করতে বলেছিনু, আজ তারও চিঠি পেয়েছি। তিনি লিখেছেন যে, কাশীতে তাঁর এক বন্ধু আছেন—তিনি জাতিতে বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ, তিনি বলেছেন যে, যদি কেউ তাঁর দেশবাসী কাশীতে এসে তিন চারমাস বাস করতে চান্ তা হলে তাঁদের জন্য সেই বাবুর বাটীতে দ্বার অবারিত। আমার সেই কাশীবাসী বন্ধুকে আমাদের যে ট্রেণে যাবার কথা, সে সব জানিয়ে টেলিগ্রাফ করেছিনু, তার জবাবও এইমাত্র পেয়েচি। আমাদের জন্য ষ্টেশনে লোকজন থাকবে, বাড়ী খুঁজে নিতে কোনও কষ্টই আমাদের পেতে হবে না।"

নীরদা পুত্রের কথা শুনিয়া পরম আনন্দ লাভ করিল। সে রমেশকে বলিল, "বেশ ভাল কাজই করেছ বাবা। বিদেশ বিভুঁইয়ে একজন জানা

শোনা লোক থাকা খুব আবশ্যক। আমার মনে হয় হিন্দুস্থানী ভদ্রলোকের বাসায় আমাদের মতন বাঙ্গালীর নানা রকম অসুবিধে হতে পারে জেনেই বাবা বিশ্বনাথ বোধ হয় ঐ বাঙ্গালী ভদ্র লোকের আশ্রয় ঠিক করে দিয়েছেন। আমিও কখন কাশী যাইনি আর তুইও যাসনি, বাঙ্গালী হলে তাঁর কাছ থেকে যেমন কোথায় কোন ঠাকুর দেবতা আছেন জানবার সুবিধে অন্য লোকের কাছে কি সে সুবিধে হয়? সবই বেশ হয়েছে কিন্তু জিজ্ঞাসা করি আমরা যাব তো মোটে দুটো প্রাণী, তা আমার জন্যে আবার গাড়ী রিজার্ভ করে অনর্থক কতকগুলো পয়সা নষ্ট করতে গেলি কেন?"

"এ যে তোমার অন্যায় কথা মা! তুমি যদি কাশীর রাণী অন্নপূর্ণাকে দেখবার জন্যে না খেয়ে না পরে যে টাকা গুলি জমিয়েছ সে গুলি অনায়াসে খরচ করতে পার, তা হলে আমি আমার প্রত্যক্ষ অন্নপূর্ণা, আমার স্বর্গাদপি গরীয়সী দেবীর পূজার জন্যে, তাঁর একটু শান্তির জন্যে, যদি তাঁরই আশীর্ব্বাদে পাওয়া অর্থ একটু বেশীই খরচ করে থাকি, তা হলে সেটা কি অন্যায় খরচ করা হয় মা? মা! তোমার দয়াতেই তো আমি আজ এখনও বেঁচে আছি, তোমারই অকৃত্রিম স্নেহের দানে ও আশীর্ব্বাদেই আজ রমেশ মুখুজ্যে ডাক্তার হয়ে দু পয়সা খরচ করে, তা হলে সেটা তার পক্ষে অপব্যয় নয় মা! সেটা তার জীবনের সার্থকতা।"

রমেশের চক্ষুদ্বয় বহিয়া ভক্তি-অশ্রু প্রবাহিত হইল। পুত্রের কথায় নীরদার প্রাণে পরম পরিতৃপ্তির সঞ্চার হইল। তাহারও নয়নকোণে অশ্রুধারা প্রবাহিত হইল। এত তৃপ্তির মধ্যেও কিন্তু নীরদার হৃদয় মথিত হইয়া উচ্চারিত হইল, "ওগো! এ সময় তুমি কোথায় রইলে একবার এসে দেখে যাও তোমার রমু আজ আমায় তীর্থ করতে নিয়ে যাচ্ছে। যাও প্রভু আমার সর্ব্ব তীর্থের শ্রেষ্ঠতীর্থ, তোমার চরণে এইবার আমায় স্থান দাও।"

পর দিবস প্রাতঃকালে মাতাপুত্রে কাশী যাত্রা করিল।

৪

রাজঘাট ষ্টেশনে গাড়ী থামিবামাত্র রমেশ মাতাকে লইয়া গাড়ী হইতে অবতীর্ণ হইল। এমন সময় এক বৃদ্ধ আসিয়া রমেশকে জিজ্ঞাসা করিল, "বাবু! আপনি কি কলকাতা থেকে আসছেন, আপনিই কি ডাক্তার বাবু?" রমেশ বলিল, "আজ্ঞে হাঁ।" বৃদ্ধ জিভ কাটিয়া বলিল, "করেন কি, আমি বাবুর বাড়ীর চাকর, আপনি আমায় "আজ্ঞে" বলবেন না! মাকে নিয়ে আমার সঙ্গে আসুন। ঐ গাড়ী হাজির রয়েছে। কুলীরা মাল পত্তর, গাড়ীতে তুলে দেবে এখন, আপনার কিছু চিন্তে করতে হবে না।"

যথাসময়ে রমেশ ও নীরদাকে লইয়া গাড়ী বাঙ্গালীবাবুর অট্টালিকার দ্বারে উপস্থিত হইল। গৃহস্বামী দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া অতিথিগণের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। রমেশ ও নীরদা গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়াই দেখিলেন, এক শুভ্রকেশ, গৌরবর্ণ, স্কন্ধ-লম্বিত যজ্ঞোপবীত-ধারী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইয়া আছেন। ব্রাহ্মণ অশীতিপর বৃদ্ধ হইলেও, বার্দ্ধক্যকবলগ্রস্ত লোলচর্ম্ম নহেন। তাঁহার ব্রহ্মচর্য্যের শক্তি যেন বার্দ্ধক্যকে পরাভূত করিয়া যৌবনের তেজকে তাঁহার দেহে ফুটাইয়া রাখিয়াছে। নীরদা ও রমেশ তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিবা মাত্র তিনি "থাক্ থাক্ হয়েছে, "নমো নারায়ণায়" বলিয়া প্রতি নমস্কার করিলেন। পরে যে বৃদ্ধ রমেশকে ষ্টেশন হইতে আনিতে গিয়াছিল তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "সনাতন এঁদের

মুখ হাত পা ধোবার ব্যবস্থা করে দাও। এঁরা এবেলাটা বিশ্রাম করুন। বৈকালে আরতি দেখবার ব্যবস্থা করে দেবো।" পরে অবগুণ্ঠিতা নীরদাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—"যাও মা! ভিতরে গিয়ে মাতা পুত্রে একটু বিশ্রাম করগে, এ তোমাদের নিজের বাড়ী ব'লেই মনে ক'রো কোন রকম কুণ্ঠা-বোধ ক'রো না, আমি একবার বিশ্বেশ্বর দর্শন করে আসি, তোমরা বিশ্রাম করগে ভাই।" এই বলিয়া রমেশের পানে চাহিলেন। বৃদ্ধের চক্ষু যেন রমেশের মুখ হইতে ফিরিতে চাহিতেছিল না। বৃদ্ধ একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া প্রস্থানোদ্যত হইলেন। সনাতন নীরদা ও রমেশকে বাটীর ভিতর লইয়া গেল।

মন্দিরে উপস্থিত হইয়া, বৃদ্ধ সজলনয়নে দেবাদিদেবকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, এ আজ কি দেখলাম বিশ্বনাথ! যাকে ভোলবার মানস করে আজ এই পাঁচ বৎসর ধ'রে তোমার দুয়ারে এসে ভিখারী হলাম, যে স্মৃতিচিহ্ন মন থেকে মুছে এনেছিনু ভোলানাথ! আমার জীবনের শেষ সন্ধ্যায় সে স্মৃতির প্রদীপ উজ্জ্বল করে কেন জেলে দিলে? এই নবাগত যুবকের মুখে, আমার সেই হারানিধির পরিস্ফুট ছায়া বিদ্যমান দেখছি। এ আমার কি হল দয়াময়? কি মোহেই আমায় ফেল্‌লে ঠাকুর। হ'ক মোহ, হ'ক স্বপ্ন, তুমি আমার এ মোহ, এ সুখস্বপ্ন ভেঙ্গে দিও না। এই বলিয়া ব্রাহ্মণ বিশ্বেশ্বরের চরণে প্রণত হইলেন।

আজ পাঁচ দিবস হইল, রমেশ বৃদ্ধের বাটীতে আসিয়াছে। বৃদ্ধের সহিত তাহার কত বিষয়ের আলোচনা চলিতেছে, কিন্তু বৃদ্ধ একদিনের জন্যও রমেশের পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন নাই, কতবার তিনি রমেশকে সে কথা জিজ্ঞাসা করিতে গিয়াই আপনাকে সামলাইয়া লইয়া প্রসঙ্গান্তরের অবতারণা করিয়াছেন। বৃদ্ধ প্রতিদিনই একাহার করিতেন, তাহাও স্বপাকে।

সপ্তাহ পরে একদিন দর্শনাদি করিয়া ফিরিয়া আসিয়া রমেশ মাতাকে বলিল, "হ্যাঁ! বাঙ্গালী বাবুকে এখানকার লোকজন ও নামে ডাকে ডাকুক, আমার কিন্তু তাঁকে ঐ খটমট নামে ডাকতে বাধ বাধ ঠেকে। তুমি বলে দাও তো মা! আমি ওঁকে কি বলে ডাকবো?"

নীরদা বলিল, "রমু! লোকে লোকের সঙ্গে কত কি সম্বন্ধ পাতায়। আমি যখন ওঁকে বাবা বলেছি, তখন তুমি ওঁর সঙ্গে, এই বিশ্বনাথের স্থানে এসে, "দাদামশাই" সুবাদ পাতাও। আমি তো আগে থাকতেই ওঁকে আমার বাবা করে নিয়েছি।"

বৃদ্ধ যে পাশের ঘরে বসিয়াছিলেন, মাতা পুত্রে তাহা জানিতে পারে নাই। নীরদার বক্তব্য শেষ হইবামাত্র, বৃদ্ধ গৃহ বহির্ভাগে আসিয়া বলিলেন, "না মা। আমি তোমার বাবা হব না। বাবা হওয়ার বড় ঝঞ্চাট মা। আমি তোমার ছেলে হব। আজ থেকে তুমি দাদাভাইয়েরও মা আর আমারও মা।"

নীরদা একটু হাসিয়া বলিলেন, "বেশ বাবা! তবে তাই হ'ল।" বৃদ্ধ একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া রমেশকে বলিলেন, "দেখো ভাই আজ এই বিশ্বেশ্বরের দরবারে পতিতপাবনী জাহ্নবীর তীরে বসে মায়ের দেওয়া আমাদের সম্পর্কটা যেন অটুট থেকে যায়।"

বৃদ্ধ সে দিন রন্ধনাদির কোন উদ্যোগ করেন নাই দেখিয়া রমেশ তাঁহাকে বলিল, "কৈ দাদামশাই আজ এখনো যে আপনি রাঁধছেন না?"

হাস্য করিয়া বৃদ্ধ বলিলেন, "যখন মা পেয়েছি ভাই! তখন আর কেন হাত পুড়িয়ে রাঁধতে যাব?

মার যে হবিষ্যান্ন হচ্চে আজ মা বেটাতে তাই ভাগাভাগি করে খাব। কেমন মা! আমায় দুটি খেতে দিবি তো?"

নীরদা বলিল, "এতো আমার ভাগ্যের কথা বাবা যে তোমার মতন ছেলে আমার কাছে চেয়ে খাচ্চে।"

বৃদ্ধের প্রাণে আজ যেন কি এক শান্তির ধারা প্রবাহিত হইল। আহার করিতে বসিয়া বৃদ্ধ আজ রমেশকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁ দাদাভাই কলকেতার কোন্ জায়গায় তোমাদের বাড়ী?"

রমেশ উত্তর করিল, "পটলডাঙ্গায়।"

বৃদ্ধ। আচ্ছা কলকেতাই কি তোমাদেব বরাবরের বাস?

রমে। না, আমাদের আদিবাস, শুনেছি রতন পুরে।

বৃদ্ধের স্বর একটু কাঁপিল, তিনি একটু ঢোক গিলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার পিতার নাম?"

রমেশ বৃদ্ধের ভাবান্তর লক্ষ্য করে নাই, মুখের গ্রাস শেষ করিয়া বলিল, "তাঁর নাম ৺সুরপতি মুখোপাধ্যায়।"

বৃদ্ধের মুখ যেন পাংশুবর্ণ ধারণ করিল। নিমিষ মধ্যে নিজের দুর্ব্বলতাটা ঢাকিয়া লইয়া তিনি বেশ সহজ ভাবেই পুনরায় বলিলেন, "আচ্ছা দাদাভাই! রতনপুর গ্রামটি কেমন?"

রমেশ বলিল, "আমি কখনো সেখানে যাই নি, মার মুখেই শুনেছি যে আমাদের বাড়ী রতনপুরে।"

বৃদ্ধ এইবার নীরদাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁ মা! তোমার শ্বশুর বাড়ীর দেশটি কেমন?" নীরদার চক্ষু জলভারাক্রান্ত হইল। তাড়াতাড়ি আঁচলে চোখের জল মুছিয়া সে বলিল, তা ব'লতে পারি নি বাবা! বিয়ের কনে মাত্র দুটিদিন শ্বশুর বাড়ীতে ছিলেম।"

বৃদ্ধ। আচ্ছা মা, তোমার শ্বশুর শাশুড়ী কেউ আছেন?

নীর। বহুদিন পূর্ব্বে শুনেছিলেম যে, আমার শ্বশুর মশাই আছেন। আর আমার স্বামীর মুখে শুনেছি যে তাঁর শৈশবেই, তিনি মাতৃহীন। এখন শ্বশুর আমার জীবিত আছেন কি না—তা জানি নে।

রমেশ আহার শেষ করিয়া বসিয়াছিল, বৃদ্ধ আহার সমাপ্ত করিয়া আচমন করিলেন। রমেশ হাত মুখ ধুইয়া রন্ধনাগারে প্রবেশোদ্যত হইল। আঁচাইতে আঁচাইতে বৃদ্ধ রমেশকে বলিলেন, "কি ভাই! ভাল খাওয়া বুঝি হল না তাই রান্নাঘরে মার কাছে খেতে চলেচ?"

নীরদা বলিল, "তা নয়, ছেলে বেলা থেকে ওর অভ্যেস, খেয়ে দেয়ে ও একবার আমার কোলে বস্‌বে। এত বড় হয়েছে, তবুও ওর সে অভ্যাস যায় নি। একবার ওকে কোলে নি, নইলে ওর কোন কাজ কর্ম্মে মন বস্‌বে না।"

বৃদ্ধ আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। আবেগ-কম্পিতস্বরে বলিলেন, "তবে দে মা। আমায় আজ তোর ঐ অভয় ক্রোড়ে একটু স্থান দে? ও না হয় তোর সুপুত্র আর এই হতভাগ্য বৃদ্ধ না হয় তোর কুপুত্র। তুই যখন মা, তখন কাকেও কোল থেকে ফেলতে পারবি নি।" কাঁদিতে কাঁদিতে বৃদ্ধ রমেশকে দৃঢ় আলিঙ্গন-পাশে বদ্ধ করিয়া বলিলেন, "দাদাভাই! আজকের আমাদের সম্বন্ধ পাতান সম্বন্ধ নয়। ও ভগবানেরই বাঁধন। তাতে আমাতে গেরোটা টানাটানি করে গেরোর ফেরে পড়ে ছিঁড়তে চেষ্টা করেছিলেম। কিন্তু সে গেরো কি ছেঁড়া যায় ভাই! আজ আবার এক নতুন গ্রহের ফেরে সে বাঁধন অটুট হয়ে গেল। রমেশ দাদা আমার, ভাই আমার! আমি সত্যিই

তোর দাদামশাই রতনপুরের প্রসন্ন মুখুর্য্যে। গ্রহের ফেরে পড়ে দুজন দুজনকে হারিয়েছি বটে কিন্তু সে আমার শেষ সময়ে তার বদলি দিয়ে গেছে, আমি তার কিছুই করতে পারলুম না। আর মা! সত্যিই আমি তোর কুপুত্র, একটা মিথ্যা সংবাদ শুনে ভাল মন্দ বিচার না করে তোর প্রতি যে অন্যায় আচরণ করেছি, তার জন্যে আমি মুক্তকণ্ঠে অপরাধ স্বীকার করে মাপ চাইচি। যখন তোমাদের বিয়ের ব্যাপারটা সম্বন্ধে সমস্ত সত্য ঘটনা শুনলুম তখন ভাবলুম তোমাদের ডেকে পাঠাই কিন্তু আজন্ম-পোষিত দুর্জ্জয় অভিমান সে পথে বাধা দিলে। আর সেও-তো আমারি ছেলে, প্রাণ দিলে তবু মান খোয়ালে না। দাদাভাই! মা! তোরা যেন অভিমান করে আর আমায় শেষ জীবনে কাঁদাস্‌নে। তোদের কারো দোষ নেই, সব দোষই এই হতভাগ্য বৃদ্ধের।"

নীরদা ও রমেশ বৃদ্ধের চরণে পড়িয়া অশ্রু-ধারায় তাহা ধোয়াইয়া দিল এবং রমেশ বলিল,—"দোষ কারো নয় দাদু! সবই গ্রহের ফের।"

উপন্যাস

কমলকুমারী

স্বর্গীয় পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

বাল্যস্মৃতি বড় মধুর, বাল্যকালের মাসী পিসীর আদর বড় মিষ্টি। জন্মদুঃখিনী অনাথিনী কমলকুমারী পিসীর আদরে সকল জ্বালা জুড়াইলেন, তিনি পিসীকে তাঁহার দুঃখের কথার পরিচয় দিতে তিলার্দ্ধ বিলম্ব করিলেন না। পিতা-মাতার মৃত্যু, মাতুলগৃহে বাস, মাতুলের মৃত্যু, ভবদেব ঘোষালের বাটীতে তাঁহার পুত্রবধূপরিচয়ে দুইমাস বাস ও তাঁহার বাটী হইতে পলায়ন, ইত্যাদি সকল বলিলেন। কোনও কথা গোপন করিলেন না। পিসী মৃণ্ময়ী এই সকল দুঃখের কথা শুনিয়া অনেক কাঁদিলেন ও কমলকুমারীকে আদর করিলেন। তিনি এখন জানিতে পারিলেন, পৃথিবীতে তাঁহার এখনও এমন একজন আত্মীয় আছেন, যাঁহার দ্বারা তাঁহার স্বামীর সঙ্গে সম্মিলন সম্ভব। তাহার পর যখন শুনিলেন যে, তাঁহার স্বামী অরবিন্দ তাঁহার পিসী মৃণ্ময়ীকে মাতার ন্যায় স্নেহ ও ভক্তি করিয়া থাকেন এবং এক বাটীতে বাস করেন, তখন তাঁহার আশা বড় প্রবলা হইল, তখন তাঁহার নূতন জীবন হইল। এতদিন যে একখানি কাল মেঘ তাঁহার মুখ-চন্দ্রমা ঢাকিয়াছিল তাহা ক্ষণকালের জন্য সরিয়া গেল, আবার সেই মহামহিম দেবীমূর্ত্তি প্রকাশ পাইল। যখন কুঞ্চিত-কেশগুচ্ছ-সজ্জিত, প্রস্তর-ধবল-গ্রীবা বাঁকাইয়া হাসিতে হাসিতে পিসীর সহিত কথা কহিতেন, তখন তাঁহার পিসী তাঁহার রূপে মোহিত হইয়া দাড়ি ধরিয়া আদর করিতেন, কখনও বা মুখ চুম্বন করিতেন—ক্ষমা পরিচারিকা তাঁহার রূপ দেখিয়া ভাবিত ও মা—এ আবার কি রূপ—এতদিন ত এ রূপ দেখি নাই।

এইরূপে প্রথম দিন কাটিল, ক্ষমা মৃণ্ময়ীর বাটীতে পরিচারিকা, ও রূপচাঁদ, দ্বারবান নিযুক্ত হইল। দ্বিতীয় দিনও কাটিল, তৃতীয় দিনে কমল-

কুমারী খড় চঞ্চলা হইলেন, অরবিন্দ আর আসেন না, শ্বশুর বাড়ীতেই বাস করিতেছেন, কিন্তু তিনি যে তাঁহারই অনুসন্ধানে বর্দ্ধমানের অলিগলি বেড়াইতেছেন তাহা কমলকুমারী বুঝিতে পারেন নাই। ডাকাত পড়া হাঙ্গামা চুকিয়া গেলেই বামনদাস তাহার অনুসন্ধান করিল, কমলকুমারীর মহল যাহা সর্ব্বদা বন্ধ থাকিত, দেখিল তাহা খোলা রহিয়াছে ও সেখানে কেহ নাই, তখন তিনি ষাঁড়ের ন্যায় চীৎকার করিতে লাগিলেন। সেই চীৎকারে সকলেই বুঝিতে পারিল যে, কমলকুমারী বাড়ীতে নাই, এবং সম্ভবতঃ ডাকাতেরা তাহাকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে, কিন্তু বুদ্ধিমান অরবিন্দ রায় অন্যরূপ ভাবিলেন, যদি ডাকাতরা তাহাকে ধরিয়া লইয়া যাইবে তবে ক্ষমা পরিচারিকা কোথায়? উহা ভিন্ন আর কয়েকটা ঘটনাতে তাঁহার মনে গুরুতর সন্দেহ জন্মিল; প্রথমতঃ ডাকাতের অনুসন্ধান পাইলেন না, কোনও দ্রব্যাদি চুরি যায় নাই, বাগানের খিড়কীর দ্বার ঠিক আছে, ভিতর হইতে অর্গলাবদ্ধ রহিয়াছে, ভগ্নাবস্থাতে নাই, ডাকাত যে বাড়ী প্রবেশ করিয়াছিল তাহার কোন চিহ্নও নাই পরে যখন আমবাগানে প্রহরীদিগের সহিত ডাকাত তাড়াইতে প্রবেশ করেন তখন গলির দরজার দ্বার খুলিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন কিন্তু ফিরিয়া আসিবার সময় দেখিলেন যে, ভিতর হইতে কে উহা বন্ধ করিয়াছে। ঐ দ্বার ভাঙ্গিয়া বাটীতে প্রবেশ করিতে হইল, তার পরে সদর বাটীতে গিয়া দেখিলেন সদর দরজা, যাহা তিনি স্বয়ং বন্ধ করিয়া গিয়াছিলেন, খোলা রহিয়াছে।

এই সকল কারণে তিনি স্থির করিয়াছিলেন যে, ডাকাত পড়ার হাঙ্গামা মিথ্যা, পৌরজনের মধ্যে কোনও একজন কোনও উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য এইরূপ গোলমাল করিয়াছে, পরে যখন শুনিলেন বামনদাসের স্ত্রী তাহার দাসী ক্ষমার সহিত অদৃশ্য হইয়াছে তখন তাঁহার আসল ব্যাপার বুঝিতে বিলম্ব হইল না। দুইবার অরবিন্দ কমলকুমারীকে দেখিয়াছিল, তাহাতে তাহার প্রতি ভালবাসা অথবা রূপের মোহ জন্মিয়াছিল, সেইজন্য বামনদাসের ন্যায় তিনিও কাতর হইয়া গোপনে তাহার মহলে যাইয়া দেখিলেন যে, তাহার বাক্স সিন্দুক খালি, উহাতে কোনও দ্রব্যাদি নাই, তখন নিশ্চয় বুঝিলেন যে, বামনদাসের স্ত্রী এই ডাকাতের হুজুগ তুলিয়া কোনও পুরুষের সহিত পলাইয়াছে, সেই ব্যক্তি ডাকাতের চীৎকার করিয়া সদর অন্দর বাটী নির্জ্জন করিয়া বামনদাসের স্ত্রীকে লইয়া গিয়াছে, কিন্তু এ সন্দেহের কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিলেন না, মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, তাহাকে রক্ষা করিবেন, পাপ হইতে উদ্ধার করিবেন, এজন্য আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া তাহার অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন।

কমলকুমারী এ সকল কথা কিছুই বুঝিতে পারেন নাই, বুঝিবেন কি প্রকারে, তিনি দিবানিশি স্বামীকেই চিন্তা এবং তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। যদি ঘুণাক্ষরে বুঝিতেন যে, স্বামী তাঁহাকে নরক হইতে উদ্ধারের জন্য রাস্তায় রাস্তায়, খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তাঁহার মৃত্যু হইত।

চতুর্থ দিবস সে দিন পৌষ মাসের অমাবস্যা, বড় দুর্দ্দিন। সমস্ত দিবস মেঘাচ্ছন্ন, টিপ টিপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে, অপরাহ্নে ভূমণ্ডল অন্ধকারময় হইল, কাল মেঘে আকাশ ঢাকিল, এই সময়ে সংবাদ আসিল অরবিন্দ বাড়ী আসিবেন, কমলকুমারীর আনন্দে শরীর পুলকিত হইল, আবার মনোমধ্যে ভয় শঙ্কারও হইল, ক্রমে রাত্রি হইল, তিনি অরবিন্দের শয়নকক্ষে বিছানায় বসিয়া

সম্মুখে টিপাইর উপর বাতিদানে বাতি জ্বালিয়া হাসি-হাসিমুখে কি কাজ করিতেছিলেন। কাজটী স্ত্রীলোকদিগের বড় প্রীতিকর ও বাঞ্ছনীয়, স্বামীর শয্যা রচনা করিতেছিলেন, বালিশের ওয়ার পড়াইতেছিলেন। তাহার জীবনে যাহা কখনও ঘটে নাই অদ্য তাহা ঘটিল। কি আনন্দে যে, ঐ কাজ করিতেছিলেন তাহা কে বুঝিবে? বাতির উজ্জল আলো তাহার মুখে পড়াতে রূপের মোহিনী শক্তি আরও বাড়াইয়াছিল। এই সময়ে কে এক ব্যক্তি ঐ কক্ষে প্রবেশ করিল। কমলকুমারী আনন্দে ও হাসি-হাসি মুখে কাজ করিতেছিলেন ও স্বামীকে ভাবিতেছিলেন, সেই স্বামী যে ঘরে প্রবেশ করিল, তিনি তাহা জানিতে পারেন নাই। অরবিন্দ তাহার বাটীতে বামনদাসের স্ত্রীকে দেখিয়া আশ্চর্য্যাম্বিত হইলেন বটে কিন্তু তাহার রূপে মুগ্ধ হইয়া নিমেষশূন্য চক্ষে তাহাকে দেখিতে লাগিলেন। যখন তাহার অনুসন্ধান করিতেছিলেন তখন তাহার প্রতি অতিশয় রাগ জন্মিয়াছিল, এখন তাহাকে দেখিয়া মন আর্দ্র হইল, ভাবিলেন যদি এই স্ত্রীলোক কুলটা ও পাপচারিণী না হইয়া পতিব্রতা ও ধর্ম্মানুষ্ঠানে ব্রতী হইত, তাহা হইলে এই রমণী-রত্নের তুলনা ছিল না।

অরবিন্দের দৃঢ় বিশ্বাস যে, বামনদাসের স্ত্রী কোনও পুরুষের সহিত তাঁহাদের বাড়ী হইতে পলায়ন করিয়াছিল, কিন্তু তাহার বাটীতে বাস করিতেছে কেন ও তাহার বিছানায় বসিয়া আছে কেন? পরে সিদ্ধান্ত করিলেন, সেই পুরুষ অবশ্যই উহাকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছে, স্ত্রীলোকটী নিরুপায় দেখিয়া তাহার পিস-শাশুড়ী মৃণ্ময়ীর আশ্রয় লইয়াছে। যাহা হউক উহাকে বামনদাসের ঘরে পাঠাইতে হইবে। এইরূপ ভাবিয়া চিন্তিয়া কিছু কঠিন স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি বামন দাসের স্ত্রী? কোনও পুরুষের সহিত আমাদের বাটী ত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু আমার বাটীতে কেন?" এই কথা শুনিয়া মাত্র কমলকুমারী মুখ তুলিয়া দেখিলেন—যাহাকে তিনি দিবানিশি ভাবিয়া থাকেন তিনিই সম্মুখে দাঁড়াইয়া অতি কঠিন স্বরে রূঢ়বাক্য প্রয়োগ করিতেছেন। যদি অন্য কেহ তাহার প্রতি ঐরূপ বাক্য প্রয়োগ করিত, তাহা হইলে তিনি সিংহীর ন্যায় গর্জ্জিয়া উঠিতেন। স্বামীর মুখে এই কথা শুনিয়া অস্ফুট চীৎকার করিয়া মাথায় কাপড় টানিয়া মুখাবরণ করিয়া বামহস্তে দেওয়াল ধরিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল, কথা কহিবার ক্ষমতা রহিত হইল, দরবিগলিত ঘামিতে লাগিলেন। অরবিন্দ পুনঃ পুনঃ ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন কিন্তু কোন উত্তর না পাইয়া দ্রুতপদে পিসী মৃণ্ময়ীর নিকট যাইয়া বলিলেন, "পিসীমা আমাদের ঘরে যে একটি অপরিচিত স্ত্রীলোক দেখিলাম, উনি কে?—কি জন্য আমাদের বাটীতে বাস করিতেছেন?" সন্ধ্যা হইয়াছে, পিসী তখন জপে বসিয়াছেন, মালা ঘুরাইতে ঘুরাইতে উত্তর করিলেন, "তোমার স্ত্রী—আমার ভাইঝি কমল-কুমারী।" এই কথা শুনিবামাত্র অরবিন্দের মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল। তিনি মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া যাইতেছিলেন, একটা গরাদে ধরিয়া দাঁড়াইলেন। এখন তাঁহার দ্বিতীয়া পত্নী বসন্তকুমারীর কথা মনে পড়িল, "আমার দাদা বৌদিদিকে বড় ভালবাসেন, আর বৌদিদিও দাদাকে তেমনি ভালবাসেন, দুইজনে একদণ্ডের জন্যও ছাড়াছাড়ি নাই।" এই কথা স্মরণ হওয়াতে অরবিন্দ আর দাঁড়াইতে পারিলেন না। ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে দ্রুতপদে কমলকুমারীর নিকট ফিরিয়া আসিতেছিলেন, কিন্তু পিসী মৃণ্ময়ী বলিয়া উঠিলেন, "ঐখানে বস, আমার

জপ সারা হইলে গোপনে তোমাকে অনেক কথা বলিব।"

অর। কি কথা?

মৃ। কমলকুমারীর দুঃখের কথা। আহা—বাছা আমার কত কষ্ট পাইয়াছে, সব তোমায় বলিব, বস আমার জপ শেষ হ'ক।

অরবিন্দ আর দাঁড়াইলেন না, যেমন গমগমে আগুনে ফুৎকার দিলে উহা প্রজ্বলিত হয়, অরবিন্দের তাহাই হইল। পিসী মৃণ্ময়ীর কথাতে আবার একটা ধারণা হইল যে, যাহার সহিত বামনদাসের বাটী হইতে কমলকুমারী পলায়ন করেন সে উহাকে ভয়ে অথবা অন্য কোনও কারণে আশ্রয় দিতে পারে নাই, রাস্তায় তাহাকে দাঁড়-করাইয়া পলাইয়াছে, কমলকুমারী তাহার পিসীর বাটীর অনুসন্ধান পাইয়াছিল, অথবা পিসী কি পিসের সহিত রাস্তায় দেখা হইয়াছিল, এই উপায়ে এ বাটীতে আসিয়া পিসীর নিকট মিথ্যা দুঃখ ও কষ্টের পরিচয় দিয়া তাহার আশ্রয় লইয়াছে। এইরূপ ধারণায় আরও ক্রোধান্বিত হইয়া দ্রুতপদে কমলকুমারী যে ঘরে ছিল সেই ঘরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। কমলকুমারী তখনও অবিশ্রান্ত কাঁদিতেছেন, তাঁহার অবস্থা দেখিবামাত্র অরবিন্দের মন একটু নরম হইল, তৎক্ষণাৎ তাহার চরিত্রের কথা মনে পড়াতে সকল সংযম হারাইয়া অতি রূঢ় ভাষায় গালি দিতে আরম্ভ করিলেন, "পাপিষ্ঠা—অশুভক্ষণে তোমাকে বিবাহ করিয়াছিলাম—তুমি আমার অজ্ঞাতসারে বামনদাসের স্ত্রীপরিচয়ে তাহার সহিত বাস করিতেছিলে—না জানি এইরূপ কত লোকের পরিচয়ে তাহাদের ঘরে বাস করিয়াছ—আবার আমার ঘরে আসিয়াছ—মনে ভাবিয়াছ আমি তোমাকে গ্রহণ করিব? তুমি কুলটা—পাপাচারিণী—তোমার জাতিকুল নাই—দূর হও পাপিষ্ঠা—আমার গৃহে তোমার স্থান নাই। তুমি তোমার জার ঘরে যাও—কি যেখানে ইচ্ছা যাও—আমার বাড়ীতে মুহূর্ত্তের জন্য থাকিতে পারিবে না।"

এইসকল কথা শুনিবামাত্র কমলকুমারী ধীরে ধীরে দেওয়াল ধরিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, একবার মুখের কাপড় খুলিয়া স্বামীর প্রতি দৃষ্টি করিলেন, সে দৃষ্টি দেখিয়া অরবিন্দ চমকিত হইল, সে দৃষ্টিতে ও সেই মুখের ভাবে কি ছিল তাহা কে বুঝিবে? কিন্তু বুদ্ধিমান অরবিন্দ তাহা বুঝিলেন। ঐ দৃষ্টিতে কমলকুমারী স্বামীকে অনেক কথা বলিলেন, ঐ দৃষ্টি অরবিন্দের হৃদয় ভেদ করিল ও তাহার ক্রোধ প্রশমিত করিল। অরবিন্দ দুই একপদ অগ্রসর হইলেন। ইচ্ছা কৈফিয়তস্বরূপ তাহাকে কিছু জিজ্ঞাসা করেন, কিন্তু কমলকুমারী তাহা বুঝিতে পারিলেন না। ধীরে ধীরে ঐ ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া দ্বারের শিকল টানিয়া দিলেন। তাঁহার আশঙ্কা হইল যদি স্বামী তাহার পশ্চাদনুসরণ করিয়া আরও রূঢ়বাক্য বলেন অথবা প্রহার করেন, সেইজন্য দ্বার বন্ধ করিলেন; পরে দুইপদ অগ্রসর হইবামাত্র মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইলেন, আর কাঁদিলেন না। তাঁহার দুঃখের চরম হইল। এ পর্য্যন্ত যাহা আশঙ্কা করিয়াছিলেন তাহাই ঘটিল, চক্ষের জল ফুরাইল। যদি কাঁদিতে পারিতেন, তবে কষ্টের কিছু উপশম হইত, শুষ্ক চক্ষে স্বামি-গৃহ ত্যাগ করিয়া রাজপথে আসিয়া দাঁড়াইলেন, দুই এক পা হাঁটিতেছেন আবার পড়িতেছেন, এই সময় প্রবল বেগে ঝড় উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। এইরূপ পৌষ মাসের শীতে অমাবস্যার অন্ধকার রাত্রে, ঝড় বৃষ্টি উপেক্ষা করিয়া হাঁটিতেছেন, একবার পড়িতেছেন আবার উঠিতেছেন। এই অমাবস্যার

রাত্র হইতে কমলকুমারীকে আর কেহ দেখিতে পাইল না।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ

কমলকুমারী ঐ ঘর হইতে চলিয়া আসিলে, অরবিন্দ কিছুক্ষণ ঐ স্থানে দাঁড়াইয়া রহিলেন, পরে ধীরে ধীরে চিন্তিত অন্তঃকরণে বহির্বাটীতে আসিয়া তাঁহার বৈঠকখানার দ্বার বন্ধ করিয়া শয়ন করিলেন, তাঁহার দারুণ মানসিক যন্ত্রণা উপস্থিত হইল, তিনি কমলকুমারীকে ভালবাসিয়াছিলেন, পরস্ত্রী জানিয়া ভালবাসিয়াছিলেন। এইক্ষণে জানিলেন যাহাকে ভালবাসিয়াছিলেন সে তাহারই স্ত্রী, তাহাকে কুলটা ভাবিয়া তাড়াইয়া দিলেন কিন্তু তিনি কি সত্যসত্যই কুলটা,—না, বসন্তের কথায় বুঝিয়া ছিলেন যে, কমলকুমারী বামনদাসের সহিত এক ঘরে বাস করিত, কিন্তু তাহা যদি সত্য তবে কমল-কুমারী তাহা কর্ত্তৃক বহিষ্কৃত, যখন ঘর হইতে চলিয়া আসে, তখন তাহার প্রতি যে দৃষ্টি করিয়া-ছিল তাহাতে তিনি অনেক কথা বুঝিয়াছিলেন, তাহার মুখে হৃদয়ভেদী মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণার ছায়া পড়িয়াছিল—না—সে কুলটা নহে—তিনি তাহাদের বাটী যাইবার দুই দিবস পূর্ব্বে বামনদাস বহুকাল পরে বাটী ফিরিয়া আসিয়াছিল, এই দুই দিবসের মধ্যে কি এই সকল ঘটিয়াছিল—না—কখনই নহে। বুদ্ধিমান অরবিন্দ আরও ভাবিলেন বোধ হয় বামনদাস বাটী ফিরিয়া আসাতে কমলকুমারী ঐ বাটী ত্যাগ করিয়া আসিয়াছে। বসন্ত হাল্‌কা মেয়ে, তাহার ভ্রাতা ও ভ্রাতৃজায়ার গৌরব বাড়াই-বার জন্য ঐসব মিথ্যা কথা বলিয়াছে। যাহা হউক এই স্থির করিলেন, অদ্য রাত্রিতে কমল-কুমারীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সকল কথা শুনিবেন। কিন্তু তেজস্বিনী কমলকুমারী কোথায়? তাহার কি আর দেখা পাইবেন?

ইতিমধ্যে অন্দরমহলে বড় গোলমাল হইল, দ্রুত যাইয়া শুনিলেন যে, কমলকুমারীকে কোথাও পাওয়া যাইতেছে না, তাহাকে দেখিয়া মৃন্ময়ী চীৎকার করিয়া বলিল, "আমার ভাইঝি কমলকুমারী কোথায়?"

অ। আমি ত জানি না।

মৃ। তুমি কি তাহাকে গালিগালাজ করিয়াছ?

অরবিন্দ তখন সকল কথা বলিলেন, তিনি যেরূপ রূঢ় বাক্য তাহাকে বলিয়াছিলেন তাহা বলিলেন, মৃন্ময়ী উহা শুনিয়া চীৎকার করিয়া আছাড়িয়া ভূমিতে পড়িয়া গেলেন, পরে বলিলেন "সে তোমার বাটী ত্যাগ করিয়া গিয়াছে আর আসিবে না, হায়—হায় কি করিয়াছ। সেই মেয়ে পথে পথে বেড়াইবে, ভিক্ষা করিয়া খাইবে—না, সে জলে ডুবে মরবে।" অরবিন্দ সেইখানে মাথায় হাত দিয়া বসিলেন, ক্ষমা ও রূপচাঁদ অন্ধকারে দাঁড়াইয়া এই সকল কথা শুনিল। উভয়ে কাঁদিতে লাগিল। পিসী মৃন্ময়ীকে সান্ত্বনা করিয়া অরবিন্দ বলিল—"তোমার ভাইঝির দুঃখ ও কষ্টের কথা বলিবে বলিয়াছিলে, এখন বল, আমি তাহাকে খুঁজিয়া আনিব।" মৃন্ময়ী তখন উঠিয়া বসিলেন ও বলিতে আরম্ভ করিলেন—তাহার বিবাহের পর তাহার পিতা-মাতার মৃত্যু, মাতুলগৃহে বাস, মাতুল ও মাতুলানীর জলমগ্ন হইয়া মৃত্যু, মুসলমান দ্বারা বন্দী হওয়া ও ভবদেব ঘোষালের পুত্রবধূপরিচয়ে উহাদের হস্ত হইতে পরিত্রাণ, পরে ভবদেব ঘোষালের বাটীতে কিছুদিন বাস তাহার পুত্র বামনদাস বাটী প্রত্যাগমন করিলে ২।৩ দিন পরে ঐ বাটী হইতে পলায়ন, তাহার পর রূপচাঁদ ও ক্ষমা পরিচারিকার নিকট আরও সকল ঘটনা শুনিয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন, পরে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া ভবদেব ঘোষালের বাড়ীতে যাইলেন,

সেখানে প্রথমতঃ ভবদেব ঘোষালের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার নিকট যাহা শুনিলেন তাহাতে সকল সন্দেহ দূর হইল, তৎপরে বামনদাসের নিকট যাইলেন তিনি অরবিন্দকে দেখিবামাত্র চীৎকার করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "আমার স্ত্রী জয়াবতী কোথায়? তুমি কি তাহার সন্ধান করিতে পারিয়াছ?" অরবিন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার স্ত্রীর নাম কি জয়াবতী?" বামনদাস বলিল "হ্যাঁ"।

অর। তোমার স্ত্রীর সহিত তোমার কি কোনওরূপ মনান্তর হইয়াছিল?

বা। মনান্তর—আমি এ পর্য্যন্ত তাহাকে একবার মাত্র খিড়কীর বাগানে দেখিয়াছিলাম। আর আমি তাহাকে দেখিতে পাই নাই।

অর। কেন?

বা। আমি যেদিন বাড়ী আসি, সেইদিন খিড়কীর দ্বার খোলা দেখিয়া ঐ দ্বার দিয়া বাড়ী ঢুকিলাম, ঐ খিড়কীর পুকুরের নিকট আমার স্ত্রী বসিয়াছিলেন, আমি একটা কামিনীগাছের অন্তরাল হইতে উহার রূপ দেখিতেছিলাম, কিছুক্ষণ পরে সে আমাকে দেখিতে পাইয়া চীৎকার করিয়া পলাইতে পলাইতে পড়িয়া গেল, পায়ে গুরুতর আঘাত লাগিয়াছিল, যে ২।৩ দিন আমার বাড়ীতে ছিল আমার সহিত দেখা করে নাই, আমি দেখা করিবার জন্য অনেক কৌশল করিয়াছিলাম কিন্তু সফল হই নাই, সে তাহার মহলের দ্বার বন্ধ করিয়া থাকিত।

এই সকল কথা বামনদাসের মুখে শুনিয়া অরবিন্দের হৃদয় বিদীর্ণ হইল, তাহার নিরপরাধা স্ত্রীকে বিনা দোষে ত্যাগ করিয়াছেন, সে যে জনম-দুঃখিনী, বাল্যকাল হইতে দুঃখকষ্ট ভোগ করিতেছে, বালিকা অবস্থায় আমার পিতামাতা বিনা অপরাধে তাহাকে ত্যাগ করিয়াছিলেন, সেইজন্য তাহাকে পরগৃহে বাস করিতে হইতেছিল, এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে তাহার চক্ষে জল আসিল, অন্ধকারে একস্থানে দাঁড়াইয়া চক্ষুর জল মুছিয়া বসন্তকুমারীর ঘরে গেলেন, তাহাকে দেখিবামাত্র বসন্ত জিজ্ঞাসা করিল, "আমাদের বৌকে খুঁজিয়া পাইয়াছ?"

অর। না—পাই নাই, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি উত্তর দাও। তোমার দাদার মুখে শুনিলাম যে, তোমাদের বৌ তোমার দাদার সহিত এ পর্য্যন্ত দেখা করেন নাই, কেন বল দেখি?

বস। ওমা—সে যে পা ভেঙ্গে পড়েছিল, কেমন করে দেখা করবে?

অর। পা ভাঙ্গলে, কি মাথা ভাঙ্গলে, কি কোন অসুখ করলে স্বামীর সঙ্গে দেখা করে না? তুমি ঐরূপ পা ভাঙ্গলে কি আমার সঙ্গে দেখা করতে না, তাড়িয়ে দিতে?

বসন্তকুমারী এইবার ধরা পড়িয়া উত্তর করিলেন, "না—না—তা কি করিতে পারিতাম, আমি দেখা করিতাম।"

অর। তবে তোমার বৌদিদি তোমার দাদার সঙ্গে দেখা করে নাই কেন?

বস। দেখ, আমার বোধ হয় বৌদিদি দাদাকে দেখতে পারত না, ভালবাসত না, আমার দাদা ত দেখতে তেমন সুন্দর নয়—তাই।

বসন্তকুমারী স্বামীকে আর একটা কথা যাহা পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন তাহা বোধ হয় পাঠক-পাঠিকাকে স্মরণ করাইবার প্রয়োজন নাই।

অর। তোমার বৌদিদি কি সুন্দরী?

বস। কেন, তুমি কি তাহাকে দেখ নাই? সেদিন তাহার বারান্দায় তুমি তাহাকে অজ্ঞান হইয়া দেখিতেছিলে, আর সেও তোমাকে লজ্জা-সরম ত্যাগ করিয়া দেখিতেছিল, মনে নাই?

এই কথা শুনিবা মাত্র অরবিন্দের মাথা ঘুরিল, আবার চক্ষে জল আসিল, দ্রুত বহির্বাটীতে আসিলেন, শ্বশুর-শাশুড়ী ও বসন্তের অনুরোধ না শুনিয়া দ্রুত অশ্বপৃষ্ঠে বাড়ী ফিরিলেন কিন্তু প্রত্যাগমনের পূর্ব্বে একটা কথা বুঝাইয়া আসিলেন যে, যে স্ত্রীলোকটী তাহাদের বাটীতে গৃহস্থের পুত্রবধূ-পরিচয়ে বাস করিতেছিল, সে তাঁহাদের পুত্রবধূ নয়, সে দুর্ল্লভরাম চক্রবর্ত্তীর কন্যা ; জয়াবতী নয়—উহার ভাগিনেয়ী, সেইজন্য বামনদাস বাটী ফিরিবা মাত্র সে পলাইয়াছে। আরও বুঝাইলেন যে, যবন-হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য দুর্ল্লভরাম তাহার ভাগিনেয়ীকেই তাহার মৃতা কন্যা জয়াবতী বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলেন, কিন্তু ঐ স্ত্রীলোকটী (কমলকুমারী) যে তাহার স্ত্রী একথা জানাইলেন না। অরবিন্দের কথা তাহার শ্বশুড়-শাশুড়ী ও বসন্ত বিশ্বাস করিল কিন্তু বামনদাস বিশ্বাস করিল না।

অরবিন্দ গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কমলকুমারীর অনুসন্ধানে বাহির হইলেন। সমস্ত রাত্রি এখানে সেখানে খুঁজিলেন। অবশেষে অতিশয় ক্লান্ত হইয়া বাটী ফিরিলেন, এইরূপ এক মাস ধরিয়া দিনরাত খুঁজিতে লাগিলেন কিন্তু কমলকুমারীকে কোথায়ও পাইলেন না। [ক্রমশঃ]

প্লাবন

শ্রীমতী চারুলতা দেবী

এখন গভীর নিশা, চিত্রাপিতা দিগঙ্গনাগণ,
ধরণী সুপ্তির কোলে ঢালিয়াছে অঙ্গ আপনার ;
শীতল চন্দ্রিকা-স্নাত মহাকাশ ধ্যান পরায়ণ,
ধরিয়া রূপের বেশ ভ্রমিতেছে সঙ্গীত-ঝঙ্কার।
কণ্ঠ আজি বিনিশ্চল,—শব্দহারা প্রকৃতির ভাষা,
মহা সমাধির অঙ্কে লুপ্তপ্রায় সুরের উচ্ছ্বাস ;
চুম্বিত-ধরণী-বক্ষ স্বর্লোকের সৌন্দর্য্য-পিয়াসা,
মৃত্তিকার মর্ম্মে মর্ম্মে ঢালিয়াছে আনন্দ-আভাস।
চেয়ে আছি মুগ্ধচোখে—নাই আজ নয়নে পলক,
দেখি শুধু দিকে দিকে ফুটিয়াছে আলেখ্য মধুর ;
সঙ্গীত-প্রতিভূ হয়ে হাসিতেছে রূপের আলোক,
নভশ্চ্যুত চন্দ্ররশ্মি শান্তরূপে জাগায়েছে সুর।
রূপকের আবরণ—অন্তরের সাধনা ভেদিয়া,
হে অরূপ ! শান্তি-স্রোতে দাও আজি আমারে প্লাবিয়া।

গল্প

মতির চুড়ি

শ্রীহেমনলিনী বসু

১

একখানি একতলা ঘরের মেজের উপরে একটী যুবতী বসিয়া পান সাজিতেছিল। একটী ছোট দেড় বছরের ছেলে কাছে বসিয়া উপদ্রব করিতেছিল। কখনও বা একমুঠা সুপারি চূণের হাঁড়িতে ফেলিয়া, কখনও বা অৰ্দ্ধেক সাজা চূণ-খয়ের দেওয়া একটা পান ধরিয়া টান দিয়া মাকে বিরক্ত করিতেছিল; মতি মাঝে মাঝে তাকে একটু সরাইয়া দুই একখানা খেলনা দিয়া একটু তফাতে বসাইয়া আসিতেছিল, সে আবার চলিয়া আসিতেছিল। মতির প্রতিবাসিনী উমা কাছে বসিয়া গল্প করিতেছিল, সে খোকাকে কোলে লইয়া চাপিয়া রাখিল।

মতি বলিল, "ছোট ছেলে নিয়ে ভাই এত যে কষ্ট, তবু একটা ঝি রাখিনি! কিন্তু তবু দেখ, গহনা পত্তরগুলা সমস্তই বাজে নষ্ট হ'ল। এখন বিয়ের সময় শাশুড়ী যে গখরি চুড়ি ক'গাছি দিয়েছিলেন, তাইতে ঠেকেছে, কোন দিন আবার বাবু তাও নিয়ে নষ্ট করবেন।"

উমা বলিল, "তা' যে কদিন আছে, প'রে থাকিস না কেন? এমন স্বামী দেখিনি ভাই, যা' রোজগার করিস, তাই না হয় নষ্ট কর্, ঘরের গহনাগুলো পর্য্যন্ত ঘুচিয়ে দিলে।"

মতি। যা' মাসে ৫০৲ টাকা মাহিনে পায়, সংসারে খুবই কষ্ট দেয়, তবু তো চক্ষু লজ্জায় পড়ে দুবেলা শাকভাত দিতে হয়, তার পর বদ খেয়ালের খরচ কোথা থেকে করবে, তাই নেয়। ও আর প'রিনি ভাই, ওতো যাবেই। ভাবি, এই তো ছেলেটা আছে, যদি একটা ভারি অসুখই হয়, পয়সা অভাবে বাঁচাতে পারবো না। বাপেরাও গরীব, শ্বশুরবাড়ীতেও ঐ কুলধ্বজ স্বামী ছাড়া আর কেউ নাই।"

উমা। ওগুলো লুকিয়ে রেখে দে, এইবার যখন চাইবে, বলবি চোরে নিয়ে গেছে।

মতি হাসিয়া বলিল, "কি যে পাগলের মত কথা বল ভাই, তাই বিশ্বাস করবে কি না, মারপিঠ করবে।"

উমা একটু মুচকাইয়া হাসিয়া বলিল, "দেখ্, একটা কাজ কর্ না? কি এক রকম কেমিকেল সোনার বিজ্ঞাপন পাঁজিতে দেখেছি, তার গহনা ঠিক সোনার মতন দেখতে। ঐ রকম একজোড়া গখরি চুড়ি কিনে রেখে দে; এইবার চাইলে তাই দিস আর ও চুড়ি মার কাছে পাঠিয়ে দে।"

মতির নিষ্প্রভ নয়ন উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে বলিল, "তা' করতে পারি, কে এনে দেবে ভাই, তোর বরকে দিয়ে আনিয়ে দিবি?"

উমা বলিল, "সে এক ধরণের লোক ভাই। আমি ছোট ঠাকুরপোকে দিয়ে আনিয়ে দিব।"

মতি তাড়াতাড়ি উঠিয়া বাক্স খুলিয়া একগাছি চুড়ি ও একটী টাকা উমার হাতে দিল।

২

একদিন সন্ধ্যাবেলা মতি যখন রান্নাঘরে ময়দা মাখিতেছিল স্বামী রাখাল খোকাকে কোলে লইয়া রান্নাঘরের দোরের কাছে গিয়া ছেলেকে নামাইয়া দিয়া বলিল, "দেখো একে, আমি একবার আসছি।" পরে একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "মতি সাহেব বেটা কি বজ্জাত, কদিন লেট হয়েছে বলে মাইনাটা পূরো দিলে না। টাকায় তো আঁটবে না, তুমি তোমার দু' গাছা চুড়ি আমায় দেবে? ও মাসে মাহিনে পেলেই খালাস করে দেবো।"

মতি ময়লার হাতটা ছাড়াইয়া গজগজ করিতে করিতে বলিল, "সবই ছাড়িয়ে নিয়েছ, তা' এইটাই বাকী আছে", বলিতে বলিতে দ্রুতপদে ঘরে গিয়া বাক্স খুলিল। রাখাল মৃদুপদে সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছিল। মতি দুই গাছা চুড়ি তুলিয়া ঝন্‌ঝন্ করিয়া ঘরের মেঝেতে ফেলিয়া আবার রান্নাঘরে চলিয়া গেল। রাখাল "বাবা। এবার যে খুব ভালমানুষ, এক কথায় দেওয়া হল," বলিতে বলিতে চুড়ি কয় গাছি কুড়াইয়া লইয়া রুমালে বাঁধিয়া পকেটে রাখিয়া চলিয়া গেল। মতি দোরটা দিয়া আসিয়া একটু একটু হাসিতে লাগিল। যদি ফিরে এসে বলে, "এ পেতলের চুড়ি, এখনি সে চুড়ি বের কর", তাহা হইলে আমি বলিব,—"তোমরাই তো দিয়েছিলে, পেতলের কি সোনার তা' তোমরাই জান। আমার কি পিতলের গহনার দোকান আছে?"

* * *

দোকানে পোদ্দার ওজন করিয়া কষ্টিপাথরে ঘষিয়াই চসমার ফাঁক দিয়া চক্ষু তুলিয়া রাখালের দিকে চাহিল। সে দেখিল চেহারাটা মোটেই ভদ্রলোকের মত নয়, দেহ ক্ষীণ বিবর্ণ, তাহার উপর আবার এক বিশ্রী রকমের টেরী, আধময়লা কাপড়। পোদ্দার তাহার ছেলেকে বলিল, "এর হাত চেপে ধরে পাহারাওলাকে ডাক্, বেটা জোচ্চোর।"

ছেলে তাহাই করিল। রাখাল বলিল, "সে কি কর্ত্তা। কি জুয়াচুরিটা করলাম?" ততক্ষণে পাহারাওয়ালা আসিয়া কাছে দাঁড়াইয়াছে। পোদ্দার বলিল, "এই লোকটা পেতলের চুড়ি আমার কাছে সোনা বলে বাঁধা দিতে এসেছিল, এই দেখ চুড়ি। বেটা হয় তো কোথাও চুরি করে এনেছে, সোনা কি পেতল জানে না।"

রাখাল চীৎকার করিয়া বলিল, "কখনই পেতল নয়, আচ্ছা অন্য দোকানে যাচাই কর।"

"আমার বড় গরজ পড়ে গেছে আর কি!" বলিতে বলিতে পোদ্দার দোকান কতকটা সামলাইয়া রাখিয়া ছেলেকে দোকানে বসাইয়া, রাখালের সঙ্গে পুলিসে যাইতে প্রস্তুত হইল।

রাখাল বলিল, "কতবার তো কত জিনিস বেচে গেছি, সে সব কি কখনও পেতল হয়েছে?"

আশে পাশে দর্শকেরা পাহারাওয়ালা দেখিয়া ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। ভিড়ের ভিতর হইতে কেহ বলিল, "বেটা নিশ্চয়ই চোর, অন্যান্য বারে সোনা পেয়েছিল, এবার পেতলের গহনা এনেছে, সোনা মনে করেই এনেছে আর কি।"

রাখালের চোখ দিয়া জল পড়িতেছিল, আর মনে মনে মতির সর্ব্বনাশের বাসনা করিতেছিল। সেই হতভাগী এই কল খাটাইয়াছে। আচ্ছা। যখন ছাড়া পাবো, গিয়ে একেবারে তার গলা টিপে ধরব, সকল বদমায়েসীই তার বের ক'রব। তাই বটে, সে এবারে কিছু গোলমাল না ক'রেই চুড়িগুলি বের করে দিয়েছে। আচ্ছা। এক মাষে শীত পালায় না, আমি তো জেলে চললুম, কে তা'কে খাওয়ায়, ঘরের ভাড়া দেয় দেখব।"

৩

পরদিন বেলা ৮ টা বাজিয়া গেল, তখনও রাখালের দেখা নাই। মতি রাত্রিতে ভাল ঘুমাইতে পারে নাই। শুইয়া শুইয়া ভাবিতেছিল, "বেচতে গিয়ে সে যখন টের পা'বে, তখন কি রণমূর্ত্তি হয়েই আসবে, আমি বলবো আমি কি জানি! এ গহনা তো তোমরাই বিয়ের সময় দিয়েছিলে, পেতল কি সোনা তা তোমরাই জান। তখন কত রাগারাগিই হ'বে।" অসহায়া মতি সে চিত্র স্মরণ করিয়া বারবার শিহরিয়া উঠিতে লাগিল আর মনে মনে ভাবিতে লাগিল—এখনি কি পিতল ধরা

পড়বে? পরে কোন্‌দিন পড়তে পারে, আজ সে টাকা নিয়ে কোথায় মদভাং খাচ্ছে, আজ আর কোন গোল হবে না, যখন তাহা বেচতে যাবে, তখন গোল হবে, সে তবু দু'এক বছর রক্ষে!" মতি পার্শ্বে শায়িত নিদ্রিত শিশুপুত্রকে বুকে চাপিয়া আপনাপনি বলিতে লাগিল, "তোর জন্যেই খন এই কাজ করেছি, তুই তো এক রাক্ষসের সন্তান হয়ে জন্মেছিস, একটা ভারী অসুখ হ'লে তো'কে কি আর বাঁচাতে পারবো? এ আমার কিছু অন্যায় হয় নি।" নিদ্রিত পুত্রের মুখচুম্বন করিয়া, দ্বারের দিকে কান রাখিয়া সে কখন যে ঘুমাইয়া পড়িল, তাহা জানিলও না।

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙ্গিয়া মনটা কেমন অপ্রসন্ন রহিল, "এখনও সে আসছে না কেন? সে কখনও আফিস কামাই করে না। রাত্রে না এসেছে, সকালেও তো আসবে, কৈ তবে?" রান্নাবান্না চড়াইয়া মতি ঘরবার করিতে লাগিল, অবশেষে গিয়া উমাকে ধরিল, "কি হবে ভাই, সে এখনও আসছে না কেন? তোমার ঝিকে দিয়ে আমার বাপের বাড়ী একবার খবর দাও না, যদি দাদা এক বার আসেন।"

মতির দাদা আসিয়া সমস্ত শুনিয়া বিকালে যখন ঠিক খবর আনিলেন, তখন মতি আর লজ্জা সরম না করিয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। দাদা বলিলেন—"রাখাল অভিমানে বাড়ীতে খবর দেয় নাই, সে বল্লে—আমার স্ত্রীই যখন এই কীর্ত্তি করেছে, তখন খবর আর কা'কে দেবো?"

মতি বলিল, "দাদা! অসময়ের জন্য যে চুড়ি রেখেছিলাম,—এর চেয়ে অসময় আর কি হ'বে—সেই চুড়ি বেচে এখন তো ওঁকে বাঁচাও, মার কাছে সে চুড়ি আছে, নিয়ে বেচে দাও।"

দাদা মলিনমুখে বলিলেন, "দেখদেখিন্ কি করলি? সব মেয়েলী বুদ্ধি। চুড়িতো যাবেই, এখন চোর ব'লে ওর জেল না হয়।"

মতি বলিল, "কেন? আমি সাক্ষী দেবো। সত্যি তো সে চুরি করে নি। সব কথা আমি খুলে বলবো।"

দাদা কহিলেন, "তুই কি সাক্ষী দিতে পারবি? লোকজন দেখলে ভড়কে যাবি, কথাই ব'লতে পারবি নি, যদি বা ব'লতে পারিস্ কি বলতে কি বলবি তার ঠিক নেই।"

মতি। আমি ঠিক বলবো, তোমার কিছু ভয় নাই।

দাদা। দেখদেখিন্; কেলেঙ্কারীর একশেষ! ভদ্রলোকের মেয়ে ফৌজদারী মোকর্দ্দমায় আদালতে সাক্ষী দিতে যাবি—ছিঃ!—ছিঃ!—ছিঃ!

৪

মতির চুড়ি বেচিয়া মোকর্দ্দমার তদ্বির হইতে লাগিল। উকিল বাবু অতি কসাকসি করিয়াও ৪৲ টাকার কমে ফিঃ লইতে রাজী হইলেন না।

মতি আদালতে গিয়া সাক্ষ্য দিল, বার বার অশ্রু-মোচন করিতে করিতে সকল কথাই খুলিয়া বলিল,—"আমার স্বামী চোর-ডাকাত নন, রাত্রে বাড়ীতে থাকেন, তাঁর চরিত্রদোষ নাই, কেবল মাত্র অল্প আয় বলে সংসার চালাতে পারেন না ব'লে, আমার যে দুএকখানি গয়না ছিল, সমস্ত নষ্ট করেছেন। ছোট ছেলেটীর যদি অসুখ হয়, তবে কি উপায় হবে, এই ভেবে আমি ওগুলি লুকিয়ে রেখেছিলুম, এমন যে হবে, তা আমি স্বপ্নেও জানি নি।"

তথাপি রাখাল রক্ষা পাইল না, মতি তো মিথ্যাও বলিতে পারে? হিন্দুনারীর স্বামীকে বাঁচাইতে

পল্লী-মঙ্গল

বসিরহাট জেলা চব্বিশ পরগণার একটি মহকুমা। ধান্তকুড়িয়া গ্রাম বসিরহাট হইতে চারিক্রোশ দূরে অবস্থিত। এক সময়ে এই গ্রামের অবস্থা শোচনীয় ছিল। দেবদ্বিজে নিষ্ঠাবান্, স্বধর্ম্মপরায়ণ, সত্য-বাদী ও কর্ম্মনিষ্ঠ ৺পতিতচন্দ্র সাউর পুত্র স্বর্গীয় রায় উপেন্দ্রনাথ সাউ বাহাদুরের যত্নে ও চেষ্টায় এবং বল্লভ ও গাইন-পরিবারের সহযোগিতায় আজ ধান্তকুড়িয়া একটি আদর্শ গ্রামে পরিণত হইয়াছে।

ধান্তকুড়িয়াকে আদর্শ পল্লীগ্রামে উন্নীত করিবার জন্ত উপেন্দ্রনাথ আজীবন চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই পল্লী-সেবক পল্লীমাতার আহ্বান শ্রবণ করিয়া-ছিলেন। কিন্তু শুনিয়া তিনি উদাসীন ছিলেন না। পল্লীর কল্যাণ-সাধনার্থ তিনি ধান্তকুড়িয়া গ্রামে একটি মধ্য ইংরাজী বিত্তালয়-প্রতিষ্ঠা করেন। বলা বাহুল্য, এই সাধুকার্য্যে তাঁহার আত্মীয়-স্বজন ও গ্রামবাসিগণের সহযোগিতা তিনি প্রাপ্ত হন। সেই মধ্য ইংরাজী বিত্তালয় আজ প্রায় লক্ষাধিক টাকা ব্যয়ে উচ্চাঙ্গের উচ্চ ইংরাজী বিত্তালয়ে পরিণত হইয়াছে।

ধান্তকুড়িয়া উচ্চ ইংরাজী বিত্তালয়

ধাত্র হুড়িয়ার কৃতী সন্তান

পল্লীর কল্যাণ-সাধনে উৎসৃষ্ট-জীবন স্বর্গীয় রায় উপেন্দ্রনাথ সাউ বাহাদুর

জন্ম—১৬ই জানুয়ারী ১৮৫৯]　　　　[মৃত্যু—২৬শে ফেব্রুয়ারী ১৯১৫

[illegible] প্রেসিডেন্সি বিভাগের কমিশনার মিষ্টার বলিন্স এই বিদ্যালয়ের নূতন গৃহের উদ্বোধন-কালে বলিয়াছিলেন,—সাধারণে মফঃস্বলের জমীদার ও ধনীরা গ্রাম ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় গিয়া ভোগ-বিলাসে আসক্ত হইয়া অর্থব্যয় করিয়া থাকেন। কিন্তু ধান্যকুড়িয়ার জমীদারগণ এই নিয়মের ব্যতিক্রম। তাঁহারা স্বগ্রামের অধিবাসীদিগের কল্যাণ-সাধনে ব্রতী রহিয়াছেন।

উপেন্দ্রনাথ কেবল স্বগ্রামে উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়া ক্ষান্ত হন নাই, অন্যত্র বাঙ্গলার শিক্ষা-বিস্তারকল্পে তিনি মুক্তহস্ত ছিলেন। আচার্য্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু উপেন্দ্রনাথের [illegible] স্মৃতি-বাসরে বক্তৃতা-প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন,—আজ কলিকাতায় শ্যাম-বাজার ষ্ট্রীটের উপর যে উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের স্বরম্য গৃহ-প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহার ভিত্তি-স্থাপন তিনজন মহৎ ব্যক্তির উৎসাহ ও অর্থসাহায্যে সম্ভব হইয়াছিল—মহারাজা স্যর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, অনারেবল ভূপেন্দ্রনাথ বসু ও রায় বাহাদুর উপেন্দ্রনাথ সাউ। সংস্কৃত শিক্ষার জন্য তিনি স্বগ্রামে চতুষ্পাঠীও প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।
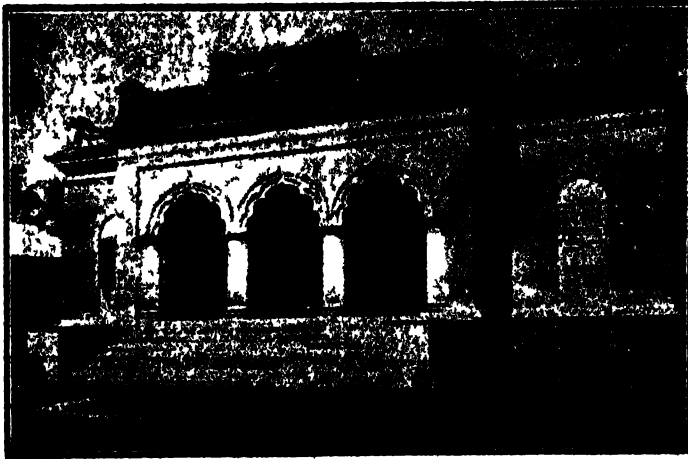
ধান্যকুড়িয়া—চতুষ্পাঠী

গ্রামবাসীর আধ্যাত্মিক কল্যাণের জন্য উপেন্দ্রনাথ পিতৃ-প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ শ্রীশ্রী৺রাধাকান্ত জীউর মন্দির স্থাপিত করিয়া দেন। মন্দির-সংলগ্ন গৃহে ব্যাখ্যা ও কীর্ত্তনের এবং সাধুদিগের বাস-ব্যবস্থা আছে। ৺রাধাকান্ত জীউর পূজা ও ভোগ এবং বৈষ্ণব-সেবার স্থায়ী ব্যবস্থার জন্য বহু সম্পত্তি তিনি দান করিয়া গিয়াছেন।
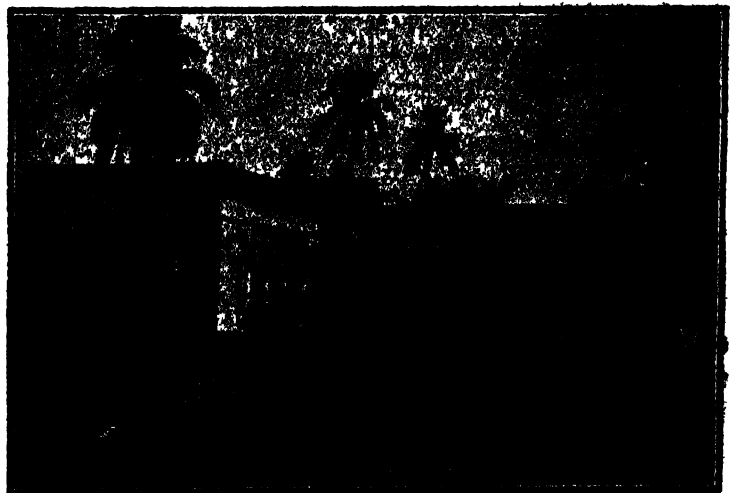
শ্রীশ্রী৺রাধাকান্ত জীউর মন্দির
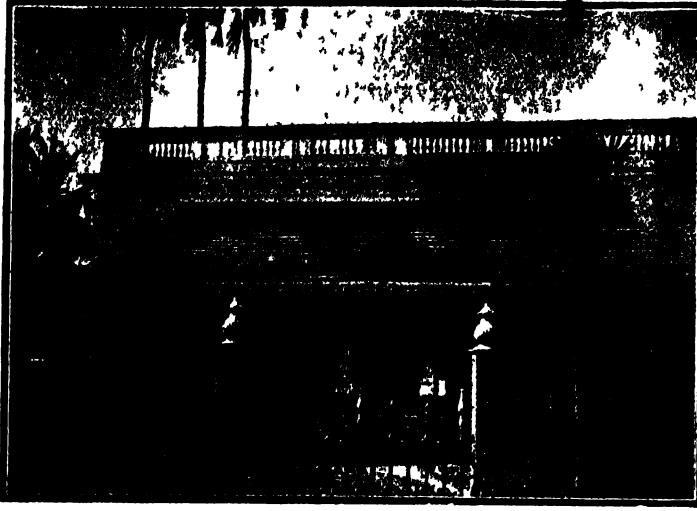
শ্যামাসুন্দরী দাতব্য চিকিৎসালয়

পল্লীর দরিদ্র অধিবাসীদিগের রোগ হইলে পূর্ব্বে চিকিৎসার সুব্যবস্থা ছিল না। উপেন্দ্রনাথ এই অভাব মোচন করিবার জন্য ধান্যকুড়িয়া গ্রামে দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করেন। এই সদনুষ্ঠানের আরম্ভ হইয়াছিল ক্ষুদ্র আকারে কিন্তু এক্ষণে এই চিকিৎসালয় সুবৃহৎ অনুষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে।

উপেন্দ্রনাথ বসিরহাটে সাধারণের সভাসমিতির জন্য একটি 'টাউন হল' স্থাপিত করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার এই সঙ্কল্প তাঁহার বংশধরগণ ও তাঁহার ভাগিনেয় রায় শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বল্লভ বাহাদুর কার্য্যে পরিণত করিয়াছেন। এক্ষণে তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত এই 'টাউন হল' বসিরহাটের একটী অলঙ্কার।

টাউনহল—বসিরহাট

উপন্যাস

অন্নপূর্ণার মন্দির

শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)
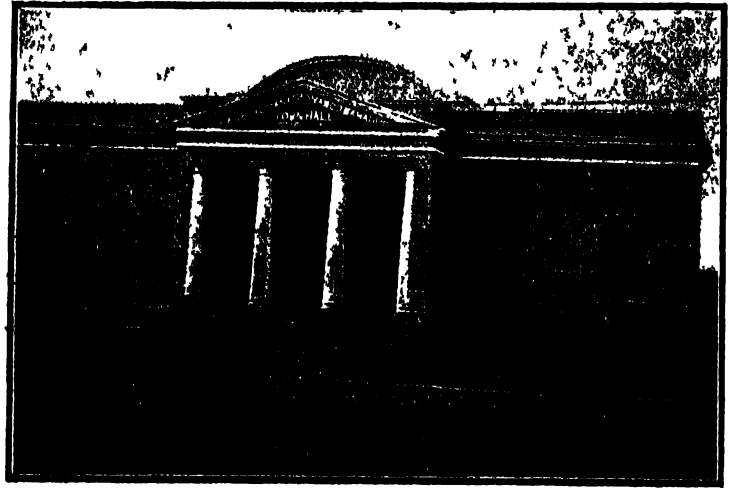
রোগ শান্তি হইবার পর সুস্থাবস্থা আসে। মূর্চ্ছার পরও চেতনা হয়। কঠিন প্রহারাঘাতের অসহ্য বেদনাও কমিয়া যায়। কিন্তু স্মৃতির ব্যথা কখনও আরাম হয় না।

স্বামীজীর যত্নে ও তাঁহার নিয়োজিত পরিচারিকার শুশ্রূষায় অভাগিনী হীরা সম্পূর্ণভাবে পূর্ব্ব স্বাস্থ্য লাভ করিয়াছে। স্বামীজীর কৌতূহলময় প্রশ্নের উত্তরে ইতিমধ্যে সে একদিন তাহার অতীত জীবনের সমস্ত কথাই খুলিয়া বলিয়াছে এবং স্বামীজীও তাহার সকল কথা শুনিয়া একটা মহা সমস্যায় পড়িয়াছেন। এই আশ্রয়হীনা হীরাকে তিনি কোন্ নিরাপদ আশ্রয়ে পাঠাইবেন ইহাই তাঁহার মুখ্য চিন্তা।

একদিন প্রথম প্রহর রাত্রে, গীতা পাঠ শেষ করিয়া তিনি বৃদ্ধা পরিচারিকাকে দিয়া হীরাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

অভাগিনী হীরা এই সময়ে তাহার ক্ষুদ্র শয্যাটিতে শুইয়া আকাশ-পাতাল চিন্তা করিতেছিল। অনেক দিক দিয়া বিবেচনার পর সে বুঝিয়াছিল, হেমন্তলালের আশ্রয় ত্যাগ করিয়া সে বড়ই অবিবেচনার কাজ করিয়াছে।

হেমন্তলাল দেবচরিত্র—নিষ্পাপ নিষ্কলঙ্ক। সে তাহার উদার হৃদয়ের প্রাণের মহত্বের মহিমা এতদিন ঠিক বুঝিতে পারে নাই। এখন বুঝিয়াছে।

এখন কি আবার হেমন্তলালের কাছে ফিরিয়া গেলে হয় না? তিনি কি তাহাকে মার্জ্জনা করিবেন না? সে যে হেমন্তলালের কাছে পুনরায় ফিরিয়া যাইবে একথা শুনিলে এই সন্ন্যাসীই বা কি মনে করিবেন?

যখন সে এই সব কথা মনে মনে আলোচনা করিতেছিল—এমন সময় পরিচারিকা সেই স্থানে আসিয়া সন্ন্যাসীর আদেশ জ্ঞাপন করিল।

স্বামীজী অজিনাসনে বসিয়া একমনে কি ভাবিতেছিলেন—এমন সময়ে হীরা সম্মুখে আসিয়া তাঁহার পদধূলি লইল।

সন্ন্যাসীর নির্দ্দেশক্রমে সে তাঁহার সম্মুখে বসিল। মৃদুস্বরে বলিল—"বাবা! আপনি আমায় ডাকিয়াছেন?"

সন্ন্যাসী বলিলেন—"হাঁ—মা। তোমার সঙ্গে একটা পরামর্শ আছে। কথাটা কি জান, চিরদিন আমি এক স্থানে থাকি না। শীঘ্রই বোধ হয় আমায় এস্থান ত্যাগ করিতে হইবে। আমি এখন তোমার কি উপায় কি করিব তাহাই ভাবিতেছি।"

হীরা অবনতমস্তকে বলিল—"আমিও সেই কথা ভাবি। আমি যে আপনার গলগ্রহ হইয়া পড়িয়া আপনার নিত্য-আচরণীয় ক্রিয়া-কাণ্ডের বিঘ্ন উৎপাদন করিতেছি তাহাও বুঝি। কিন্তু বাবা—এ জগতে আমার যে আশ্রয় স্থান নাই! আমার জন্মপল্লীতে নিজ গ্রামে ফিরিবার উপায় নাই। কেন না আমার মুসলমানে ধরিয়া লইয়া গিয়াছিল। যাঁহার আশ্রয়ে ছিলাম, যিনি মৃত্যুর কবল হইতে আমায় উদ্ধার করিয়া দয়া করিয়া আশ্রয় দিয়াছিলেন, তাঁহার সহিতও আমি ঘোর বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছি। এ জগতে আমার স্থান কোথায় পিতা?"

সন্ন্যাসী একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন—"আমি যে তোমার জন্য কোন আশ্রয় স্থান স্থির করিয়া রাখি নাই তাহা মনে করিও না। কাশীতে সুজন মল শ্রেষ্ঠী বলিয়া আমার এক

অবস্থাপন্ন শিষ্য আছে। তাহার গৃহই তোমার পক্ষে নিরাপদ। শ্রেষ্ঠী ও তাঁহার পত্নী বৃদ্ধ। যদিও তাঁহাদের একটী কন্যা আছে তাহা হইলেও তোমাকে তাঁহারা দ্বিতীয়া কন্যারূপে পাইয়া বড়ই সুখী হইবেন। তাঁহারা বড়ই সজ্জন। আমার শিষ্য দীনদয়াল কাশী যাইতেছে। তাহার সঙ্গে তোমায় পাঠাইব। একা হইলে দীন দয়াল হাঁটা পথেই যাইত। কিন্তু এ দীর্ঘ ও দুর্গম পথ তোমার ন্যায় কোমলকায়া স্ত্রীলোকের পক্ষে পদব্রজে চলা অতি অসম্ভব। এই জন্য একখানি নৌকার বন্দোবস্ত হইয়াছে। কেমন? ইহাতে তুমি সম্মত আছ?"

হীরা যখন বুঝিল তাহার আর অন্য উপায় নাই—তখন সে এই প্রস্তাব গ্রহণ করিতে তিল মাত্র বিলম্ব করিল না। বিশেষতঃ—অন্নপূর্ণা ও বিশ্বেশ্বরের আনন্দধামে বাস করিলে—অতীতের সব কথা ভুলিয়া সে আনন্দের সহিত জীবনের দিন গুলি কাটাইতে পারিবে, ইহা ভাবিয়া সে সন্ন্যাসীর পদদ্বয় ধরিয়া কাতরভাবে বলিল—"আমি আপনার অভাগিনী কন্যা। আপনি যাহা করিবেন তাহাতেই আমি স্বীকৃত।"

সন্ন্যাসী বলিলেন—"দীনদয়াল সংযতচিত্ত সন্ন্যাসী। আমার প্রধান শিষ্য। সে তোমাকে মাতৃ সম্বোধন করিয়া থাকে। তাহাকে দুই এক-দিন আমার কাছেও বসিয়া থাকিতে দেখিয়াছ। সে তোমায় যত্নের সহিত কাশীতে লইয়া যাইবে। বোধ হয় তিন সপ্তাহের মধ্যেই তুমি কাশী পৌছিবে। তবে মনে রাখিও—আত্মসংযম, নিষ্ঠা, কর্ত্তব্য-পালন, দেবতায় ভক্তি, আর বিশিষ্ট সংসারে পরের মধ্যে বাস করিতে হইলে যেরূপ সহিষ্ণুতা ও শীলতার প্রয়োজন তাহাতে যেন তোমার কোন অভাব না ঘটে। অনাথিনী তুমি—ভগবানে এ[illegible] বিশ্বাস রাখিও—তিনি তোমার পথ দেখাইয়া দিবেন[illegible]

হীরা প্রফুল্ল[illegible] বলিল, "তাহা হইলে কবে আমাকে এস্থান ত্যা[illegible]

সন্ন্যাসী কহিলেন,—[illegible] ভাবে[illegible] স্থির করিয়া রাখিয়াছি। তোমার একটা ব্যবস্থা করিয়া আমিও দুই এক দিনের মধ্যে এ স্থান ত্যাগ করিব মনে করিতেছি। যাও—যতটুকু পার ঘুমাইয়া লওগে। আমি যথাসময়ে তোমায় নৌকায় তুলিয়া দিব।"

হীরা নিজের শয়নকক্ষে ফিরিয়া আসিল—শয্যায় শয়ন করিল, কিন্তু সে রাত্রে তাহার আর নিদ্রা হইল না।

বলা বাহুল্য—পরদিন উষায়, ধরাবক্ষে সূর্য্যা লোক প্রতিফলিত হইয়া জগতের প্রাণ সঞ্চার হইবার বহুপূর্ব্বে সন্ন্যাসী আসিয়া হীরাকে শয্যা হইতে উঠাইলেন। তিনি সঙ্গে করিয়া হীরাকে নৌকায় উঠাইয়া দিলেন। তাহার হাতে একটি ক্ষুদ্র থলিয়া দিয়া বলিলেন—"ইহাতে কিছু স্বর্ণ মুদ্রা আছে। তীর্থস্থানে—পরগৃহে যখন যাইতেছ—তখন সদ্ব্যয়ের জন্য কিছু অর্থের প্রয়োজনও ঘটিতে পারে।"

দীনদয়ালকে সম্বোধন করিয়া স্বামীজী বলিলেন—"সুজনমলকে আমি ইতিপূর্ব্বেই অন্য লোক দিয়া সংবাদ দিয়াছি। ইহাকে যথাস্থানে পৌছিয়া দিয়া দুই এক দিন মধ্যে তুমি প্রয়াগের আশ্রমের ভার গ্রহণ করিবে। মধ্যে মধ্যে ইহাকে দেখিয়া যাইবে। আমি দুই মাসের মধ্যেই তোমার সঙ্গে মিলিত হইব। তোমায় আর বেশী কি বলিব দীনদয়াল! তুমি আমার পুত্রোপম। এই হত-ভাগিনীকে আমি মাতৃসম্বোধন করিয়াছি। আমার অনুপস্থিতিতে তুমি ইহাকে ভুলিও না।"

মিথ্যা বলা কিছু কি অসম্ভব? রাখালের দুই মাস কারাদণ্ড হইল। কৃষ্ণমূর্ত্তি পোদ্দার শুনিয়া বলিল, "বেটা ঠিক জব্দ হয়েছে! আবার কি না পরিবারকে দিয়ে সাক্ষী দেওয়ালে! বেটা ছোটলোকের একশেষ!"

মতি ভাবিল—রাখাল ফিরিয়া আসিলেও তো আর চাকরী থাকিবে না, তখন কি হইবে? এখনই বা কি করিয়া সংসার চলিবে? চুড়ি যাহা সে অসময়ের জন্য রাখিয়াছিল তাহা তো উকিল মোক্তারের পেট ভরাইল। কাজেই মতি পিত্রালয়ে যাওয়াই ঠিক মনে করিল। ঘরভাড়া চুকাইয়া দেওয়া হইল।

একদিন সকালবেলা একখানি গরুর গাড়ী আসিল। তক্তাপোষ, বাক্স, পোর্টম্যাণ্ট, বাসন কোসন তাহাতে বোঝাই হইল, মায় কয়লা কয়টাও পুঁটলী বাঁধিয়া, তদুপরি রান্নাঘরের ভাঙ্গা পাখাখানি রাখা হইল। গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিল। এদিকে মতিও শিশুপুত্রকে কোলে লইয়া দাদার সঙ্গে যাত্রা করিল।

যাইবার সময় উমা দেখা করিতে আসিল। মতি মনে মনে বলিতে লাগিল—এই উমাই তো পরামর্শ দিয়া এই সর্ব্বনাশটী করিয়াছে। সেই স্বামী—বিবাহের পর যে কত স্নেহ যত্ন করিত! এই ভগ্ননীড়ে কপোত কপোতীর মত বাসা বাঁধিয়া কত আনন্দ করিয়াছে! অল্প বয়সে গৃহিণী হইয়া এই ঘরেই কত সুখভোগ করিয়াছে! তার পর কোন যাদুমন্ত্রে মুগ্ধ হইয়া তাহার নিরীহ স্বামী অল্পে অল্পে এমন হইয়া পড়িলেন! না হয় আবার তাঁহার খেয়াল মিটলে তিনি আবার ভাল হইতেন। কিন্তু এ কি হইল! তিনি আসিয়াও কি আর আমার মুখ দেখিবেন? চিরদিনের জন্য আমি তাঁহার বিষনয়নে পড়িয়া রহিলাম! তিনি কি আর কোথাও চাকরী পাইবেন? তিনটী প্রাণীই যে অকূল পাথারে ভাসিলাম!

উমা বলিল, "মতি! চল্‌লি ভাই?"

মতি মুখ ফিরাইয়া কেবল মাত্র বলিল, "হ্যাঁ!" মনে মনে বলিল, "আহা কি আমার দরদী গো!" মতি গাড়ীতে উঠিয়া চলিয়া যাইলে উমা উপরের ভাড়াটেদের বৌকে বলিল, "মতি কি লোক ভাই! যাবার সময় একটা কথাও বলে গেল না!"

বৌটী অত খবর জানিত না, বলিল, "লোক আর সোজা কোথায়, স্বামীকে ঐ তো এতটা নাস্তানাবুদ করলে!"

উমা চুপ করিয়া আনমনে দাঁড়াইয়া রহিল।

উপন্যাস

রায় মশাই

শ্রীক্ষেত্রমোহন ঘোষ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

পুলিশ প্রসন্নকে থানায় লইয়া গিয়া উৎপীড়ন বড় কম করে নাই। তাহার দলে কতগুলি লোক আছে—আর সব চোরাই মাল কোথায়—সেই সব লোকের নাম ধাম জানিবার জন্য—তাহার মুখ দিয়া স্বীকারোক্তি বাহির করিবার প্রত্যাশায় পুলিশ সচরাচর আসামীর প্রতি যে সকল অত্যাচার উৎপীড়ন করে, এ ক্ষেত্রেও সে সকল অনুষ্ঠানের কোন ত্রুটী হয় নাই। কিন্তু তাহার মুখ দিয়া যখন কোন কথাই বাহির হইল না, তখন তাহার বিরুদ্ধে ডাকাতির অভিযোগ খাড়া করিয়া তাহাকে চালান দিল।

যথাকালে আদালতে মামলা উঠিল। একজন বড় ডাকাত ধরা পড়িয়াছে শুনিয়া তাহাকে দেখিবার জন্য চারিদিক হইতে লোক ছুটিয়া আসিয়াছিল। নায়েব দিবাকর সরকার সাক্ষী-সাবুদ লইয়া চারিদিকে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছিল। সকলের মুখেই একটা উৎকণ্ঠা, উকিল-মোক্তারের দল গম্ভীর। সমবেত লোকসকল উদগ্রীব হইয়া বার বার কাঠগড়ার দিকে চাহিতেছে—সকলেই ভাবিতেছে কখন সেই কঠোরকর্ম্মা, ভীষণপ্রকৃতি দস্যুসর্দ্দার আসিবে। সিদ্ধেশ্বর রায় এক পার্শ্বে নীরব বসিয়া আছেন।

অবশেষে প্রহরীবেষ্টিত, শৃঙ্খলিত প্রসন্ন রায় যখন লাঠির উপর ভর দিয়া অতি কষ্টে আসামীর কাঠগড়ায় আসিয়া দাঁড়াইল, তখন মৃদু গুঞ্জনে সমবেত দর্শকমণ্ডলীর কণ্ঠে ধ্বনিত হইল,—"এই ডাকাতের সর্দ্দার!"

মহকুমা হাকিম ডাকাতির অভিযোগে অভিযুক্ত আসামীর আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া, ললাট কুঞ্চিত করিলেন, তাহার ওষ্ঠপ্রান্তে ঈষৎ হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল।

তাহার পর যথারীতি মামলা আরম্ভ হইল। সরকারী উকিল মামলার বিবরণ বুঝাইয়া দিলেন এবং এই প্রসন্ন রায় খঞ্জ হইলেও সে যে অতি ভীষণ-প্রকৃতি এবং বহু খুন, জখম, চুরি ডাকাতির সহিত তাহার যে সংস্রব আছে, সে কথাটা বেশ ভাল করিয়াই বুঝাইয়া দিলেন এবং এত বড় একটা দুর্দ্দান্ত ডাকাত-সর্দ্দারকে এত সহজে গ্রেপ্তার করিতে পারিয়াছে বলিয়া পুলিশের কর্ম্মকুশলতার উল্লেখ করিতেও বিস্মৃত হইলেন না।

হাকিম জিজ্ঞাসা করিলেন,—"দলপতি ধরা পড়ল, দলের আর কাকেও পুলিশ ধরতে পারলে না?"

আসামী পক্ষের উকিল কহিল,—"হুজুর! তাদের পা আছে, তারা ত আর খোঁড়া নয়।"

সকলেই হাসিয়া উঠিল। কেবল সরকারী উকিল আর পুলিশের মুখটা পুড়িয়া গেল। তাহার পর এই ডাকাতির অভিযোগ প্রমাণ করিবার জন্য কোন অনুষ্ঠানেরই ত্রুটী হইল না। ফরিয়াদী পক্ষ যে সকল সাক্ষ্য-প্রমাণ দাখিল করিল, তাহার সার মর্ম্ম গোপীনাথপুরের অশ্বিনী হাজরার বাড়ী বিশ পঁচিশ জন লোক মারাত্মক অস্ত্র-শস্ত্র লইয়া ডাকাতি করিতে গিয়াছিল। আসামীর কাঠগড়ায় দণ্ডায়মান এই লোকটীও সেই দলে ছিল। এ সেই দলের সর্দ্দার, এর হুকুমেই লুটপাট হইয়াছিল, তাহারা টাকা কড়ি অলঙ্কার এবং পিতল কাঁসার বহু তৈজস-পত্র লুটিয়া লইয়া গিয়াছিল। দুই তিন জন গ্রামবাসী

ইহার অনুসরণ করিয়া বাড়ী দেখিয়া গিয়াছিল, তাহাতেই এবার ধরা পড়িয়াছে নচেৎ ইহার পূর্ব্বেও "বহুস্থানে তাহাকে ডাকাতির নেতৃত্ব করিতে লোকে দেখিয়াছে।

তাহার পর আসামীর উকিল উঠিয়া যখন জেরা করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন তাহাদের এত যত্নে রচিত তাসের সৌধ ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া গেল। এ মামলা যে সম্পূর্ণ মিথ্যা, এমন কি সে দিন যে গোপীনাথপুরে কোন ডাকাতিই হয় নাই, তাহাও অনেক সাক্ষীর মুখ দিয়া প্রকারান্তরে বাহির হইয়া পড়িল। তাহার পর পীরপুকুর হইতে গোপীনাথপুর পাকা পাঁচ ক্রোশ পথ। রাত্রিকালে মাঠের উপর দিয়া এই পথ অতিক্রম করিয়া সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে স্বগ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করা একজন সবলাঙ্গ পুরুষের পক্ষে হয় ত অসম্ভব না হইতে পারে কিন্তু প্রসন্ন রায়ের মত বিকলাঙ্গ খঞ্জের পক্ষে যে সম্পূর্ণ অসম্ভব তাহা তিনি ভাল করিয়াই বুঝাইয়া দিলেন। তাহার পর জাহ্নবী-ঘটিত সকল বিষয় বর্ণনা করিয়া বিচক্ষণ উকিল বলিলেন,—"ঐ অভাগিনীকে আশ্রয় দিয়ে এই খঞ্জ দরিদ্র যুবক যে মহত্ত্ব এবং সৎ সাহসের পরিচয় দিয়েছে তার তুলনা নাই। কিন্তু তার বিনিময়ে সে পেয়েছে কেবল নির্য্যাতন—সমাজের দারুণ নিগ্রহ। ইহার পূর্ব্বেও বহুবার তাকে বহু নিগ্রহ ভুগতে হয়েছে। এই দুর্ভিক্ষের দিনে দেশের চারি দিকে চুরি ডাকাতি হচ্ছে দেখে জন কতক মতলববাজ লোক তাকে আর কোনরূপে জব্দ করতে না পেরে তার বাড়ীর নিকটবর্ত্তী পুকুরে ঐ সকল জিনিস রেখে পুলিসে সংবাদ দেয়। এ মামলা সম্পূর্ণ মিথ্যা। যার একটি মাত্র পা সম্বল, লাঠির ওপর ভর দিয়ে কষ্টে যাকে চলতে হয়, সে লোক যে ডাকাতি করবার জন্য আট দশ ক্রোশ রাস্তা অতিক্রম করতে পারে, এ কথাটা পুলিশ বিশ্বাস করলেও, যার ঘটে কিছুমাত্র বুদ্ধি আছে, সে কিছুতেই বিশ্বাস করবে না।"

বলা বাহুল্য হাকিম প্রসন্ন রায়কে এ অভিযোগের দায় হইতে সসম্মানে অব্যাহতি দিয়া, তাঁহার রায়ে পুলিশের কার্য্যের উপর কঠোর মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিলেন এবং অশ্বিনী হাজরা এই মিথ্যা মামলা আনয়ন করিবার জন্য কেন অভিযুক্ত হইবে না, তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে বলিলেন।

বিচক্ষণ বিচারকের রায় শুনিয়া প্রতিপক্ষের মুখ শুকাইল। যাহার প্ররোচনায় এই মামলার উদ্ভব হইয়াছিল, তাহার বুকের মধ্যে কাঁপিয়া উঠিল। যবনিকার অন্তরালে অবস্থান করিয়া যে ব্যক্তি এই কলের পুতুলগুলিকে নাচাইয়াছিল, এক্ষণে সকলে তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল এবং তাহাদিগকে এইরূপভাবে বিপন্ন করিবার জন্য অনুযোগ করিতে লাগিল। দিবাকর তাহাদিগকে আশ্বাস দিয়া কহিল, তাহাদের কোন চিন্তা নাই—ইহার জন্য যাহা কিছু ব্যয় হইবে, সেই বহন করিবে। সদর হইতে উকিল ব্যারিষ্টার আনিয়া তাহাদিগকে উদ্ধার করিবে।

প্রসন্ন কাঠগড়া হইতে নামিয়া, আদালতের বাহিরে আসিয়া সিদ্ধেশ্বরের পদধূলি লইয়া মাথায় দিল। তাহার পর ছমিরকে আলিঙ্গন করিয়া কহিল, "তোমাদের দয়াতেই এবার আমি উদ্ধার পেলাম।"

মামলার পরিণতি দেখিয়া দিবাকরের মুখ শুকাইয়া গিয়াছিল। অশ্বিনী হাজরার সহিত বিষণ্ণমুখে আদালত হইতে বাহির হইবামাত্র, তাহার বাড়ীর কৃষাণ তমিজদ্দি ছুটিয়া আসিয়া কহিল,—"নায়েব মশাই সর্ব্বনাশ হ'য়েছে!"

তাহার অশ্রুসিক্ত বিষণ্ণ মুখের দিকে চাহিয়াই দিবাকরের প্রাণ উড়িয়া গেল। কি একটা দারুণ

অমঙ্গলের বিভীষিকা যেন তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। তাহার মুখ দিয়া সহসা কোন বাঙ্-নিষ্পত্তি হইল না—দিবাকর কাতরনয়নে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

তমিজুদ্দি হাঁপাইতেছিল। একটু দম লইয়া কহিল, "কর্ত্তা! কাল সব পুড়ে গেছে!"

কে যেন নায়েবের মাথায় সজোরে লাঠির আঘাত করিল। দুই তিন পদ হটিয়া গিয়া রুদ্ধকণ্ঠে দিবাকর জিজ্ঞাসা করিল, "সব পুড়ে গেছে কি রে! কেমন করে আগুন লাগলো?"

তমিজুদ্দি কহিল, "তা জানি নে। রাত দুপুরে দাউ দাউ করে আপনার রান্নাঘর জ্বলে উঠলো—তার পর বড় ঘরের মটকায় আগুন ধবলো—কিছু নেই কর্ত্তা! কিছু নেই! একটা জিনিসও বার করতে পারি নি—সব ছাই হ'য়ে গেছে!"

বাত্যাতাড়িত বেতসপত্রের মত দিবাকরের সর্ব্বশরীর কাঁপিতে লাগিল—তাহার চক্ষের সম্মুখ হইতে বিশ্বের আলোক নিভিয়া গেল—পায়ের নীচে মেদিনী দুলিয়া উঠিল। দিবাকর সেইস্থানে বসিয়া পড়িল। শবের মত রক্তহীন তাহার শুষ্ক ওষ্ঠাধর হইতে অস্ফুটস্বরে বাহির হইল,—"টাকা—টাকা—সিন্দুকে যে আমার তিন হাজার টাকা ছিল তমিজুদ্দি! সে টাকা?"

প্রভুভক্ত ভৃত্য কষ্টে কহিল, "একটা আধলাও বাঁচে নি কর্ত্তা!"

"ওঃ!"—বলিয়া সেই ধূলার উপর দিবাকর লুটাইয়া পড়িল। সে আজ সর্ব্বস্বান্ত, পথের ভিখারী! কালও তাহার সবই ছিল, আজ আর তাহার কিছুই নাই! তিন চারিখানা ঘর, গোলা-ভর্ত্তি ধান, বাক্সভর্ত্তি টাকা, এত সাধের গৃহসজ্জা সব পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়াছে। আজ আর মাথা গুঁজিবার ঠাঁই নাই—ক্ষুন্নিবৃত্তি করিবার অন্ন নাই! দিবাকর হাহাকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল!

মানুষের সৌভাগ্য এবং দুর্ভাগ্যের মধ্যে যে গণ্ডীরেখা টানা আছে, তাহা যে এক লহমায় এমনই করিয়া মুছিয়া যায়, যাহারা তাহা বুঝে না, তাহারাই সৌভাগ্যগর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া দরিদ্রের উপর অত্যাচার করে—দীন দুঃখী আর্ত্তকে মানুষ বলিয়াই গণ্য করে না। ধর্ম্মাধর্ম্ম-জ্ঞানশূন্য হইয়া আত্মোদর পূরণের জন্য পরপীড়ন করিয়া, পাকে প্রকারে তাহার সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিতে কুণ্ঠাবোধ করে না, তাহারা অহঙ্কারে উন্মত্ত হইয়া ভুলিয়া যায়, এই বিশ্বরাজ্যের একজন নিয়ামক আছেন—পাপপুণ্যের একজন সূক্ষ্মদর্শী, সর্ব্বচক্ষুষ্মান বিচারক আছেন। সেই দর্পহারী কাহারও দর্প রাখেন না—উদ্ধত অত্যাচারীর গগনচুম্বী স্পর্দ্ধা ধরণীর ধূলায় পড়িয়া লুটাইতে থাকে।

দিবাকর সামান্য গৃহস্থ—দরিদ্র ঘরের সন্তান। নায়েবী চাকরী পাইয়া কয়েক বৎসরের মধ্যে আপনার অবস্থা ফিরাইয়া লইয়াছিল। দরিদ্র প্রজার কিরূপে রক্তশোষণ করিতে হয় ভালরূপই শিক্ষা করিয়াছিল। তাহার অত্যাচারে কত নিরীহ প্রজা যে পথে বসিয়াছিল, মিথ্যা মামলা, জাল-জুয়াচুরির ফলে কত লোক যে সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছিল, কত লোকের গৃহদাহ এবং কত কুল-নারীর মর্য্যাদাহানি যে ঘটিয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা নাই। আজ তাহার এই দুঃসময়ে সে যদি কাহারও সহানুভূতি এবং করুণা উদ্রিক্ত করিতে না পারে, তাহা হইলে তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই। তাহাকে সেইস্থানে পড়িয়া কাঁদিতে দেখিয়া, যাহারা তথায় সমবেত হইয়াছিল, একে একে সরিয়া পড়িল। এমন দুঃখের সময় যাহার দুঃখ দেখিয়া, আহা বলিবার কেহ থাকে না

সত্যই তাহার মত দুর্ভাগ্য জগতে আর কেহ নাই।

অশ্বিনী হাজরা প্রভৃতিও চলিয়া গেল। যে বৃক্ষ আশ্রয় করিয়া তাহারা ফৌজদারী দণ্ডবিধির উদ্যত বজ্র হইতে আত্মরক্ষার ভরসায় বুক বাঁধিয়াছিল, সেই বৃক্ষই যখন ধূলায় পড়িয়া লুটাইতেছে, তখন তাহারা আর কোন্ আশায় তাহার মুখের দিকে চাহিয়া কালহরণ করিবে? সুতরাং তাহারাও চলিয়া গেল—যাইবার সময় কেহ একবার তাহাকে সম্ভাষণও করিল না। অপরাহ্ণে তমিজদ্দির স্কন্ধে ভর দিয়া দিবাকর স্বগ্রামের অভিমুখে রওনা হইল।

এদিকে রাত্রি আটটার সময় একখানি গো-শকট মন্থর-গমনে যখন পীরপুকুরের মধ্যে প্রবেশ করিল, তখন তাহার মধ্যে সিদ্ধেশ্বর রায়ের পার্শ্বে প্রসন্নকে দেখিয়া, যাহারা তাহার সম্ভাবিত কারাদণ্ডের উল্লাসে উৎফুল্ল হইয়া মজলিস গরম করিতেছিল, তাহাদের মুখগুলা শুকাইয়া এতটুকু হইয়া গেল।

ছমির হাঁটাপথে বহু পূর্ব্বে বাড়ী ফিরিয়া জাহ্নবীকে শুভ সংবাদ জ্ঞাপন করিয়াছিল। জাহ্নবী ভূশয্যায় পড়িয়া তাহার ইষ্টদেবতার নিকট মাথা খুঁড়িতেছিল। সেই সময়ে ছমির আসিয়া ডাকিল,—"মা। ওঠ! তোর ছেলে খালাস পেয়েছে!"

এ সংবাদে জাহ্নবী যেন তাহার মৃতদেহে প্রাণ পাইল। বিদ্যুৎবেগে উঠিয়া, পাগলিনীর ন্যায় আকুলকণ্ঠে কহিল, "কৈ আমার প্রসন্ন কৈ ছমির? আমার ছেলে?"

ছমির চোখের জল মুছিতে মুছিতে কহিল, "আসছে মা! সে ও বাড়ীর বড় কর্ত্তার সঙ্গে গাড়ীতে আসছে। আমি তোমায় খবর দিতে ছুটে এসেছি!"

জাহ্নবী অধীর আগ্রহে ছট্‌ফট্ করিতে করিতে সদর দরজায় দাঁড়াইয়া রহিল। রায় মহাশয় খালাস পাইয়া বাড়ী আসিতেছে শুনিয়া গ্রামের দরিদ্র নিম্নশ্রেণীর বহু নর-নারী তাহাকে দেখিবার জন্য মহোল্লাসে ছুটিয়া আসিল। অবশেষে সিদ্ধেশ্বরের বাড়ীর সম্মুখে গাড়ী থামিলে প্রসন্ন তাহা হইতে অবতরণ করিয়া যখন বাড়ী আসিল, তখন সত্যই তাহারা আনন্দে অধীর হইয়া জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। প্রসন্ন জাহ্নবীর স্নেহশীতল বক্ষে আশ্রয় লাভ করিয়া তাহার নিগ্রহের সকল ব্যথা ভুলিয়া গেল—জাহ্নবীর মুখে আবার হাসি ফুটিল।

আদালত প্রসন্ন রায় ডাকাত নয় বলিয়া তাহার ললাটে টিকিট আঁটিয়া ছাড়িয়া দিলেও, প্রকাশ দত্ত, হরি বিশ্বাস এবং দিবাকর সরকারের দুর্গতি এবং ভীষণ পরিণামের বিষয় স্মরণ করিয়া, অনেকেই বিশেষতঃ পীরপুকুরের যাহারা বিবিধ প্রকারে তাহার নির্য্যাতন-ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট ছিল, তাহারা কোনরূপেই নিঃশঙ্ক হইতে পারিল না। তাহাদের মনে সর্ব্বদাই শঙ্কা জাগিতে লাগিল, কোন্ দিন রাত্রিকালে তাহাদের বাড়ীতেও ডাকাত পড়িবে—তাহাদের ঘরগুলাও ঐ ভাবে দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিবে। প্রত্যুত তাহারা মহা অশান্তি, আশঙ্কা এবং উদ্বেগের মধ্যে তাহাদের জীবন যাপন করিতে লাগিল।

হরি বিশ্বাস তাহার পুকুরঘাটের কাঁটা তুলিয়া লইয়াছে—গ্রাম্য মুদী এখন যাচিয়া প্রসন্নকে জিনিস বিক্রয় করিতেছে—পথে ঘাটে তাহাকে দেখিলে লোকে রায় মহাশয় বলিয়া আপ্যায়িত করিয়া কুশল জিজ্ঞাসা করিতেছে—এক কথায় সকলেই তাহাকে সন্তুষ্ট করিতে পারিলেই যেন আপনাকে কৃতার্থ মনে করিতেছে। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া মনে হইতেছে, প্রসন্নর উপর এতদিন যে কুগ্রহের

কুপিত দৃষ্টি পড়িয়াছিল, এইবার তাহা অন্তর্হিত হইয়াছে।

এই ভাবে আরও ছয় মাস অতিবাহিত হইল। রাখাল চক্রবর্ত্তী এক মহা বিপদে পড়িলেন। তাঁহার ভগিনীর বিবাহ। প্রসন্ন রায় জাহ্নবীকে আশ্রয় দিয়া সমাজচ্যুত হইয়াছে। এখন এই বিবাহোপলক্ষে তাহাকে নিমন্ত্রণ করা হইবে কি না এই বিষয় লইয়া মহা গণ্ডগোল বাধিল। তাহাকে বাদ দিয়া কার্য্য করিতেও সাহসে কুলাইতেছে না, আবার তাহাকে গ্রহণ করিলেও হিন্দুয়ানী বজায় থাকে না। এই গুরুতর বিষয়ের মীমাংসা করিবার জন্য রাখাল গোপনে এক পরামর্শ সভা আহ্বান করিলেন। সে দিন যাঁহারা আর্কফলা নাড়িয়া তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়াছিলেন, আজ তাঁহারা অধোবদনে নীরব রহিলেন। আজ স্বাধীনভাবে অভিমত ব্যক্ত করিতে সকলেরই বুক কাঁপিতেছিল। সে দিন চোখ রাঙ্গাইয়া যাহাকে সমাজের গণ্ডির বাহিরে তাড়াইয়া দিয়াছিল, আজ তাহারই রক্তচক্ষু দেখিয়া তাহারা বিশ্বসংসার অন্ধকার দেখিতেছিল।

অবশেষে শিরোমণি মহাশয় কহিলেন,—"এক কাজ কর, সিদ্ধেশ্বরকে ধরে বৌটার একটা প্রায়শ্চিত্ত করে দাও, তার কথা প্রসন্ন অগ্রাহ্য করতে পারবে না। তা ছাড়া ত আর উপায় দেখি না। যে সব কাণ্ড দেখছি, তাতে আর ওকে বেশী চটান বুদ্ধিমানের কাজ হবে না।"

অপর একজন কহিল,—"শুধু খোঁড়াকে নিমন্ত্রণ করে এস। কৌশলে কাজ সার।"

অনেকে এই শেষোক্ত মতই সমর্থন করিল। তদনুসারে রাখাল যখন প্রসন্নকে নিমন্ত্রণ করিতে উপস্থিত হইল, তখন সকল কথা শুনিয়া প্রসন্ন হাসিয়া কহিল,—"যেতে আমার কোনই আপত্তি নাই—তবে আমি মায়ের ছেলে, মাকে ফেলে কেমন করে যাই বলুন। আর যদি বলেন আমি মেয়ে নেমন্তন্ন বাদ দিয়েছি, তা হলে এক কাজ করুন, কাল আমার এই কুঁড়েয় এসে আপনারা সকলে মিলে আহার করে যান, আমি আহ্লাদের সহিত আপনার বাড়ীর ছাঁচতলায় পাতা পেতে খেয়ে আসবো।"

রাখাল মাথা চুলকাইয়া আম্‌তা আম্‌তা করিয়া কহিল,—"হাঁ—তা—সে—আর বেশী কথা কি! তবে কি জান বাবাজী! এই বলছিলাম কি জান —এই বামুন পণ্ডিত মশাইরা বলছিলেন কি জন—এই—"

প্রসন্ন হাসিয়া কহিল,—"যা বলবেন বুঝেছি—তার চাইতে আমি চিরদিনই এম্‌নি সমাজের বাইরে পড়ে থাকবো। কি অপরাধে প্রায়শ্চিত্ত করবেন তিনি শুনি? এমন কি মহাপাপ করেছেন, যার জন্যে তাঁকে এই অপমান সহ্য করতে হবে? আমি নাম করতে চাই নে কিন্তু এই গ্রামের মধ্যে এমন অনেক স্ত্রীলোক আছে, যাদের ব্যভিচারের কথা আজ আর গোপন নাই, কই তাদের হাতে খেয়ে ত আপনাদের জাত যায় না—হিন্দুধর্ম্মও লোপ পায় না?"

প্রসন্নর চক্ষু আরক্ত হইয়া উঠিল। রাখাল চক্রবর্ত্তী বিপদ গণিয়া কহিল,—"কি জান বাবাজী! আমার কোন দায় নাই—ঐ পাঁচজনে বল্‌ছে—আমি তোমার বাড়ী খেয়ে যাব, তুমি অটল দাদার ছেলে, তুমি কি আমাদের পর? তোমাকে বাদ দিয়ে কোন কাজ ক'রতে আমার বড় কষ্ট হয়।"

প্রসন্ন শান্তস্বরে কহিল,—"খুড়ো মশাই আপনি দুঃখিত হবেন না—আপনার উপর আমার কোন রাগ নাই। খোঁড়াটা এক পাশে যেমন পড়ে আছে, তেমনিই থাক, সে তার মায়ের অপমান করে কারো বাড়ী পাত পাততে যাবে না।"

রাখাল চক্রবর্ত্তী হতাশ হইয়া ফিরিয়া গেল। সেই দিন সন্ধ্যার সময় সকলে মিলিয়া সিদ্ধেশ্বর রায়কে ইহার একটা নিষ্পত্তি করিয়া দিতে ধরিয়া বসিল। তিনিও প্রায়শ্চিত্ত করিবার প্রস্তাব সমর্থন করিলেন না। সুতরাং রাখাল চক্রবর্ত্তী বড়ই বিপন্ন হইয়া পড়িল। অবশেষে অনন্যোপায় হইয়া বিবাহের দিন পরিবর্ত্তন করিল।

এই ঘটনার কয়েক দিন পরে প্রসন্ন কোন কার্য্যোপলক্ষে প্রাতঃকালে দৌলতপুর গিয়াছিল, অপরাহ্ণে বাড়ী ফিরিতেছিল। সন্ধ্যা সমাগত দেখিয়া একটু দ্রুতই আসিতেছিল। এখনও তাহাদের গ্রাম প্রায় অর্দ্ধক্রোশ। নির্জ্জন প্রান্তর-পথে একাকী চলিতে চলিতে মনের আনন্দে গান গাহিতেছিল। সহসা পশ্চাতে অদূরে দ্রুত অশ্বপদশব্দ শুনিয়া মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইল। দেখিল মাঠের উপর দিয়া একটী অশ্ব নক্ষত্রবেগে ছুটিয়া আসিতেছে। তাহার উপর যে আরোহী বসিয়া আছে, প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াও তাহার বেগ সংযত করিতে পারিতেছে না। চক্ষের পলক ফেলিতে না ফেলিতে সেই উদ্দাম তুরঙ্গম তাহার আরোহীকে পৃষ্ঠে লইয়া তাহার পার্শ্ব দিয়া চলিয়া গেল। মুহূর্ত্তের জন্য উভয়ের দৃষ্টি উভয়ের মুখের উপর পড়িল। সেই জনমানবশূন্য প্রান্তর-পথে সমাগত সন্ধ্যার অস্পষ্টালোকে পরস্পর পরস্পরকে চিনিয়া শিহরিয়া উঠিল। অশ্বারোহী প্রকাশ দত্ত।

সম্মুখেই একখণ্ড উচ্চ জমি, তাহার পরেই এক প্রকাণ্ড অশ্বত্থ বৃক্ষ—তাহার নিম্ন দিয়া তাহাদের গ্রামে যাইবার পথ। ঐ বৃক্ষটা অতিক্রম করিতে পারিলেই তাহাদের গ্রামের সীমানায় যাওয়া যায়। প্রসন্ন সেই পথে অগ্রসর হইল। সহসা একটা কিসের শব্দে সে স্তম্ভিত হইয়া মুহূর্ত্তের জন্য দাঁড়াইল। তাহার পরই দেখিল, আরোহীশূন্য ক্ষিপ্ত অশ্ব তাহারই দিকে ছুটিয়া আসিতেছে। প্রসন্ন সভয়ে এক পার্শ্বে সরিয়া দাঁড়াইল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, প্রকাশ অশ্ববেগ সংযত করিতে পারিতেছিল না—অশ্ব উদ্দামগতিতে ছুটিয়া চলিয়াছিল। উচ্চ ভূখণ্ড হইতে সবেগে অবতরণ কালে, সে তুরঙ্গপৃষ্ঠ হইতে ছিটকাইয়া পড়িয়া গেল। ঘোড়াটা লম্বমান বৃক্ষকাণ্ডে বাধা পাইয়া আরও ভীত হইয়া মাঠের উপর দিয়া ছুটিয়া চলিল। প্রসন্ন যথাশক্তি ত্বরিতপদে অগ্রসর হইয়া সম্মুখে যে দৃশ্য দেখিল, তাহাতে কিয়ৎক্ষণের জন্য সে কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া পড়িল।

সম্মুখে কয়েক হাত মাত্র ব্যবধানে তাহার পরম শত্রু—তাহার সকল দুর্দ্দশার মূলকারণ—তাহার নির্য্যাতনকারী রক্তাক্তকলেবরে ধরণীর ধূলায় লুণ্ঠিত। তাহার সংজ্ঞা লোপ পাইয়াছে—মস্তকের ক্ষত হইতে শোণিতস্রাব হইতেছে—অসাড় দেহটা মাটীতে পড়িয়া গড়াগড়ি যাইতেছে। সে এখন কি করিবে? অরাতির দুর্গতি দেখিয়া মনের আনন্দে হাসিতে হাসিতে কি চলিয়া যাইবে? অমন শত্রুর এমন অবস্থা দেখিয়া কাহার না হৃদয় আনন্দে নাচিয়া উঠে?

প্রসন্ন আরও কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া তাহার পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইল। এই প্রকাশ দত্তই একদিন তাহাকে ধরিয়া লইয়া গিয়া প্রহারে জর্জ্জরিত করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছিল—এই প্রকাশ দত্তের জন্যই তাহার মাতৃরূপিণী জাহ্নবী আজ লাঞ্ছিতা, কলঙ্কিতা, গৃহ হইতে বহিষ্কৃতা—এই লোকই এক-দিন তাহার ক্ষেতের শস্য নষ্ট করিয়া তাহাকে অনশনে মারিতে উদ্যত হইয়াছিল—তাহার বাড়ীতে ডাকাতি করিতে গিয়াছিল—সকল কথাই তাহার মনে পড়িল। সে পাশ কাটাইয়া চলিয়া যাইতেছিল—দুই এক পদ অগ্রসরও হইল কিন্তু

পারিল না। সে যত বড় শত্রুই হউক, তাহার যত অনিষ্টই সে করুক, হয় ত সারিয়া উঠিলে এখনও তাহার অনিষ্ট চেষ্টা করিবে, তথাপি তাহার এই সঙ্কটকালে—তাহার জীবন-মরণের এই সন্ধিক্ষণে, নির্জ্জন পল্লী-প্রান্তরে তাহাকে এই অবস্থায় ফেলিয়া যাইতে তাহার হৃদয়ের তাবৎ উচ্চবৃত্তিগুলি বিদ্রোহোন্মুখ হইয়া উঠিল। মানুষের প্রতি মানুষের—বিপন্নের প্রতি হৃদয়বান্ ব্যক্তির যে একটা কর্ত্তব্য আছে—সে সেই কর্ত্তব্যের আহ্বান অগ্রাহ্য করিতে পারিল না। সে যে শত্রু তাহা সে ভুলিয়া গেল—দেখিল, তাহারই মত একজন মানুষ অসহায় অবস্থায় মরণের কোলে ঢলিয়া পড়িতেছে—আশু সাহায্য না পাইলে তাহার জীবনের স্পন্দন চিরদিনের জন্য থামিয়া যাইবে। প্রসন্ন ফিরিয়া দাঁড়াইল—মনের মধ্যে হিংসা দ্বেষ বা রোষের শেষ চিহ্নটী পর্য্যন্ত জোর করিয়া মুছিয়া ফেলিয়া ধূল্যবলুণ্ঠিত প্রকাশের পার্শ্বে উপবেশন করিয়া একবার ভাল করিয়া তাহাকে পরীক্ষা করিয়া দেখিল, তাহার পর উঠিয়া দাঁড়াইয়া চারিদিকে আকুলনেত্রে চাহিল। অদূরে একটা ক্ষুদ্র জলাশয় ছিল, লাঠিতে ভর দিয়া সেই জলাশয়-তটে উপস্থিত হইয়া তাহার উত্তরীয়খানা ভিজাইয়া জল লইয়া আসিল, তাহার পর লুপ্তসংজ্ঞ প্রকাশের মস্তক ক্রোড়ে করিয়া বসিয়া তাহার চৈতন্য-সম্পাদনের চেষ্টা করিতে লাগিল। সে সময়ে তাহার মুখে যে আকুলতা এবং উদ্বেগ ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহা দেখিলে কে বলিবে এই লোকের হাতে ঐ খঞ্জ যুবক কোন দিন অশেষ লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছিল।

চোখে মুখে জল সিঞ্চন করাতে ধীরে ধীরে প্রকাশের লুপ্ত সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিতে লাগিল। তখনও তাহার মাথা হইতে শোণিতধারা ক্ষরিত হইতেছে দেখিয়া, সে রক্তপ্রবাহ কোনরূপে রুদ্ধ করিতে না পারিয়া প্রসন্ন তাহার জলসিক্ত উত্তরীয়-খানা দ্বিখণ্ডিত করিয়া সেই ক্ষতস্থানের উপর ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দিল। প্রসন্ন যখন এই কার্য্যে ব্যাপৃত ছিল, সেই সময়ে সেই পথে দৈবক্রমে শিরোমণি মহাশয়কে সঙ্গে করিয়া রাখাল চক্রবর্ত্তী মৌগাছা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিল। তাহারা দূর হইতে এই দৃশ্য দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল। আরও নিকটে আসিয়া যখন দেখিল আহত ব্যক্তি প্রকাশ দত্ত এবং তাহার শুশ্রূষাকারী প্রসন্ন রায়, তখন তাহাদের আর বিস্ময়ের অবধি রহিল না। শিরোমণির চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল, তিনি অধীরকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন,—"প্রসন্ন? তুই মানুষ না দেবতা!"

ইতিমধ্যে প্রকাশের বেশ জ্ঞান হইয়াছিল। চক্ষু মেলিয়াই দেখিল, প্রসন্ন রায় তাহাকে কোলে করিয়া বসিয়া আছে। এ কি সত্য? সে যেন তাহার চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না। প্রসন্ন কাতরকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল,—"প্রকাশ দা বড় কষ্ট হচ্ছে কি?"

প্রকাশ লজ্জায় চক্ষু বুজিল। তাহার গণ্ড বহিয়া কয়েক ফোঁটা অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। তাহার পরই আবার তাহার চৈতন্য লোপ পাইল। রাখাল ছুটিয়া গ্রামে গিয়া লোকজন লইয়া আসিল, তখন তাহাকে সেই অবস্থাতেই বাড়ী লইয়া গিয়া ডাক্তারকে সংবাদ দিল। রাত্রি আটটার সময় তাহার জ্ঞান হইল।

অশ্ব হইতে সবেগে পতিত হওয়ায়, প্রকাশের দেহের কোন অস্থি ভগ্ন না হইলেও আঘাত খুব গুরুতরই হইয়াছিল। দেহের নানাস্থানে কাটিয়া গিয়াছিল। পৃষ্ঠ ও কটিদেশের বেদনায় সে অস্থির হইয়া ক্রমাগত চীৎকার করিতে লাগিল।

পরদিনও প্রকাশ শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিতে পারিল না। তাহার হিতৈষী বন্ধুবান্ধব গাত্রবেদনা উপশমের জন্য তাহাকে সুরা সেবনের অনুরোধ করিল। প্রকাশ দৃঢ়তার সহিত সে সৎ পরামর্শে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া নীরব হইয়া রহিল।

অপরাহ্নে তাহার জ্বর হইল। ডাক্তার একটু চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। দুই দিন অঘোরে পড়িয়া থাকিবার পর, জ্বর ছাড়িয়া গেল। এ কয়দিন সে কাহারও সহিত ভাল করিয়া কথা কহে নাই—এমন কি তাহার অন্তরঙ্গ বন্ধুবান্ধব তাহাকে দেখিতে আসিলেও, তাহাদের সহিত প্রাণ খুলিয়া আলাপ করে নাই। তাহাকে সর্ব্বদাই চিন্তাচ্ছন্ন থাকিতে এবং কেমন যেন একটা অস্বস্তি অনুভব করিতে দেখা গিয়াছিল।

এইভাবে আরও চারি পাঁচ দিন গত হইল। প্রকাশের জ্বর ছাড়িয়াছে, গাত্রবেদনাও অনেক কমিয়াছে। আজ সে বাটীর ভিতর হইতে বাহিরে আসিয়া বসিয়াছে। তাহার মণ্ডপ সঙ্গীরা তাহাকে সুস্থ দেখিয়া উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। সকলেই ভাবিতে লাগিল, আজ আবার তাহার বৈঠকখানায় মদের মজলিস বসিবে, তাহাদের শুষ্ক কণ্ঠতালু বারুণীরসে সিক্ত হইবে। কিন্তু অর্দ্ধ ঘণ্টা বসিয়া থাকিবার পরও বাবু যখন সে প্রসঙ্গ উত্থাপন করিল না, তখন তাহারা অধৈর্য্য হইয়া উঠিল। অবশেষে তাহারা বিরক্ত হইয়া একে একে উঠিয়া গেল।

তাহাদের প্রস্থানের পর প্রকাশ যেন একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। এতদিন যাহাদের সঙ্গ আনন্দ এবং তৃপ্তির সহিত উপভোগ করিত, আজ তাহাদিগকে দেখিয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গ যেন বিষের জ্বালায় জ্বলিতেছিল। তাহারা কতক্ষণে উঠিয়া যাইবে, সে নিঃসঙ্গ হইবে, এইটাই সে যেন অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করিতেছিল। কেন? ঐ সকল অন্তরঙ্গ বন্ধুর সঙ্গ সহসা এত তিক্ত হইয়া উঠিল কেন?

আছে—ইহার কারণ আছে। মানুষের জীবনে এমন এক একটা সময় আসে যখন সামান্যমাত্র একটা কারণ উপলক্ষ করিয়া তাহার জীবনের গতি ফিরিয়া যায়। দিবারাত্র চোখের উপর এমন কত শত ঘটনা ঘটিতেছে, যাহা কোন দিন হৃদয়ে সামান্য একটী রেখাপাত করিতেও সমর্থ হয় না, কিন্তু সময়-বিশেষে এমন এক আধটী তুচ্ছ ঘটনা ঘটে যাহার ফলে মনের মধ্যে গভীর খাদের সৃষ্টি হয়, হৃদয়ের সমস্ত তন্ত্রী ঝঙ্কার দিয়া বাজিয়া উঠে। গভীর কামান গর্জ্জনেও যাহার সুপ্তিভঙ্গ হয় না—একটী লোষ্ট্র-নিক্ষেপের শব্দে সে জাগিয়া বসে।

প্রকাশ দত্তেরও তাহাই হইয়াছে। তাহার মনে একটা দারুণ নির্ব্বেদ আসিয়াছে। সেই দিন সন্ধ্যা-কালে, পল্লীপ্রান্তে মুক্ত আকাশতলে চক্ষুরুন্মীলন করিয়া যাহা দেখিয়াছিল, আজও তাহা ভুলিতে পারে নাই—যাহা শুনিয়াছিল আজও তাহা বিস্মৃত হইতে পারে নাই। গ্রামের আর যে কেহ বা অপরিচিত কোন পথের পথিক তাহাকে যদি সে দিন ঐ ভাবে সেবা করিত, তবে তাহার মধ্যে বিস্মিত হইবার কিছুই থাকিত না। প্রেম, ভাল-বাসা, কর্ত্তব্য বা করুণার আহ্বানে এমন ত অনেকেই করিয়া থাকে কিন্তু প্রসন্ন রায়—ঐ দীন দুঃখী বিকলাঙ্গ যুবক, যে আজ তাহারই জন্য উৎপীড়িত, লাঞ্ছিত, সমাজ হইতে বহিষ্কৃত—যাহার অঙ্গে তাহার প্রহারের দাগ এখনও মিলায় নাই—যাহার হৃদয়ের ক্ষত এখনও সে খোঁচাইয়া নূতন করিবার জন্য ঘুরিয়া বেড়াইতেছে—সেই আজ মূর্ত্তিমান করুণার মত—অন্তরঙ্গ সুহৃদের মত—উপকৃত বান্ধবের মত তাহার মরণাহত দেহকে কোলে করিয়া বসিয়া সেবা করিতেছে—সেই দরিদ্র তাহার সবে মাত্র সম্বল

উত্তরীয়খানি ছিঁড়িয়া তাহার মাথায় পটী বাঁধিয়া দিতেছে ! এ দৃশ্য যে স্বপ্নেরও অগোচর ! লাঞ্ছিত নিগৃহীত শত্রুর—শত্রুর উপর এই যে আচরণ, এ বুঝি স্বর্গেও দুর্লভ !

তাহার পর প্রসন্ন যখন ব্যাকুলকণ্ঠে ডাকিল,—"প্রকাশ দা বড় কষ্ট হচ্ছে ?" তখন প্রকাশের বুকখানা যেন মোচড দিয়া উঠিল—সে আর সহ্য করিতে পারিল না—আবার তাহার চৈতন্য লোপ পাইল। তাহার পর বাড়ী গিয়া জ্ঞান হইয়া অবধি, সে ক্রমাগত স্মরণ করিবার চেষ্টা করিয়াছে—সত্যই কি সে প্রসন্ন রায় ? এও কি কখন সম্ভব ? মানুষ কি এমন করিয়া সব ভুলিয়া, সব মুছিয়া ফেলিয়া, তাহার মত শত্রুকে কোলে করিয়া বসিতে পারে—তাহার জীবন রক্ষা করিবার জন্য অমন করিয়া প্রাণ ঢালিয়া সেবা করিতে পারে ?

দেবতার পদে দানব মস্তক অবনত করিল ! করুণার উচ্ছ্বাসে ঘৃণা, জিঘাংসা ভাসিয়া গেল ! কোমলতার সংস্পর্শে পাষাণ গলিয়া জল হইল। প্রসন্নই জয়লাভ করিল। প্রকাশ আগাগোড়া তাহার আচরণ স্মরণ করিয়া অনুতাপে দগ্ধ হইতে লাগিল—এত দিন ঐশ্বর্য্যগর্ব্বে মত্ত হইয়া, অসৎ প্রকৃতির তাড়নায়, কু-লোকের পরামর্শে নিরীহ নির্দ্দোষীর প্রতি যে সকল অত্যাচার করিয়াছিল, রোগশয্যায় পড়িয়া তাহারই আলোচনা করিয়া কেবলই ভাবিতেছিল, এখন কি আর তাহার প্রতিকার করা যায় না ? যে পথে এতদিন চলিয়াছে, তাহা হইতে কি আর ফেরা যায় না ? কৈ সে কার্য্যে সেও ত নিজে সুখী হয় নাই—মাতা, পত্নী, আত্মীয় স্বজন কাহাকেও ত সুখী করিতে পারে নাই ? কিন্তু কেমন করিয়া এই সকল মহানর্থের প্রতিকার করিবে—সে যে সকল ক্ষতি করিয়াছে, তাহার পূরণ করিবে ? সেই কথাই আজ কয় দিন ভাবিতেছে।

তথাকথিত বন্ধুদের সঙ্গ সেইজন্যই আজ তাহার বিষবৎ জ্ঞান হইতেছিল। তাহারা উঠিয়া গেলে সে যেন নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। কত কথাই সে ভাবিল, কত পন্থাই উদ্ভাবন করিল কিন্তু কোনটাই তাহার মনঃপূত হইল না। ভাবিতে ভাবিতে কখন যে সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছিল, নিশাসমাগমের অন্ধকার আসিয়া কখন যে দিবসের আলোককে দূরে অপসারিত করিয়া ঘনীভূত হইয়াছিল, তাহা সে বুঝিতেও পারে নাই, অবশেষে কাঙ্গালীচরণ আসিয়া যখন আলোক জ্বালিয়া দিল, তখন তাহার জ্ঞান হইল। অবশেষে একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া, অনেকটা লঘুহৃদয়ে রাত্রি আটটার সময় বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল।

উপসংহার

পরদিন রাত্রি প্রভাতে বিশ্বপ্রকৃতি যখন নবোদিত রবির হেমাভ কিরণজালে বিমণ্ডিত হইয়া হাসিতেছিল, সুষুপ্তি সম্ভোগে বিগতশ্রম হইয়া পীরপুকুরের অধিবাসীরা যখন গৃহস্থালীর কর্ম্মে আত্মনিয়োগ করিতেছিল, সেই সময়ে প্রকাশ দত্ত গ্রামের মুরব্বি সিদ্ধেশ্বর রায় এবং শিরোমণি মহাশয়কে সঙ্গে লইয়া ধীরে ধীরে গ্রামপ্রান্তে প্রসন্ন রায়ের পর্ণকুটীরের অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে।

তাঁহাদের তিন জনকে এই প্রাতঃকালে প্রসন্নর বাড়ির দিকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া গ্রামের অনেকেই কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাঁহাদের দিকে চাহিয়া রহিল—কেহ কেহ বা একটু দূরে থাকিয়া তাঁহাদের অনুসরণ করিতে লাগিল।

প্রসন্ন সবে মাত্র তাহার প্রাতঃকৃত্য সারিয়া অপরাপর দিবসের ন্যায় তাহার বেলতলায় আসিয়া বসিবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময়ে তদভিমুখে ঐ তিন জনকে আসিতে দেখিয়া

উন্মুখ আগ্রহে তাঁহাদের দিকে চাহিয়া রহিল। অবশেষে তাঁহারা আরও সমীপবর্ত্তী হইলে প্রসন্ন সিদ্ধেশ্বর রায়কে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"দাদা এত সকালে কি মনে করে?"

সিদ্ধেশ্বর প্রকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন,—"প্রকাশ তোমার নিকট এসেছে—কি তার দরকার।"

প্রসন্ন একটু হাসিয়া কহিল,—"কেন, খোঁড়ার আর একটা পা ভাঙ্গতে না কি? তা আপনাদের কষ্ট দিয়ে সঙ্গে আনবার কি দরকার ছিল? প্রকাশ একাই ত সে কাজ পার তো।"

সিদ্ধেশ্বর এবং শিরোমণি মহাশয় হাসিয়া উঠিলেন। প্রকাশও হাসিবার চেষ্টা করিল কিন্তু তাহার মুখে হাসি ফুটিল না—তৎপরিবর্ত্তে তাহার বিষণ্ণ মলিন মুখে বেদনার চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল। মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া প্রকাশ কহিল,—"না ভাই আজ আর আমি তোমার পা ভাঙ্গতে আসি নি—আজ তোমার ঐ খোঁড়া পায়ের ধুলো মাথায় দিয়ে ধন্য হতে এসেছি।"

তাহার পর প্রসন্ন আর কিছু বলিবার পূর্ব্বেই প্রকাশ সত্য সত্যই খোঁড়া প্রসন্নর পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া সজলনেত্রে কহিল,—"আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাইতে এসেছি! অনেক অত্যাচার তোমার ওপর করেছি—অনেক কষ্ট তোমায় দিয়েছি—পার যদি আমায় মার্জ্জনা কর—আমায়—"

বাধা দিয়া শশব্যস্তে প্রসন্ন কহিল,—"ছাড় ছাড় প্রকাশ দা! পা ছাড়!"

প্রকাশ কহিল,—"না তা হবে না। ক্ষমা তোমায় করতেই হবে! আমার মোহ ভেঙ্গেছে—আমার ঐশ্বর্য্য গর্ব্ব মান অভিমান ধূলোয় লুটিয়ে দিয়ে, আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে এসেছি! তুমি যে কত বড়—তুমি যে কত উদার মহৎ, সেদিন তার পরিচয় পেয়েছি! আমি রক্তাক্ত দেহে পড়েছিলাম, তুমি যদি আমায় কোন সাহায্য না করে চলে আসতে, কেউ তোমায় দোষী করতে পারত না। আমি যে তোমার কত বড় শত্রু তুমি জানতে—আমি বেঁচে থাকতে তোমার জীবনে যে শান্তি নাই, আমি ভাল হয়ে উঠলে আবার যে তোমার সর্ব্বনাশ করব, তাও তুমি জান্তে—তবু তুমি আমার সেই অসহায় অবস্থায় আমায় ফেলে আসতে পার নাই—তুমি সেদিন সব ভুলে শত্রুকে কোল দিয়েছিলে—যাকে গলা টিপে মেরে নিশ্চিন্ত হতে পারতে, তাকে মৃত্যুর মুখ থেকে টেনে এনেছিলে—তার রক্তপাত বন্ধ করবার জন্য তোমার বস্ত্র ছিঁড়ে খণ্ড খণ্ড করে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিয়েছিলে—সেইদিনই তুই আমাকে জয় করেছিস—আমার গর্ব্ব অহঙ্কার চূর্ণ করে দিয়েছিস। বল ভাই আমার সব অপরাধ মার্জ্জনা করলি?"

প্রকাশ এবার কাঁদিয়া ফেলিল। প্রসন্ন আর স্থির থাকিতে পারিল না। তাহার পার্শ্বে বসিয়া তাহার কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া ধরিল। তাহার চক্ষুও অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিল। তখন উভয়ের সেই সম্মিলিত অশ্রুধারায় যে গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমতীর্থের সৃষ্টি হইল তাহার যুক্তবেণীর পবিত্র ধারায় মনের মধ্যে যে আবর্জ্জনার স্তূপ পুঞ্জীভূত হইয়াছিল তাহা কোথায় ভাসিয়া গেল!

এই দৃশ্য দেখিয়া সেখানে যাহারা উপস্থিত ছিল, সকলেরই চক্ষু সজল হইয়া উঠিল। শিরোমণি মহাশয় এ সুযোগ ছাড়িলেন না, তিনি অগ্রসর হইয়া কহিলেন,—"সেদিন যা দেখেছি, চোখে না দেখলে কখনও বিশ্বাস করতাম না। মানুষের বিপদে আপদে মানুষেই সাহায্য করে—এর ভিতর নূতনত্ব কিছুই নাই কিন্তু বাবা প্রসন্ন তোমার মত শত্রুর সেবা ক'রতে বুঝি দেবতারাও পারবে না!

হংসেশ্বরী মন্দির—ত্রিবেণী।
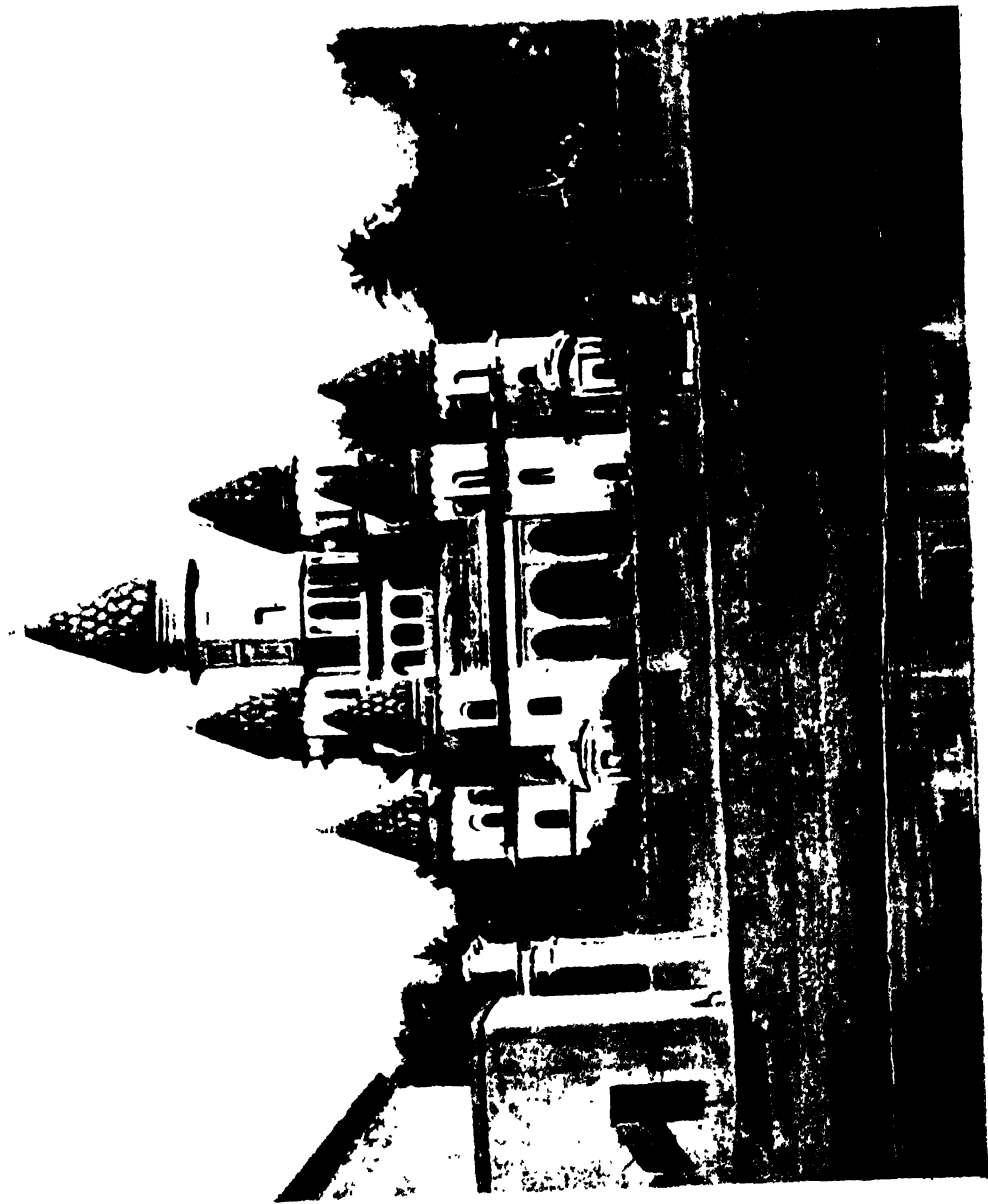
হাঁ, প্রসন্ন খোঁড়া হ'লে কি হয়, একটা মানুষের মত মানুষ।"

প্রকাশ কহিল—"তা হ'লে শিরোমণি মশাই! তার মনুষ্যত্বের আর অপমান করবেন না—তাকে সমাজের বুকে তুলে নিয়ে আপনাদের মনুষ্যত্বের পরিচয় দিন।"

শিরোমণি গলা ঝাড়িয়া কহিলেন,—"হাঁ, সে ব্যবস্থা আমরা ক'রছি। চল সিদ্ধেশ্বরের বৈঠক-খানায়, সেইখানেই সব কর্ত্তাবার্ত্তা হবে।"

প্রকাশ উঠিয়া কহিল,—"আমার এখনও একটু কাজ বাকি আছে। আপনারাও আমার সঙ্গে আসুন।" এই বলিয়া প্রসন্নর হাত ধরিয়া তাহার বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল। সিদ্ধেশ্বর ও শিরোমণি মহাশয় তাহাদের অনুসরণ করিলেন।

জাহ্নবী এতক্ষণ সদর দ্বারের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ছিল। তাঁহাদিগকে বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়া সে একটু দ্রুতপদেই দাওয়ার দিকেই অগ্রসর হইয়াছিল। প্রকাশ কহিল,—"দিদি! যাবেন না, আজ আর আমায় দেখে ভয়ে সরে যাবার দরকার নাই। যে প্রকাশ দত্ত আপনার উপর এতদিন অত্যাচার করেছিল, সে সেদিন ঘোড়া থেকে পড়ে মরেছে, তাকে আর কোন দিন এ জগতে দেখতে পাবেন না—আর আজ যাকে দেখছেন, তাকে আমার এই ভাইটী তার দেবত্বের স্পর্শ দিয়ে নূতন ক'রে ভেঙ্গে চুরে গড়েছে। আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাইতে এসেছি।" এই বলিয়া প্রকাশ জাহ্নবীর চরণধূলি লইয়া মাথায় দিল।

জাহ্নবী কোন কথা কহিল না। সঙ্কুচিত হইয়া একপার্শ্বে সরিয়া দাঁড়াইল। প্রকাশ সেইস্থানে বসিয়া পড়িয়া কহিল,—"কি দিদি! আমায় ক্ষমা ক'রতে পারলে না? আমার অপরাধ ভুলতে পারলে না? প্রসন্ন তোমার যেমন ছেলে, আমিও তোমার তেমনি আর একটী অভাগা সন্তান! আমায় ক্ষমা কর মা! আমি বাপের অগাধ সম্পত্তি পেয়ে উচ্ছৃঙ্খল হ'য়েছিলাম। ধনের গর্ব্ব আমায় অন্ধ করেছিল, টাকার গরমে মনে করতাম ঐশ্বর্য্যের বিনিময়ে সব পাওয়া যায়—বিশ্বসংসার তার চরণে লুণ্ঠিত হয় কিন্তু সে গর্ব্ব আমার চূর্ণ হয়েছে—আমার জ্ঞানচক্ষু ফুটেছে—মা টাকায় বিশ্বের ধনরত্ন পাওয়া যায় কিন্তু বিশ্বের তাবৎ ধনরত্ন দিলেও সতীর সতীত্ব পাওয়া যায় না।"

প্রকাশ আর বলিতে পারিল না। তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল। জাহ্নবী সেইস্থানে উপবেশন করিয়া তাহার মাথায় হাত দিয়া কহিল,—"আর তোমার ওপর আমার কোন রাগ দ্বেষ নাই—তোমার যে সুমতি হয়েছে দেখে সত্যই আমি সুখী হলাম।"

প্রকাশ পুনরায় তাহার পদধূলি লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, তাহার পর পকেট হইতে একটী নোটের তাড়া বাহির করিয়া বিস্ময়বিমুগ্ধ নির্ব্বাক দণ্ডায়মান সিদ্ধেশ্বর রায়ের হস্তে গুঁজিয়া দিয়া কম্পিতকণ্ঠে কহিল,—"আপনাকে কষ্ট দিয়ে এনেছি, এ বিষয়টার একটা ব্যবস্থা করবার জন্যে।"

সিদ্ধেশ্বর আরও বিস্মিত হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। প্রকাশ কহিল,—"আমারই জন্য এই ব্রাহ্মণ বিধবার এই দুর্গতি। আজ আমি অকপটে আমার পাপ ব্যক্ত করছি—হয় ত আপনারা আমায় ঘৃণা করবেন—তা করুন, সত্যই আমি ঘৃণার পাত্র। আমার জন্যই আজ ইনি শ্বশুরকুলের আশ্রয় থেকে বঞ্চিত—প্রসন্ন তাঁকে আশ্রয় দিলেও, সে গরীব—তার এমন বিষয় সম্পত্তি নাই, যাতে দুই জনের আজীবন সুখে চলে! ঐ টাকাটায় মার নামে কিছু জমি খরিদ করে দিন—যাতে তাঁর কোন কষ্ট না হয়।"

জাহ্নবী শিহরিয়া উঠিয়া হাত নাড়িয়া কহিল,—"না, না, টাকা আমি চাই না—আমার প্রসন্ন বেঁচে থাক, আমার কোন অভাব নাই।"

প্রসন্ন দৃঢ়তার সহিত কহিল,—"না কিছুতেই তা হতে পারে না। আমার যা আছে, তাতে শাক-ভাতের অভাব কোন দিনই হবে না। প্রকাশ দা! ও টাকা তুমি ফিরিয়ে নিয়ে যাও।"

ইতিমধ্যে সিদ্ধেশ্বর নোটগুলি গণিয়া কহিলেন,—"এ যে দু'হাজার টাকা প্রকাশ! এ—"

বাধা দিয়া প্রকাশ কহিল,—"দাদা! বাপের পয়সা হাতে পেয়ে অমন অনেক টাকাই অসৎ কাজে উড়িয়ে দিয়েছি! আমি জানি প্রসন্ন এ টাকা নিতে সম্মত হবে না—সেইজন্যে আপনাকে এবং শিরোমণি মশাইকে সঙ্গে এনেছি! আমি যাতে একটা সৎকাজে এই টাকাটা ব্যয় করতে পারি, আপনারা তার একটা ব্যবস্থা করে দিন।"

শিরোমণি কহিলেন,—"এক কাজ কর। বৌমার নামে একটী শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করে, দেব-সেবার কিছু জমি কিনে দাও। প্রসন্ন তার সেবাইত থাক্‌বে—তা হলেই তোমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে।"

এই প্রস্তাব শুনিয়া উৎফুল্ল হইয়া প্রকাশ কহিল,—"উত্তম কথা। এর জন্যে যদি আরও টাকার প্রয়োজন হয়—আমি তা দেব। এ ব্যবস্থায় বোধ হয় আর কারও অমত হবে না?"

প্রসন্ন কহিল,—"না, তোমার এ শুভ সঙ্কল্পে আর আমি বাধা দেব না।"

এই সকল সংবাদ গ্রামে যখন রাষ্ট্র হইল, তখন একদল লোক মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। তাহারা পঞ্চমুখ হইয়া প্রকাশ দত্তের এই মতিচ্ছন্নতার নিন্দা করিয়া তাহাকে গালি পাড়িতে লাগিল। এই সংবাদে সর্ব্বাপেক্ষা আনন্দিত হইলেন প্রকাশের গর্ভধারিণী আর তাহার কিশোরী পত্নী—আর দুইটী লোক—তাহার জোতদার ছমির সেখ এবং দৌলতপুরের হারু সর্দ্দার।

বলা বাহুল্য, ইহার পর প্রসন্ন বা জাহ্নবীকে লইয়া আর কোন গোলযোগ উপস্থিত হয় নাই। রাখাল চক্রবর্ত্তীর ভগিনীর বিবাহোপলক্ষে উদার হিন্দুসমাজের কোলে আশ্রয় পাইয়া তাহারা পূর্ব্ব নিগ্রহের কথা ভুলিতে পারিয়াছিল।

এই ঘটনার কয়েকদিন পরে বেণী ভট্টাচার্য্য তাঁহার বিধবা পুত্রবধূকে তাঁহার সংসারে লইয়া যাইতে আসিলে জাহ্নবী তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কহিল,—"বাবা! আশীর্ব্বাদ করুন, আমি প্রসন্নর মা হয়েই যেন তার ভিটেয় মরতে পারি।"

ভীষণ প্রাকৃতিক দুর্য্যোগের অবসানের পর ধরণী আবার যেমন শান্তভাব ধারণ করে, এই কয় বৎসরের নানা গোলযোগ, অশান্তি এবং বিবাদ কলহের পর পীরপুকুরের পল্লীসমাজের বক্ষে আবার শান্তি ফিরিয়া আসিল। পল্লীবাসী আবার স্ব স্ব জীবনের দৈনন্দিন সুখ-দুঃখ অভাব-অভিযোগ লইয়া ব্যস্ত হইল। গ্রামবাসীর আপদে বিপদে—প্রতিবেশীর রুগ্নশয্যার পার্শ্বে—দীন-দরিদ্রের ভগ্ন কুটীরে—যখনই যেখানে কোন সাহায্যের আবশ্যক হইয়াছে, প্রসন্ন সেই স্থানেই তাহার ক্ষুদ্র সামর্থ্য, এবং অপটু দেহ লইয়া উপস্থিত হইয়াছে—সেই আর্ত্ত বিপন্নের বিপদ আপন বিপদ বলিয়া তাহার মাথা পাতিয়া দিয়াছে এবং তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য তাহার শেষ কপর্দ্দকটী পর্য্যন্ত ব্যয় করিতেও কুণ্ঠা বোধ করে নাই। তাহার এই পরার্থপরতা, আর্ত্ত-সেবা, এবং দীন-দরিদ্রের প্রতি প্রীতি শেষে সকল হৃদয়কেই বিগলিত করিয়া ফেলিল—তাহার প্রতি যাহারা বিরুদ্ধভাবাপন্ন ছিল, অজ্ঞাতসারে তাহারাও তাহার পদানত হইয়া পড়িল।

———

জগৎবিখ্যাত সু-গায়ক তানসেন কর্ত্তৃক রচিত ও সুর-লয়ে গঠিত

ধ্রুপদ

ভৈরোঁ বা ভৈরব—ঝাঁপতাল

বাদি—গান্ধার মতান্তরে মধ্যম।
সম্বাদি—নিখাদ।
শুদ্ধ—শ্রেণী।

অয়ি গঙ্গে জগৎরাণী
জগজননী পাপহারিণি
দিব্যবরণী বৈকুণ্ঠনিবাসিনী।
ভাগীরথি বিষ্ণুচরণ সম্ভূতে
ত্রিপথগে জাহ্নবী
জগপালিনি জগজননী।
ঈশ শীষপর বিরাজিত
ত্রিলোকপালিকে
জীব জন্তু খগ মৃগ
সুর নর মুনি মানি—
তানসেন প্রভু অস্তুতি করত
তু দাতা ভকত জনকে
মুক্তি কি বরদায়িনি।

রেখাব ধৈবত কোমল।
নিখাদ দুইটি পুরা ও কোমল।

চিহ্ন:
কোমল রেখাব—ঋ
" ধৈবত—দা
" নিখাদ—ণি
সম— +
অর্দ্ধ মাত্রা—৺
উদারা মুদারা তারা
স্ সা র্সা

স্বরলিপি—শ্রীবিজয়কৃষ্ণ পাল

আস্থায়ী

১		৺		+	৩		৺	০		১			৺		+	৩		৺	০		১			৺
মা	গা	মা	|	নি	দা	পা	পা	পা	পা	পা	মা	গা	মা	|	নি	দা	পা	পা	পা	মা	মা	মা	গা-পা	মা
অ	০	য়ি	|	গ	০	ঙ্গে	০	০	০	০	অ	০	য়ি	|	গ	০	ঙ্গে	০	০	জ	গ	ত	রা০	ণী

+	৩		৺	০		১			৺		+	৩		৺	০		১			৺
সা	ঋ	মা	মা	মা	মা	মা	মা	মা-গা-পা	মা	|	গা	গা	গা	ঋ	সা	সা	সা	সা	দ্া	দ্া
জ	গ	জ	ন	নী	পা	প	হা	রি০০	ণি	|	দি	০	ব্য	০	০	ব	র	ণী	বৈ	০

+	৩		৺	০		১			৺
নি্	সা	মা	মা	মা	মা	গা	পা	মা-গা	মা
কু	০	ণ্ঠ	০	০	নি	বা	০	সি০	নী

অন্তরা

\+ ৩ ৺ • ১ ৺ ‖ + ৩ ৺ • ১ ৺
পা মা দা দা দা নি র্সা র্সা র্সা র্সা ‖ দা-দা নি-র্সা র্গা র্গা র্গা ঋ´ ঋ´ র্সা-নি র্দা দা
ভা • গী • র থি • বি • ষ্ণু ‖ চ র ণ স · ম্ভূ • • • তে • • •

\+ ৩ ৺ • ১ ৺ ‖ + ৩ ৺ • ১ ৺
দা র্সা র্সা র্সা র্সা নি দা দা দা দা-পা ‖ মা মা মা মা মা-মা গা পা মা গা মা
ত্রি প থ গে ০ জা • হ্ন বী জ গ ‖ পা • লি নি জ গ জ • ন • নী

সঞ্চারী

\+ ৩ ৺ • ১ ৺ ‖ + ৩ ৺ • ১ ৺
সা সা সা দা দা দা দা দা দা পা ‖ মা মা মা মা মা গা পা মা মা মা
ঈ শ শী ষ প র বি রা জি ত ‖ ত্রি লো ক ০ পা লি কে • • •

\+ ৩ ৺ ০ ১ ৺ ‖ + ৩ ৺ ০ ১ ৺
সা ঋ মা মা মা গা পা মা মা মা ‖ গা গা গা গা গা-গা গা ঋ সা সা সা
জী ব জ ০ ন্তু খ গ মৃ গ ০ ‖ সু র ন র মু নি মা ০ নি ০ •

আভোগ

\+ ৩ ৺ ০ ১ ৺ ‖ + ৩ ৺ • ১ ৺
পা পা মা দা দা নি র্সা র্সা র্সা র্সা ‖ দা-দা নি-র্সা র্গা র্গা র্গা ঋ´ ঋ´ নি-র্সা দা দা
তা ০ ন সে ০ ন ০ প্র ভু ০ ‖ অ স্তু তি ক • র ০ ০ • ত • • তু

\+ ৩ ৺ • ১ ৺ ‖ + ৩ ৺ • ১ ৺
দা র্সা র্সা র্সা র্সা নি দা দা দা পা ‖ মা মা মা মা মা-মা গা পা মা গা মা
দা • তা • ভ ক ত জ ন কে ‖ মু ০ ক্তি কি ব র দা • য়ি • নি

ঝাঁপতাল পাঁচটি লঘু বা হ্রস্ব মাত্রার তাল। ইহা দুইটি সমান চরণ বিশিষ্ট এবং এক একটি চরণ দুইটি অসমান পদে বিভক্ত। ইহাতে চারিটি পূর্ণ মাত্রা এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ পদে একটি করিয়া অর্দ্ধ মাত্রা অধিক থাকায় সর্ব্বসমেত পাঁচটি মাত্রা। ইহার গতি, পদবিভাগ ও চরণ অঙ্কের দ্বারা নিম্নলিখিতরূপে দেখান যাইতে পারে, যথা—

```
+     ৩      •     ১
।     ।      ।     ।      +
১,    ১॥ ;   ১,    ১॥ ;   । ১ ।
```

পাঁচটি লঘু মাত্রার পরিবর্ত্তে যদি ইহাকে ৫ × ২ = ১০টি দ্রুত মাত্রা ধরিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে ইহার গতি, পদবিভাগ ও চরণ অঙ্কের দ্বারা নিম্নলিখিতরূপে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে, যথা—

```
+       ৩       •      ১
।       ।       ।      ।        +
১ ২,   ৩ ৪ ৫ ;  ৬ ৭,   ৮ ৯ ১০   । ১ ।
```

অর্থাৎ প্রথম দ্রুত মাত্রায় সম, তৃতীয় দ্রুত মাত্রায় আঘাত, ষষ্ঠ দ্রুত মাত্রায় ফাঁক এবং অষ্টম দ্রুত মাত্রায় আঘাত। সুবিধার জন্য এ স্থলে পূর্ণ মাত্রার পরিবর্ত্তে এইরূপ অর্দ্ধমাত্রা প্রদর্শিত হইল, সুতরাং প্রত্যেক মঙ্কে ১০টি অর্দ্ধমাত্রা থাকিবে। ঝাঁপতালের পদবিভাগের আনুপাতিক সম্বন্ধ—২ : ৩।

ঠেকা

```
+    ৩   ৺    •    ১   ৺
। ।  !   । ।  ।   ।  । । ।     +
ধাগে, ধাগেনে ; তাকে, ধাগেনে ; । ধা ।
```

ধামারের ঠেকাও ঝাঁপতালে বাজান যায়, যথা—

```
+         ৩          •          ১
।         ।          ।          ।        +
কধেটে, ধেটেধা ; গেদেনে, দেনেতা ; । ধা ।
```

সুতরাং তেওরা ছন্দের বোলে সঙ্গত চলে। ইহা প্রকৃতপক্ষে যতের গতি, তবে পার্থক্য খুব কম। ঝাঁপতাল শাস্ত্রোক্ত দেশী শ্রেণীভুক্ত "হংস" তালের দ্বিগু মাত্র। ইহা আমার পরমারাধ্য মাতামহ মৃদঙ্গবিশারদ ও গায়ক ৺গোপালচন্দ্র মল্লিক মহাশয়ের পাণ্ডুলিপি হইতে উদ্ধৃত হইল।

গল্প

নিত্য-স্রোত

শ্রীপঞ্চানন দত্ত

১

তুষ্টুর বুকের উপর দিয়া সারা রাত যে কেমন করিয়া কাটিয়া গিয়াছে তাহা খেয়াল ছিল না। ঘুম ভাঙ্গিবার সঙ্গে সঙ্গে দারুণ অবসাদে তাহার মন ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম হইল। তখনও নেশার মোহ সম্পূর্ণ না কাটায়, তাহার অস্থির চিত্তে ছেঁড়া মেঘখণ্ডের মত নানা চিন্তাই ভাসিয়া যাইতেছিল, হঠাৎ পরিচিত কণ্ঠস্বরে চক্ষু ফিরাইতেই সে দেখিল, তাহার ভগিনীপতি বাদল অদূরে দাঁড়াইয়া বলিতেছে—"কি দাদা আজ কাজে যাবে না?"

উঠিয়া বসিতে বসিতে তুষ্টু বলিল—"না—আজ যে হোলি।"

"ওঃ—তা ওঠ—বেলাও হয়েছে কম নয়—রান্না খাওয়াও তো আছে?"

হাই তুলিয়া তুষ্টু বলিল—"আজ আর রাঁধবো না, মামার দোকানেই—"

কথা সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই বাদল বলিল—"বাস্তবিক দাদা তোমার ঐ বদ্ অভ্যেসটা ছাড় না?"

হাসিতে হাসিতে তুষ্টু বলিল—"কি করি ভাই সিং, এটা যেন ভূতের মত আমার ঘাড়ে চেপে বসে আছে।"

"না—না—ওসব কথা ছেড়ে ঐ পাপ নেশাটা ত্যাগ কর। শুধু ঐ জন্যেই আজও তুমি সংসারী হ'তে পারলে না—জীবনটা বৃথায় নষ্ট করতে বসেছ!"

পুনরায় হাসিয়া তুষ্টু বলিল,—"এজন্যে আমার একটুও দুঃখু নেই তো সিং!—আমি বেশ আছি—খাই দাই কাঁসি বাজাই কারুর ধার ধারি না।"

বিরক্ত মুখে বাদল কহিল,—"ছিঃ—ছিঃ—এও কি একটা জীবন—একবারে একা - সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ!"

"হলেই বা?"

"না—না—না—বাজে কথা ছেড়ে—দেখে-শুনে বিয়ে-থা কর, সংসারী হও।—"

"তার পর?"—

"তার পর আবার কি?"—

বেশ গম্ভীর মুখে তুষ্টু জিজ্ঞাসা করিল,—"একার জীবন সুস্থ করতে যা'কে প্রাণান্ত পরিশ্রম করতে হয় সে আবার নিত্য নূতন অতিথির প্রয়োজনীয় ব্যয়ভার বহন করবে কেমন করে? না ভাই কাজ নেই—এই দুঃখের গহ্বরে আরও কতকগুলো প্রাণীকে টেনে এনে নিজের জীবন তিক্ত করে তুলে লাভ কি?"

বাদল বলিল—"এত ভেবে মানুষ কখন সংসার করে? আর তা ভাবলে অনেকেই তোমার মতন হ'য়ে থাকতো।"

"না ভেবে কাজ করার ফল মানুষ যখন ভুগতে থাকে তখন কেঁদে শেষ করতে পারে না।"

"যা বল ভাই—এ যেন পণ্ডিতের মত তোমার কথা হ'চ্ছে। আমরাই বা কি?—আমরাও তো ছেলে মেয়ে নিয়ে এক রকমে দিন কাটিয়ে দিচ্ছি।"

তুষ্টু মৃদু হাসিল, কোন উত্তর দিল না।

বাদল পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল—"আচ্ছা দাদা বলতে পার—এই নেশাতে তুমি কি সুখ পাও ?"

বুক ফুলাইয়া দীর্ঘশ্বাস মোচন করিয়া তুষ্টু বলিল—"সুখ ?—হ্যাঁ—তা—কি জান ভাই ওরই মাদকতার উল্লাসে দুঃখটাকে চাপা দিয়ে রাখতে চাই।"

সহকর্মীর হাত দুখানা চাপিয়া ধরিয়া বাদল বলিল—"ঐ বদ্-খেয়ালের বশে মিছে আর শরীরটা নষ্ট করো না দাদা! পাঁচ জনের একজন হ'বার চেষ্টা কর। সামনের গাঁয়ে আমার বিশেষ দরকার —আর বসতে পারলুম না চল্লুম।"

বাদল চলিয়া গেলে তুষ্টু তাহার কথাগুলা লইয়া মনের মধ্যে যখন নাড়া চাড়া করিতেছিল, ঠিক সেই সময়ে ফুলি নূতন সজ্জায় তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতেই মুখ তুলিয়া সে অবাক্ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল, কোন কিছু জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না।

ফুলিও কিছু বলিবার পূর্ব্বে তুষ্টুর পায়ের তলায় ঠক্ করিয়া প্রণাম করিয়া দ্রুত চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেই তুষ্টু তাহার কাপড়ের একটা পাশ টানিয়া ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কি হয়েছে ফুলি ?"

ফুলি আঁচলের খুঁটে মুখ চাপিয়া ধরিয়া ক্রন্দনের আবেগে ফুলিতে লাগিল।

অধিকতর বিস্মিতভাবে উঠিয়া দাঁড়াইয়া তুষ্টু সস্নেহ স্বরে কহিল—"আমায় বল ফুলি—কেন তুই কাঁদছিস ?"

আপনাকে সামলাইতে না পারিয়া আবেগের মাথায় ফুলি বলিয়া ফেলিল—"আমি আজ যমের বাড়ী যাচ্ছি—বিদায় দাও।"

কথাটা বুঝিতে তুষ্টুর বাকি রহিল না। সে মলিন মুখে কহিল,—"ছিঃ—ও কথা বলতে নেই—এইটেই যে মেয়ে মানুষের সবার বড় ধর্ম্ম রে!"

ফুলি এতটুকু কথার ভার সহ্য করিতে পারিল না, একরূপ ছুটিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল।

সেই শূন্য পথের দিকে অনেকক্ষণ চাহিয়া চাহিয়া অশ্রুতে চক্ষু ঝাপ্সা হইয়া আসিতে তুষ্টু ধীরে ধীরে চাটাইখানার উপর বসিয়া পড়িল ও রগ্ দুইটা চাপিয়া চুপ করিয়া রহিল।

অনেকক্ষণ পরে সে অধৈর্য্য ও অস্ফুট-কণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল,—"না—এমন নীরস নিঃসঙ্গ জীবন আর বহা যায় না—সঙ্গী চাই—সাথী প্রয়োজন। অভাব অনটন? প্রাণপাত ক'রে দুঃখকে জয় করতেই হবে।"

তাহার চোখে মুখে দৃঢ়তার চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল।

২

নেশা পরিত্যাগ করিয়া প্রায় তিন মাস অবিশ্রান্ত পরিশ্রম ও এক বেলা আহারের ফলে তুষ্টুর হাতে কয়েকটা টাকা জমিয়া গিয়াছিল। সে হপ্তার রোজগার জমার অংশ আরও কিছু বৃদ্ধি করিতেই আশার আনন্দ তাহার মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। তাই রাত্রে শয়ন করিবার পূর্ব্বে তামাক খাইতে খাইতে সে তাহার অদেখা জীবন-সঙ্গিনীর মূর্ত্তিখানি কল্পনার তুলিকায় আঁকিবার চেষ্টা করিতেছিল; কিন্তু দূরে ঠেলিয়া রাখিবার দৃঢ় চেষ্টা সত্ত্বেও ঘুরিয়া ফিরিয়া ফুলির মূর্ত্তিখানিই কেবল মনের মধ্যে মূর্ত্ত হইয়া উঠিতে লাগিল। সে বিরক্তভাবে ঘন ঘন হুঁকায় টান দিতে দিতে অবশেষে কখন যে তাহারই ভালবাসা ও মমতার আবেশময় রাজ্যে আপনাকে হারাইয়া ফেলিয়াছিল খেয়াল ছিল না। হঠাৎ দরজায় আঘাতে সংবৃত্ত হইয়া সে জিজ্ঞাসা করিল—"কে ?"

"দাদা আমি বিরাজ—দোর খোল।"

অকস্মাৎ রাত্রে বিরাজের আগমনে তুষ্টুর বুকটা ধড়াস্ করিয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি উঠিয়া দ্বার মুক্ত করিতেই বিরাজ গৃহে প্রবেশ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

স্পন্দিতবক্ষে ও কম্পিত-কণ্ঠে তুষ্টু জিজ্ঞাসা করিল—"কি—কি বিরাজ?"

দেওয়ালের পার্শ্বে ধপাস্ করিয়া বসিয়া পড়িয়া বিরাজ কহিল—"কি হবে দাদা—তাকে পুলিশে ধরে নিয়ে গেছে!"

বিস্মিত দৃষ্টি ভগিনীর উপর স্থাপন করিয়া তুষ্টু জিজ্ঞাসা করিল,—"কেন?"

উত্তর দিতে বিরাজের কণ্ঠ বাধিয়া যাইতেছিল। একটা ঢোক গিলিয়া জড়িত-স্বরে সে বলিল—"ছেলে মেয়ের রোগের খরচ জোগাতে গিয়ে আমাদের যা কিছু সব মহাজনের গর্ভে স্থান পেয়েছে; তাই তার মাথা খারাপ হ'য়ে যায়!"

"তা তার সঙ্গে পুলিশের কি?"

"তাই সেদিন কখন যে ঘোষেদেব ঘাট থেকে বাসন তুলে এনে বিক্রী করেছে আমি কিছুই জানি নি।"

ব্যাপারটা বুঝিয়া তুষ্টু হুঁকাটা দেওয়ালে ঠেস্ দিয়া রাখিয়া গুম্ হইয়া বসিয়া রহিল।

যুক্তির আশায় অনেকক্ষণ নিঃশব্দে বসিয়া থাকিবার পরও ভ্রাতার নিকট হইতে সাড়া না পাইয়া কাতর-কণ্ঠে বিরাজ বলিয়া উঠিল,—"যা হোক একটা উপায় কর দাদা!"

"আমি আর এতে কি করতে পারি বল্?"

করুণনেত্র সহোদরের উপর স্থাপন করিয়া বিরাজ বলিল—"পুলিশকে কিছু ঘুস দিতে পারলে না কি ছেড়ে দেবে ব'লে সকলে বলছে।"

"কিন্তু ঘুসের টাকা আস্‌বে কো'থা থেকে?"

"সে যা হয় তুমি ব্যবস্থা না ক'রলে মানুষটাকে যে জেলে যেতে হবে দাদা!"

তুষ্টুর বুক কাঁপিয়া উঠিল—"টাকা—টাকা—তাহার আশা-তরুর সজীব বীজ—তাহার জীবন-সৌধের প্রোথিত শিলা—না—না—সে আর আপনাকে ধ্বংসের পথে টানিয়া আনিয়া অন্যের উপকার করিবে না—না—কিছুতেই না!

তাহার মুষ্টি বদ্ধ হইয়া গেল ও চক্ষে দৃঢ়তার চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল। সে অস্বাভাবিক-কণ্ঠে বলিয়া ফেলিল—"পয়সার উপকার আমার দ্বারা হবে না।"

ছিটকাইয়া পড়িয়া ও তুষ্টুর পা দুটী জড়াইয়া ধরিয়া বিরাজ হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

তুষ্টুর সমস্ত দৃঢ়তা নিমেষে জল হইয়া গেল ও প্রাণের মধ্যে দুঃখের সমুদ্র তাল পাকাইয়া উঠিল। আপনার উদ্দেশ্য ও স্বার্থ বিস্মৃত হইয়া সে বোনকে বুকের কাছে টানিয়া তুলিয়া কহিল—"চল বিরাজ—দেখি আমার সাধ্যে কুলায় কি না!"

৩

পুঁজিপাটা সব খোওয়াইয়াও তুষ্টু ভগিনী-পতিকে শাস্তির কবল হইতে রক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়া আদালত হইতে বরাবর বাড়ী ফিরিয়াছিল। অশান্ত মনকে সুস্থ করিবার আশায় সন্ধ্যার সময় দাওয়ার উপর শুইয়া পড়িতেই তাহার মনে হইল জগতে দুঃখটাই শাশ্বত, সুখ অলীক—কুহক কল্পনা; বিশেষতঃ তাদের মত নিষ্পেষিত জাতির জীবনে। এত দৃষ্টান্ত সত্ত্বেও ইচ্ছা ক'রে মানুষ তারই নাগ-পাশে আপনাদের বাঁধতে চায় কেন? আমার এই নিঃসঙ্গ লক্ষ্যহীন জীবন বিড়ম্বনা বলে বোধ হয়—কিন্তু পূর্ণ সংসারী বাদলের সুখের এই তো নমুনা! তুলনায় দেখছি আমার জীবনই শ্রেষ্ঠ।

জ্যোৎস্নাভরা উঠানের উপর এক শুভ্রবসনা নারীমূর্ত্তি দেখিয়া তাহার কল্পনার সূত্র ছিন্ন হইয়া গেল। সে কিছু প্রশ্ন করিবার পূর্ব্বেই নারী কহিল —"ভয় পেও না তুষ্টু দা—আমি ফুলি।"

তুষ্টুর হৃদয়ের কোন্ এক গোপন তন্ত্রী ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল। কিন্তু সে উঠিল না বা কোন কথা কহিল না।

ফুলি দাওয়ার সন্নিকটবর্ত্তী হইয়া শ্লেষপূর্ণ কণ্ঠে বলিল—"আজ বুঝি কতকগুলো তাড়ি গিলে মরেছ ?"

তুষ্টু ধীরকণ্ঠে কহিল—"তাড়ি আমি ছেড়ে দিয়েছি।"

কথাটা ফুলির বিশ্বাস হইল না। সে একখানি হাত তুষ্টুর দিকে বাড়াইয়া দিয়া বলিল,—"কৈ আমায় ছুঁয়ে বল দেখি যে কথাটা সত্যি ?"

তুষ্টু সাহস করিল না।

ফুলি পুনরায় জোর করিয়া বলিল,—"চুপ করে রইলে যে,—বল ?"

তুষ্টু নিম্নস্বরে বলিতে লাগিল,—"ছেড়েছিলুম বটে কিন্তু আবার আমি তাড়ি খাবো।"

বিস্মিতকণ্ঠে ফুলি জিজ্ঞাসা করিল,—"কেন— এ কি কথা ?"

"ফুলি ভাল হওয়া আমার বরাতে ভগবান লেখেন নি।"

"কেন—কেন তুষ্টু দা ?"

দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া তুষ্টু বলিল,—"যত-বার এই বদ্ধ কূয়ার ভেতর থেকে মাথা তুলতে চেয়েছি ততবারই দুঃখের পাষাণ এসে আরও জোরে চেপে ধরেছে। এবার প্রাণপণ বলে লেগেছিলুম— কিন্তু দেখলুম—বাইরেও দুঃখের বড় বড় পাহাড় জমা হ'য়ে আছে। তা দেখে মনে হ'ল—সুখ আমার প্রয়োজন নেই—দুঃখই আমার ভাল।"

আমতা আমতা করিয়া ফুলি বলিল—"কিন্তু তোমায় এ অবস্থায় রেখে যে আমার আর চলবে না তুষ্টু দা!"

তুষ্টু নীরবে পড়িয়া রহিল।

তুষ্টুর পার্শ্বে বসিয়া পড়িয়া ও তাহার একখানি হাত আপনার মুঠার মধ্যে লইয়া ফুলি ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল,—"তুমি কি ছেলেবেলার কথা সব ভুলে গেলে তুষ্টু দা ?":

তুষ্টুর সর্ব্বাঙ্গ শিথিল হইয়া আসিয়াছিল। সে জড়িতকণ্ঠে বলিল,—"ফুলি—সে সব কথা ভুলে যা।"

বিহ্বল নারী বলিতে লাগিল,—"কৈ ভুলতে পারছি আমি। তা যদি পারতুম—তা হ'লে আজ শুধু তোমার মুখ চেয়ে স্বামী—ঐশ্বর্য্য ছেড়ে এখানে ছুটে আসতুম না।"

তড়িৎপৃষ্টের মত উঠিয়া বসিয়া তুষ্টু রুক্ষস্বরে জিজ্ঞাসা করিল,—"পালিয়ে এয়েছিস্ তুই ?"

দ্বিগুণ জোরে ফুলি বলিল,—"হ্যাঁ—আর সে কেবল তোমারই জন্মে।"

তুষ্টুর কথা কহিবার শক্তি যেন লোপ পাইয়া গেল। সে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল।

ফুলি বলিল,—"আমি অপনের হ'য়ে থাকাটা—

বাধা দিয়া তুষ্টু বলিয়া উঠিল,—"থাম্—থাম্ ফুলি!"

"কেন ?"

"এত বড় কলঙ্ক!"—

উপহাসের হাসি হাসিয়া ফুলি বলিল,—"প্রাণের চেয়ে কলঙ্ক ?"

তুষ্টুর মাথা ঘুরিয়া গেল। এই কথাটাই তাহার মস্তিষ্কে অকস্মাৎ খেলিয়া গেল যে, তবে সুখ ভুয়া। এই নারী—উপযুক্ত স্বামী—স্বচ্ছল অবস্থা—তবুও অসুখী। স্বামীও তাই। না—না সব মিথ্যা— সব মিথ্যা—বাইরে সুখের আবরণটা ভিতরে অনন্ত

দুঃখ—দাবানলেরই পরিচয়। আমি সে মিথ্যার অভিনয় করতে চাই না—আমার দুঃখই ভাল। জালা—জালা—এ জালার ওষুদ আমার নেশার আনন্দ!

সে দাওয়া হইতে উঠানের উপর লাফাইয়া পাগলের মত বাহির হইয়া গেল।

একটা খুঁটি চাপিয়া ধরিয়া ফুলি মূর্চ্ছাহতার মত বসিয়া পড়িল।

আশা

শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য

সে যে কাম্য কাননে
যূথিকা-গুচ্ছ
সুরভি স্নিগ্ধকায়,
সে যে মানস-সরসে
বিকচ নলিনী
কম্পিতা মৃদু বায়।
সে যে কাব্য-গাথায়
ছন্দরূপিণী
অমিতাক্ষরে বাঁধা,
সে যে মর্ম্ম-বীণায়
দিব্য রাগিণী
কড়ি মধ্যমে সাধা।
সে যে সুপ্তি-মাঝারে
স্বপ্ন-সুষমা
কল্পনা-ফুলরাণী,
সে যে বেদনা বিদ্ধ
ক্ষুব্ধ পরাণে
মধু আশ্বাস বাণী।
সে যে নন্দন-বন—
মন্দার মধু
রুদ্ধ কোরক-মাঝে,
আমি লালসা-লুব্ধ
মুগ্ধ পরাণে
ছুটেছি তাহারি পাছে।

গল্প

নিরুপমা

শ্রীবৈদ্যনাথ কাব্য-পুরাণতীর্থ

অবতারণা

আমি যখন কলেজে তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়ি তখন নিরুপমার পিতা মাঝের গাঁ হইতে উঠিয়া আমাদের গ্রামে আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করিলেন। নিরুপমাদের পরিবারে তাহারা ভাই বোনে দুইটি, আর তাহার মাতা ও পিতা পৃথ্বীশচন্দ্র।

একে ত তাঁহারা কুলীন ব্রাহ্মণ—তাহাতে আথিক কিছু অসচ্ছল এবং কন্যাটিও নামের বিপরীত পথে অবস্থিত বলিয়া কন্যার বিবাহ দিতে পারেন নাই। কুমারী কন্যা গৃহে আছে—কিন্তু তাহার জীবনের কৌমার অংশ অনেকদিন তাহাকে অতিক্রম করিয়া চলিয়া গিয়াছে।

পৃথ্বীশচন্দ্র ছিলেন নিতান্ত নির্ব্বিরোধ শান্ত শিষ্ট ভাল মানুষ। তবে ভাল মানুষকেও যাহারা বোকা বলে তেমন লোকের অভাব আমাদের গ্রামে ছিল না।

বাল্যযুগ

পৃথ্বীশচন্দ্রকে একদিন আমাদের দলের একটি দুষ্ট ছেলে পরিহাসপূর্ব্বক বলিয়াছিল,—পৃথ্বীশবাবু আপনার মেয়েটি বেশ সুন্দরী ত?"

যদিও পদ্যমালায় পড়িয়াছিলাম—

তনয় যদ্যপি হয় অসিত বরণ,
প্রসূতির কাছে সেও কষিত কাঞ্চন।

তবুও কবিতাটি যে এত দূর সত্য, তাহা জানা ছিল না।

অবশ্য বাড়ীর সকলেই পৃথ্বীশ বাবু ছিলেন না। তিনি যখন এইকথা তাঁহার গৃহিণীকে আহ্বান করিয়া বলিলেন,—"গিন্নি শুনেছ—তোমার মেয়ের এদেশে সুন্দরী বলে বড় খোস্‌বো বার হয়েছে।"

আমি তখন নিকটে দাঁড়াইয়া জনৈক বন্ধুর সহিত কথা বলিতেছিলাম। লক্ষ্য করিলাম, পৃথ্বীশ বাবুর কথায় তাঁহার গৃহিণী মুখে কাপড় তুলিয়া দিলেন; আর নিরুপমা সেখান হইতে সরিয়া গেল।

দেখিলাম,—তাহার চেহারা লইয়া যে আড্ডা বাড়ীতে সমালোচনা হয়,
"রূপে হারা আল্‌কাত্‌রা, কানটি ঢাকের তলা"
অথবা

"ছোট খাটো রুক্ষ কেশ
কপালখানি উঁচু বেশ
ঘা মেরে নাক বসিয়ে দেছে"—ইহার একটি কথাও মিথ্যা নয়। এত নিন্দার ভিতরেও নিরুপমার চেহারায় একটি নিজস্ব নবীনতা ছিল। সর্ব্বাঙ্গ অসুন্দরের ভিতরেও সুন্দরের হস্তলিপির মতন তাহার চোখ দুইটি লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

গবেশ বলে,—"পৃথ্বীশবাবুর "ডটার" নিরুপমা যেন "ব্লাইণ্ড সনের" নাম পদ্মলোচন—"ব্ল্যাক বয়ে"র নাম বিদ্যুৎবরণ।

গবেশ কিন্তু সমালোচনার সময় ভুলিয়া যায়—তারও নাসিকা-গহ্বর ও মুখবিবরের পার্থক্য অনুসন্ধানের জন্য 'রিশার্চ্চ স্কলারশিপ' আবশ্যক। তাহার রংটা দেখিয়াও জহরীরা গজ কত জিজ্ঞাসা করে।

মধ্যযুগ

সে বৎসর কলিকাতায় জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশন হয়। আমাদের গ্রাম কলিকাতার উপকণ্ঠে। জাতীয়-মহাসমিতি-সমুদ্রের সম্বর্দ্ধনা-লহরী সবেগে আমাদের গ্রামের পাদদেশে আসিয়া আঘাত করিল। আমরাও একটি যুবক সমিতি গঠন করিলাম। গবেশ ছিল সেইদলের অধিনায়ক, কারণ কার্য্যকরী সমিতি গঠন করিতে সে সদর্পে অগ্রসর হয় এবং ঠিক কার্য্যের সময় ততোধিক সগর্ব্বে পশ্চাৎপদ হয়। এত বড় যোগ্যতার নিদর্শনে কার্য্যকরী সমিতির সভাপতির পদ আমাদের গ্রামে তাহার একচেটে। লোকে বলে,—গবেশ ন্যাতাগিরি খুব ভাল রকম করেই শিখেছে।

এ হেন গবেশ একদিন সভায় প্রস্তাব করিল—"পৃথ্বীশবাবুকে জব্দ করতে হবে।" একে ত মনসা তাহাতে আবার ধুনার গন্ধ! উক্ত প্রস্তাব আবার কায়স্থ পল্লীর কেশব মিত্র কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইল। আমি বলিলাম—"ব্যাপার কি?"

গবেশ উগ্রকণ্ঠে উত্তেজিতভাবে উত্তর দিল—"তোমাদের মত যাহাদের 'টেম্পারেচার্' 'অলওয়েজ্ নাইন্টি ফাইভ'; গরম হলেও 'নাইন্টি সেভেনে'র উপর ওঠে না—তাদের দিয়ে কি 'ওয়ার্লডের' কোন 'ওয়ার্ক্' করা যায়। আবার 'কজ্' চাওয়া হচ্ছে।"

গবেশের কথার মৌলিকতাই কিছু অতিমাত্রায় ইংরাজি বুক্নি দেওয়া। তার মুখ দিয়া এমন একটি বিশুদ্ধ বাংলা বাহির হইবে না—যাহার মধ্যে দুই দশটা ইংরাজি শব্দ নাই, কিন্তু সে একখানি চিঠির এক লাইনও বিশুদ্ধ ইংরাজিতে লিখিতে পারে না।

গবেশের কথার মূল্যও ঠিক তদনুযায়ী। কারণ সে বলিলেও আমি খুব নরম ধাতুর লোক ছিলাম না। রাগের হাতে শিক্ষাকেও বলি দিয়া ফেলি। সে সময় কোন জ্ঞান থাকে না।

আমি গবেশকে লক্ষ্য করিয়া ব্যঙ্গস্বরে কহিলাম—"তুমি না স্বদেশী? ভাষাটাকে অমন করে জবাই করছ কেন? হয় ইংরাজিতে বল—নয় বাংলায় কথা চালাও। ও জগাখিচুড়ি কেন?"

সকলেই হাসিয়া উঠিল। গবেশ ত চটি লাল।

সে রাগের মাথায় অতি উত্তেজনার ঘো[illegible] কতক 'ইউ' 'ইউ' করিয়া অবশেষে শ্রান্ত হ[illegible] ভাবে কহিল—"'ডোন্ট্ ইউ, নো ইফ্ [illegible] পড়্তাম ত'—'ইন্ দিস্ ইয়ার্' আমারও '[illegible] ইয়ার' হত। 'আই সে ইউ' লেখা-পড়া শিখ্‌চ—শুধু শুধু 'ট্রাইফ্লিং-ম্যাটারে জেণ্ট্‌ল্‌ম্যানে'র 'ব্রেষ্ট' 'হার্ট' করছ কেন!

গবেশের কথায় আমার হাসি না কমিয়া বরঞ্চ বাড়িয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার রাগও পঞ্চমে বাড়িতে লাগিল, প্রায় হাতাহাতি হয়। কেবল আমার উত্তেজনার অভাবে সে কাজটি বাকি ছিল। খানিকক্ষণ অক্ষমের ফোঁপানি ফোঁপাইয়া গম্ভীর হইয়া গবেশ পিছন ফিরিয়া বসিল।

কেশব মিত্র কহিল,—"তোমার প্রতিবেশী পৃথ্বীশ বাবু আমাদের কংগ্রেসের ধন-ভাণ্ডারে চাঁদা দেন নি'।"

লাম,—"চাঁদা ত' ভিক্ষা ছাড়া আর
র করে কি ভিক্ষা আদায় করা যায়?
ক্তি করে মিষ্ট কথায় কাজ উদ্ধার
চল—আজ একবার ঘুরে আমিও
ম নেই।"
র হইল—আমি কেশব মিত্র, নলিনী
গবেশ আজ বৈকালে পৃথ্বীশ বাবুর
চাঁদার খাতা লইয়া যাইব।
কি বিরাট পরিহাস—আমরা যখন
বাড়ী যাইয়া উপস্থিত হইলাম—
র উলঙ্গ পুত্র হাততালি দিয়া
—

"আমরা স্বদেশী পাণ্ডা।
ত বলে ফেলি ভুলে ইংরাজি দশ গণ্ডা।
রি ফিরি মোরা সহরে সহরে
শ-উদ্ধার মোটরে মোটরে
য়া পল্লীতে ফিরে যেতে বলে কোন ষণ্ডা
আমরা স্বদেশী পাণ্ডা।"

পথের মাঝেই বেশ একটু উত্তেজক
, তাহার দৈহিক তাপ তখন তাহার
র্মোমিটারের সব ধাপকটিই পার হইয়া
পৃথ্বীশচন্দ্র আমাদের আদর করিয়াই
গবেশ পথের ঔষধের গুণে একটু
হইয়া উঠিয়াছিল। কথাগুলি তার ঠিক
হয় নাই! যাক্ আমরা অবশেষে
কংগ্রেসের ভিতর দিয়া তাঁহাকে চাঁদার
বসিলাম।

র আশা কম। তিনি কংগ্রেসের বিপক্ষে
তুলিলেন। তিনি বেশ স্পষ্টাক্ষরেই
—"কংগ্রেসে দেশের কোনও লাভ নেই।
য় কাজ হয় না। বছর বছর যে
প্রস্তাব গৃহীত হচ্ছে—তাতে ফল কি
হচ্ছে? কংগ্রেসের পিছনে এই টাকা খরচটা সম্পূর্ণ
বাজে খরচ। তার চেয়ে ঐ টাকাগুলি একটা
লাভজনক ব্যবসায়ে দিলে জাতীয় ধন-ভাণ্ডারে কিছু
টাকা হতে পারে?"

আমি ও নলিনী চাটুজ্যে অনেক যুক্তিতর্ক
উপস্থিত করিলাম। কিন্তু ফল কিছুই হইল না।
গবেশ তাঁহার কথায় চটিয়া বিরক্তিপূর্ণ স্বরে বলিল
"তোমার মত 'ইল্‌লিটারেট্' লোক যতদিন
'আওয়ার কান্‌ট্রি'তে থাক্‌বে—ততদিন 'মাই
মাদারল্যাণ্ড্ বেঙ্গলের আর নো হোপ্'।"

গবেশ আরও কি বলিতে যাইতেছিল—মাঝ-
পথে বাধা দিয়া পৃথ্বীশবাবু কহিলেন—"কি বলেন
ধীরেনবাবু—নলিনীবাবু! এই ত' আপনাদের
কংগ্রেসী ভাষার নমুনা। আমি বঙ্গবাণীর
ভক্ত ছেলে—এমন কংগ্রেসে আমার দরকার
নেই।"

তীব্র শ্লেষে ব্যথিত হইয়া কেশব উত্তর দিল—
"কেন বকেন ম'শায়, আমরা বাঙ্গালী—যে
ভাষায় কথা বল্‌বো—তাই হবে বাংলা।"

আমি দেখিলাম—আশা কিছু নাই। নিরর্থক
ভাষা নিয়া তর্ক করিয়া লাভও নাই। উঠিয়া
পড়িলাম। গবেশ কি বলিতে যাইতেছিল। কিন্তু
সকলেই উঠিয়া পড়ায় তার আর কিছু বলা হইল
না।

পথে দেখি হাততালি দিয়া গাহিতেছে—

"স্বদেশের নামে খুলি ভাণ্ডার
দেশ ও দশকে করি জেরবার
উদর পুরাব না হলে কি ছাই
খাব কচুপোড়া ঘণ্টা
আমরা স্বদেশী পাণ্ডা

গবেশ চটিয়া কহিল,—"দেখেছ যে
মানুষকে নিয়ে কি মর্ম্মচ্ছেদী 'জোক্'।"